রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ ১৯০৬
চতুর্থ পুনর্মুদ্রণ ১৯২১
পুনর্মুদ্রণ ১৯২৪
পুনর্মুদ্রণ ১৯৩১
পুনর্মুদ্রণ জুন ১৯৪২
পুনর্মুদ্রণ ডিসেম্বর ১৯৪৩
পুনর্মুদ্রণ জুন ১৯৪৬

মূল্য সাড়ে তিন টাকা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন, বীরভূম

সূচনা

পাঠক যে-ভার নিলে সংগত হয় লেখকের প্রতি সে-ভার দেওয়া চলে না। নিজের রচনা উপলক্ষে আত্মবিশ্লেষণ শোভন হয় না। তাকে অন্যায় বলা যায় এইজন্যে যে, নিতান্ত নৈর্ব্যক্তিক ভাবে এ-কাজ করা অসম্ভব— এইজন্য নিষ্কাম বিচারের লাইন ঠিক থাকে না। প্রকাশক জানতে চেয়েছেন নৌকাডুবি লিখতে গেলুম কী জন্যে। এ-সব কথা দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ। বাইরের খবরটা দেওয়া যেতে পারে সে হল প্রকাশকের তাগিদ। উৎসটা গভীর ভিতরে, গোমুখী তো উৎস নয়। প্রকাশকের ফরমাসকে প্রেরণা বললে বেশি বলা হয়। অথচ তা ছাড়া বলব কী? গল্পটায় পেয়ে বসা আর প্রকাশকে পেয়ে বসা সম্পূর্ণ আলাদা কথা। বলা বাহুল্য ভিতরের দিকে গল্পের তাড়া ছিল না। গল্পলেখার পেয়াদা যখন দরজা ছাড়ে না তখন দায়ে পড়ে ভাবতে হল কী লিখি। সময়ের দাবি বদলে গেছে। একালে গল্পের কৌতূহলটা হয়ে উঠেছে মনোবিকলনমূলক। ঘটনা-গ্রন্থন হয়ে পড়েছে গৌণ। তাই অস্বাভাবিক, অবস্থায় মনের রহস্য সন্ধান করে নায়ক-নায়িকার জীবনে প্রকাণ্ড একটা ভুলের দম লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল— অত্যন্ত নিষ্ঠুর কিন্তু ঔৎসুক্যজনক। এর চরম সাইকলজির প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, স্বামীর সম্বন্ধের নিত্যতা নিয়ে যে-সংস্কার আমাদের দেশের সাধারণ মেয়েদের মনে আছে তার মূল এত গভীর কি না

যাতে অজ্ঞান-জনিত প্রথম ভালোবাসার জালকে ধিক্‌কারের সঙ্গে সে ছিন্ন করতে পারে। কিন্তু এ-সব প্রশ্নের সর্বজনীন উত্তর সম্ভব নয়। কোনো এক জন বিশেষ মেয়ের মনে সমাজের চিরকালীন সংস্কার দুর্নিবাররূপে এমন প্রবল হওয়া অসম্ভব নয় যাতে অপরিচিত স্বামীর সংবাদমাত্রেই সকল বন্ধন ছিঁড়ে তার দিকে ছুটে যেতে পারে। বন্ধনটা এবং সংস্কারটা দুই সমান দৃঢ় হয়ে যদি নারীর মনে শেষ পর্যন্ত দুই পক্ষের অস্ত্র-চালাচালি চলত তাহলে গল্পের নাটকীয়তা হতে পারত সুতীব্র, মনে চিরকালের মতো দেগে দিত তার ট্র্যাজিক শোচনীয়তার ক্ষতচিহ্ন। ট্র্যাজেডির সর্বপ্রধান বাহন হয়ে রইল হতভাগ্য রমেশ— তার দুঃখকরতা প্রতিমুখী মনোভাবের বিরুদ্ধতা নিয়ে তেমন নয় যেমন ঘটনাজালের দুর্মোচ্য জটিলতা নিয়ে। এই কারণে বিচারক যদি রচয়িতাকে অপরাধী করেন আমি উত্তর দেব না। কেবল বলব গল্পের মধ্যে যে-অংশে বর্ণনায় এবং বেদনায় কবিত্বের স্পর্শ লেগেছে সেটাতে যদি রসের অপচয় না ঘটে থাকে তাহলে সমস্ত নৌকাডুবি থেকে সেই অংশে হয়তো কবির খ্যাতি কিছু কিছু বাঁচিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু এও অসংকোচে বলতে পারি নে কেননা রুচির দ্রুত পরিবর্তন চলেছে।

রবীন্দ্র-রচনাবলী
অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নৌকাডুবি

১
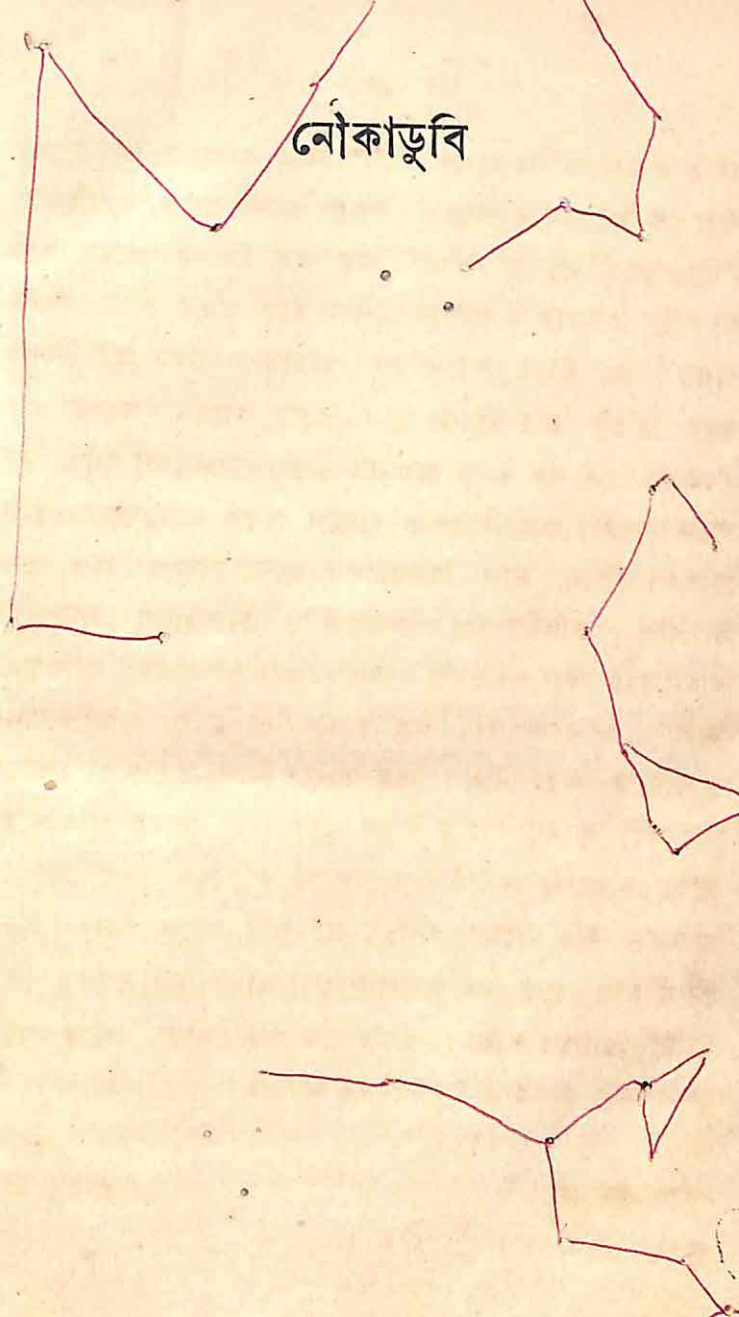
রমেশ এবার আইন-পরীক্ষায় যে পাস্ হইবে, সে-সম্বন্ধে কাহারো কোনো সন্দেহ ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সরস্বতী বরাবর তাঁহার স্বর্ণপদ্মের পাপড়ি খসাইয়া রমেশকে মেডেল দিয়া আসিয়াছেন— স্কলারশিপও ফাঁক যায় নাই।

পরীক্ষা শেষ করিয়া এখন তাহার বাড়ি যাইবার কথা। কিন্তু এখনো তাহার তোরঙ্গ সাজাইবার কোনো উৎসাহ দেখা যায় নাই; পিতা শীঘ্র বাড়ি আসিবার জন্য পত্র লিখিয়াছেন। রমেশ উত্তরে লিখিয়াছে, পরীক্ষার ফল বাহির হইলেই সে বাড়ি যাইবে।

অন্নদাবাবুর ছেলে যোগেন্দ্র রমেশের সহাধ্যায়ী। পাশের বাড়িতেই সে থাকে। অন্নদাবাবু ব্রাহ্ম। তাঁহার কন্যা হেমনলিনী এবার এফ. এ. দিয়াছে। রমেশ অন্নদাবাবুর বাড়ি চা খাইতে এবং চা না খাইতেও প্রায়ই যাইত।

হেমনলিনী স্নানের পর চুল শুকাইতে শুকাইতে ছাদে বেড়াইয়া পড়া মুখস্থ করিত। রমেশও সেই সময়ে বাসার নির্জন ছাদে চিলকোঠার একপাশে বই লইয়া বসিত। অধ্যয়নের পক্ষে এরূপ স্থান অনুকূল বটে কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে বিলম্ব হইবে না যে, ব্যাঘাতও যথেষ্ট ছিল।

এ পর্যন্ত বিবাহ সম্বন্ধে কোনো পক্ষ হইতে কোনো প্রস্তাব হয় নাই। অন্নদাবাবুর দিক হইতে না হইবার একটু কারণ ছিল। একটি ছেলে বিলাতে ব্যারিস্টার হইবার জন্য গেছে, তাহার প্রতি অন্নদাবাবুর মনে মনে লক্ষ্য আছে।

সেদিন চায়ের টেবিলে খুব একটা তর্ক উঠিয়াছিল। অক্ষয় ছেলেটি বেশি পাস করিতে পারে নাই। কিন্তু তাই বলিয়া সে-বেচারার চা-পানের এবং অন্যান্য শ্রেণীর তৃষা পাস-করা ছেলেদের চেয়ে কিছু কম ছিল, তাহা নহে। সুতরাং হেমনলিনীর চায়ের টেবিলে তাহাকেও মাঝে মাঝে দেখা যাইত। সে তর্ক তুলিয়াছিল যে, পুরুষের বুদ্ধি খড়্গের মতো, শান বেশি না দিলেও কেবল ভারে অনেক কাজ করিতে পারে; মেয়েদের বুদ্ধি কলমকাটা ছুরির মতো, যতই ধার দাও না কেন, তাহাতে কোনো বৃহৎ কাজ চলে না—ইত্যাদি। হেমনলিনী অক্ষয়ের এই প্রগল্‌ভতা নীরবে উপেক্ষা করিতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু স্ত্রীবুদ্ধিকে খাটো করিবার পক্ষে তাহার ভাই যোগেন্দ্রও যুক্তি আনয়ন করিল। তখন রমেশকে আর ঠেকাইয়া রাখা গেল না। সে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া স্ত্রীজাতির স্তবগান করিতে আরম্ভ করিল।

এইরূপে রমেশ যখন নারীভক্তির উচ্ছ্বসিত উৎসাহে অন্যদিনের চেয়ে দু-পেয়ালা চা বেশি খাইয়া ফেলিয়াছে, এমন সময় বেহারা তাহার হাতে এক টুকরা চিঠি দিল। বহির্ভাগে তাহার পিতার হস্তাক্ষরে তাহার নাম লেখা। চিঠি পড়িয়া তর্কের মাঝখানে ভঙ্গ দিয়া রমেশ শশব্যস্তে উঠিয়া পড়িল। সকলে জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কী।" রমেশ কহিল, "বাবা দেশ হইতে আসিয়াছেন।" হেমনলিনী যোগেন্দ্রকে কহিল, "দাদা, রমেশবাবুর বাবাকে এইখানেই ডাকিয়া আনো না কেন, এখানে চায়ের সমস্ত প্রস্তুত আছে।"

রমেশ তাড়াতাড়ি কহিল, "না, আজ থাক্, আমি যাই।"

অক্ষয় মনে মনে খুশী হইয়া বলিয়া লইল, "এখানে খাইতে তাঁহার হয়তো আপত্তি হইতে পারে।"

রমেশের পিতা ব্রজমোহনবাবু রমেশকে কহিলেন, "কাল সকালের গাড়িতেই তোমাকে দেশে যাইতে হইবে।"

রমেশ মাথা চুলকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বিশেষ কোনো কাজ আছে কি।"

ব্রজমোহনবাবু কহিলেন, "এমন-কিছু গুরুতর নহে।"

তবে এত তাগিদ কেন, সেটুকু শুনিবার জন্য রমেশ পিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, সে কৌতূহল নিবৃত্তি করা তিনি আবশ্যক বোধ করিলেন না।

ব্রজমোহনবাবু সন্ধ্যার সময় যখন তাঁহার কলিকাতার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করিতে বাহির হইলেন, তখন রমেশ তাঁহাকে একটা পত্র লিখিতে বসিল। 'শ্রীচরণকমলেষু' পর্যন্ত লিখিয়া লেখা আর অগ্রসর হইতে চাহিল না। কিন্তু রমেশ মনে মনে কহিল, "আমি হেমনলিনীসম্বন্ধে যে অনুচ্চারিত সত্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি, বাবার কাছে আর তাহা গোপন করা কোনোমতেই উচিত হইবে না।" অনেকগুলা চিঠি অনেক রকম করিয়া লিখিল—সমস্তই সে ছিঁড়িয়া ফেলিল।

ব্রজমোহন আহার করিয়া আরামে নিদ্রা দিলেন। রমেশ বাড়ির ছাদের উপর উঠিয়া প্রতিবেশীর বাড়ির দিকে তাকাইয়া নিশাচরের মতো সবেগে পায়চারি করিতে লাগিল।

রাত্রি নয়টার সময় অক্ষয় অন্নদাবাবুর বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেল—রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় রাস্তার দিকের দরজা বন্ধ হইল—রাত্রি দশটার সময় অন্নদাবাবুর বসিবার ঘরের আলো নিবিল, রাত্রি সাড়ে দশটার পর সে-বাড়ির কক্ষে কক্ষে সুগভীর সুষুপ্তি বিরাজ করিতে লাগিল।

পরদিন ভোরের ট্রেনে রমেশকে রওনা হইতে হইল। ব্রজমোহন-বাবুর সতর্কতায় গাড়ি ফেল করিবার কোনোই সুযোগ উপস্থিত হইল না।

২

বাড়ি গিয়া রমেশ খবর পাইল, তাহার বিবাহের পাত্রী ও দিন স্থির হইয়াছে। তাহার পিতা ব্রজমোহনের বাল্যবন্ধু ঈশান যখন ওকালতি করিতেন, তখন ব্রজমোহনের অবস্থা ভালো ছিল না—ঈশানের সহায়তাতেই তিনি উন্নতিলাভ করিয়াছেন। সেই ঈশান যখন অকালে মারা পড়িলেন, তখন দেখা গেল তাঁহার সঞ্চয় কিছুই নাই, দেনা আছে। বিধবা স্ত্রী একটি শিশু-কন্যাকে লইয়া দারিদ্র্যের মধ্যে ডুবিয়া পড়িলেন। সেই কন্যাটি আজ বিবাহযোগ্যা হইয়াছে, ব্রজমোহন তাহারই সঙ্গে রমেশের বিবাহ স্থির করিয়াছেন। রমেশের হিতৈষীরা কেহ কেহ আপত্তি করিয়া বলিয়াছিল যে, শুনিয়াছি মেয়েটি দেখিতে তেমন ভালো নয়। ব্রজমোহন কহিলেন, "ও-সকল কথা আমি ভালো বুঝি না—মানুষ তো ফুল কিংবা প্রজাপতিমাত্র নয় যে, ভালো-দেখার বিচারটাই সর্বাগ্রে তুলিতে হইবে। মেয়েটির মা যেমন সতী-সাধ্বী, মেয়েটিও যদি তেমনি হয়, তবে রমেশ যেন তাহাই ভাগ্য বলিয়া জ্ঞান করে।"

শুভবিবাহের জনশ্রুতিতে রমেশের মুখ শুকাইয়া গেল। সে উদাসের মতো ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। নিষ্কৃতিলাভের নানাপ্রকার উপায় চিন্তা করিয়া কোনোটাই তাহার সম্ভবপর বোধ হইল না। শেষকালে বহুকষ্টে সংকোচ দূর করিয়া পিতাকে গিয়া কহিল, "বাবা,

এ বিবাহ আমার পক্ষে অসাধ্য। আমি অন্যস্থানে পণে আবদ্ধ হইয়াছি।"

ব্রজমোহন। বলো কী। একেবারে পানপত্র হইয়া গেছে?

রমেশ। না, ঠিক পানপত্র নয়, পরে—

ব্রজমোহন। কন্যাপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা সব ঠিক হইয়া গেছে?

রমেশ। না, কথাবার্তা যাহাকে বলে, তাহা হয় নাই—

ব্রজমোহন। হয় নাই তো! তবে এতদিন যখন চুপ করিয়া আছ, তখন আর-কটা দিন চুপ করিয়া গেলেই হইবে।

রমেশ একটু নীরবে থাকিয়া কহিল, "আর-কোনো কন্যাকে আমার পত্নীরূপে গ্রহণ করা অন্যায় হইবে।"

ব্রজমোহন কহিলেন, "না-করা তোমার পক্ষে আরও বেশি অন্যায় হইতে পারে।"

রমেশ আর-কিছু বলিতে পারিল না। সে ভাবিতে লাগিল, "ইতিমধ্যে দৈবক্রমে সমস্ত ফাঁসিয়া যাইতে পারে।"

রমেশের বিবাহের যে দিন স্থির হইয়াছিল, তাহার পরে এক বৎসর অকাল ছিল— সে ভাবিয়াছিল, কোনোক্রমে সেই দিনটা পার হইয়া গেলেই তাহার এক বৎসর মেয়াদ বাড়িয়া যাইবে।

কন্যার বাড়ি নদীপথ দিয়া যাইতে হইবে—নিতান্ত কাছে নহে—ছোটো-বড়ো দুটো-তিনটে নদী উত্তীর্ণ হইতে তিন-চার দিন লাগিবার কথা। ব্রজমোহন দৈবের জন্য যথেষ্ট পথ ছাড়িয়া দিয়া এক সপ্তাহ পূর্বে শুভদিনে যাত্রা করিলেন।

বরাবর বাতাস অনুকূল ছিল। শিমুলঘাটায় পৌঁছিতে পুরা তিন দিনও লাগিল না। বিবাহের এখনো চার দিন দেরি আছে।

ব্রজমোহনবাবুর দু-চার দিন আগে আসিবারই ইচ্ছা ছিল।

শিমুলঘাটায় তাঁহার বেহান দীন অবস্থায় থাকেন। ব্রজমোহনবাবুর অনেকদিনের ইচ্ছা ছিল, ইঁহার বাসস্থান তাঁহাদের স্বগ্রামে উঠাইয়া লইয়া ইঁহাকে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখেন ও বন্ধুঋণ শোধ করেন। কোনো আত্মীয়তার সম্পর্ক না থাকাতে হঠাৎ সে-প্রস্তাব করা সংগত মনে করেন নাই। এবারে বিবাহ উপলক্ষ্যে তাঁহার বেহানকে তিনি বাস উঠাইয়া লইতে রাজি করাইয়াছেন। সংসারে বেহানের একটিমাত্র কন্যা,—তাঁহার কাছে থাকিয়া মাতৃহীন জামাতার মাতৃস্থান অধিকার করিয়া থাকিবেন, ইহাতে তিনি আপত্তি করিতে পারিলেন না। তিনি কহিলেন, "যে যাহা বলে বলুক, যেখানে আমার মেয়ে-জামাই থাকিবে, সেখানেই আমার স্থান।"

বিবাহের কিছুদিন আগে আসিয়া ব্রজমোহনবাবু তাঁহার বেহানের ঘরকন্না তুলিয়া লইবার ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিবাহের পর সকলে মিলিয়া একসঙ্গে যাত্রা করাই তাঁহার ইচ্ছা। এইজন্য তিনি বাড়ি হইতে আত্মীয় স্ত্রীলোক কয়েকজনকে সঙ্গেই আনিয়াছিলেন।

বিবাহকালে রমেশ ঠিকমতো মন্ত্র আবৃত্তি করিল না, শুভদৃষ্টির সময় চোখ বুজিয়া রহিল, বাসরঘরের হাস্যোৎপাত নীরবে নতমুখে সহ্য করিল, রাত্রে শয্যাপ্রান্তে পাশ ফিরিয়া রহিল, প্রত্যুষে বিছানা হইতে উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

বিবাহ সম্পন্ন হইলে মেয়েরা এক নৌকায়, বৃদ্ধেরা এক নৌকায়, বর ও বয়স্যগণ আর-এক নৌকায় যাত্রা করিল। অন্য এক নৌকায় রোশন-চৌকির দল যখন-তখন যে-সে রাগিণী যেমন-তেমন করিয়া আলাপ করিতে লাগিল।

সমস্ত দিন অসহ্য গরম। আকাশে মেঘ নাই, অথচ একটা বিবর্ণ আচ্ছাদনে চারিদিক ঢাকা পড়িয়াছে— তীরের তরুশ্রেণী পাংশুবর্ণ।

গাছের পাতা নড়িতেছে না। দাঁড়িমাঝিরা গলদঘর্ম। সন্ধ্যার অন্ধকার জমিবার পূর্বেই মাল্লারা কহিল, "কর্তা, নৌকা এইবার ঘাটে বাঁধি— সম্মুখে অনেকদূর আর নৌকা রাখিবার জায়গা নাই।" ব্রজমোহনবাবু পথে বিলম্ব করিতে চান না। তিনি কহিলেন, "এখানে বাঁধিলে চলিবে না। আজ প্রথমরাত্রে জ্যোৎস্না আছে, আজ বালুহাটায় পৌঁছিয়া নৌকা বাঁধিব। তোরা বকশিশ পাইবি।"

নৌকা গ্রাম ছাড়াইয়া চলিয়া গেল। এক দিকে চর ধুধু করিতেছে, আর-এক দিকে ভাঙা উচ্চ পাড়। কুহেলিকার মধ্যে চাঁদ উঠিল, কিন্তু তাহাকে মাতালের চক্ষুর মতো অত্যন্ত ঘোলা দেখাইতে লাগিল।

এমন সময় আকাশে মেঘ নাই, কিছু নাই, অথচ কোথা হইতে একটা গর্জনধ্বনি শোনা গেল। পশ্চাতে দিগন্তের দিকে চাহিয়া দেখা গেল, একটা প্রকাণ্ড অদৃশ্য সম্মার্জনী ভাঙা ডালপালা, খড়কুটা, ধুলাবালি আকাশে উড়াইয়া প্রচণ্ডবেগে ছুটিয়া আসিতেছে। "রাখ্ রাখ্, সামাল সামাল, হায় হায়" করিতে করিতে মুহূর্তকাল পরে কী হইল, কেহই বলিতে পারিল না। একটা ঘূর্ণা হাওয়া একটি পথমাত্র আশ্রয় করিয়া প্রবলবেগে সমস্ত উন্মূলিত বিপর্যস্ত করিয়া দিয়া নৌকা-কয়টাকে কোথায় কী করিল, তাহার কোনো উদ্দেশ পাওয়া গেল না।

৩

কুহেলিকা কাটিয়া গেছে। বহুদূরব্যাপী মরুময় বালুভূমিকে নির্মল জ্যোৎস্না বিধবার শুভ্রবসনের মতো আচ্ছন্ন করিয়াছে। নদীতে নৌকা ছিল না, ঢেউ ছিল না, রোগযন্ত্রণার পরে মৃত্যু যেরূপ নির্বিকার

শান্তি বিকীর্ণ করিয়া দেয়, সেইরূপ শান্তি জলে স্থলে স্তব্ধভাবে বিরাজ করিতেছে।

সংজ্ঞালাভ করিয়া রমেশ দেখিল, সে বালির তটে পড়িয়া আছে। কী ঘটিয়াছিল, তাহা মনে করিতে তাহার কিছুক্ষণ সময় গেল— তাহার পরে দুঃস্বপ্নের মতো সমস্ত ঘটনা তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। তাহার পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়গণের কী দশা হইল, সন্ধান করিবার জন্য সে উঠিয়া পড়িল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কোথাও কাহারো কোনো চিহ্ন নাই। বালুতটের তীর বাহিয়া সে খুঁজিতে খুঁজিতে চলিল।

পদ্মার দুই শাখাবাহুর মাঝখানে এই শুভ্র দ্বীপটি উলঙ্গ শিশুর মতো উর্ধ্বমুখে শয়ান রহিয়াছে। রমেশ যখন একটি শাখার তীরপ্রান্ত ঘুরিয়া অন্য শাখার তীরে গিয়া উপস্থিত হইল, তখন কিছুদূরে একটা লাল কাপড়ের মতো দেখা গেল। দ্রুতপদে কাছে আসিয়া রমেশ দেখিল, লাল-চেলি-পরা নববধূটি প্রাণহীন ভাবে পড়িয়া আছে।

জলমগ্ন মুমূর্ষুর শ্বাসক্রিয়া কিরূপ কৃত্রিম উপায়ে ফিরাইয়া আনিতে হয়, রমেশ তাহা জানিত। অনেকক্ষণ ধরিয়া রমেশ বালিকার বাহুদুটি একবার তাহার শিয়রের দিকে প্রসারিত করিয়া পরক্ষণেই তাহার পেটের উপরে চাপিয়া ধরিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে বধূর নিশ্বাস বহিল এবং সে চক্ষু মেলিল।

রমেশ তখন অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বালিকাকে কোনো প্রশ্ন করিবে, সেটুকু শ্বাসও যেন তাহার আয়ত্তের মধ্যে ছিল না।

বালিকা তখনো সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করে নাই। একবার চোখ মেলিয়া তখনি তাহার চোখের পাতা মুদিয়া আসিল। রমেশ পরীক্ষা করিয়া দেখিল, তাহার শ্বাসক্রিয়ার আর কোনো ব্যাঘাত নাই। তখন এই

জনহীন জলস্থলের সীমায় জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে সেই পাণ্ডুর জ্যোৎস্নালোকে রমেশ বালিকার মুখের দিকে অনেক্ষণ চাহিয়া রহিল।

কে বলিল, সুশীলাকে ভালো দেখিতে নয়। এই নিমীলিতনেত্র সুকুমার মুখখানি ছোটো— তবু এতবড়ো আকাশের মাঝখানে, বিস্তীর্ণ জ্যোৎস্নায় কেবল এই সুন্দর কোমল মুখ একটিমাত্র দেখিবার জিনিসের মতো গৌরবে ফুটিয়া আছে।

রমেশ আর-সকল কথা ভুলিয়া ভাবিল, "ইহাকে যে বিবাহসভার কলরব ও জনতার মধ্যে দেখি নাই, সে ভালোই হইয়াছে। ইহাকে এমন করিয়া আর-কোথাও দেখিতে পাইতাম না। ইহার মধ্যে নিশ্বাস সঞ্চার করিয়া বিবাহের মন্ত্রপাঠের চেয়ে ইহাকে অধিক আপনার করিয়া লইয়াছি। মন্ত্র পড়িয়া ইহাকে আপনার নিশ্চিত প্রাপ্যস্বরূপ পাইতাম, এখানে ইহাকে অনুকূল বিধাতার প্রসাদের স্বরূপ লাভ করিলাম।"

জ্ঞানলাভ করিয়া বধূ উঠিয়া শিথিল বস্ত্র সারিয়া লইয়া মাথায় ঘোমটা তুলিয়া দিল। রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের নৌকার আর-সকলে কোথায় গেছেন, কিছু জানো?"

সে কেবল নীরবে মাথা নাড়িল। রমেশ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এইখানে একটুখানি বসিতে পারিবে, আমি একবার চারিদিক ঘুরিয়া সকলের সন্ধান লইয়া আসিব?"

বালিকা তাহার কোনো উত্তর করিল না। কিন্তু তাহার সর্বশরীর যেন সংকুচিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "এখানে আমাকে একলা ফেলিয়া যাইয়ো না।"

রমেশ তাহা বুঝিতে পারিল। সে একবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া চারিদিকে তাকাইল— সাদা বালির মধ্যে কোথাও কোনো চিহ্নমাত্র নাই।

আত্মীয়দিগকে আহ্বান করিয়া প্রাণপণ উর্ধ্বকণ্ঠে ডাকিতে লাগিল, কাহারো কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

রমেশ বৃথা চেষ্টায় ক্ষান্ত হইয়া বসিয়া দেখিল— বধূ মুখে দুই হাত দিয়া কান্না চাপিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহার বুক ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। রমেশ সান্ত্বনার কোনো কথা না বলিয়া বালিকার কাছে ঘেঁষিয়া বসিয়া আস্তে আস্তে তাহার মাথায় পিঠে হাত বুলাইতে লাগিল। তাহার কান্না আর চাপা রহিল না— অব্যক্তকণ্ঠে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। রমেশের দুই চক্ষু দিয়াও জলধারা ঝরিয়া পড়িল।

শ্রান্ত হৃদয় যখন রোদন বন্ধ করিল, তখন চন্দ্র অস্ত গেছে। অন্ধকারের মধ্য দিয়া এই নির্জন ধরাখণ্ড অদ্ভুত স্বপ্নের মতো বোধ হইল। বালুচরের অপরিস্ফুট শুভ্রতা প্রেতলোকের মতো পাণ্ডুবর্ণ। নক্ষত্রের ক্ষীণালোকে নদী অজগরসর্পের চিক্কণ কৃষ্ণচর্মের মতো স্থানে স্থানে ঝিকঝিক করিতেছে।

তখন-রমেশ বালিকার ভয়শীতল কোমল ক্ষুদ্র দুইটি হাত দুই হাতে তুলিয়া লইয়া বধূকে আপনার দিকে ধীরে আকর্ষণ করিল। শঙ্কিত বালিকা কোনো বাধা দিল না। মানুষকে কাছে অনুভব করিবার জন্য সে তখন ব্যাকুল। অটল অন্ধকারের মধ্যে নিশ্বাসস্পন্দিত রমেশের বক্ষপটে আশ্রয়লাভ করিয়া সে আরাম বোধ করিল। তখন তাহার লজ্জা করিবার সময় নহে। রমেশের দুই বাহুর মধ্যে সে আপনি নিবিড় আগ্রহের সহিত আপনার স্থান করিয়া লইল।

প্রত্যুষের শুকতারা যখন অস্ত যায়-যায়, পূর্বদিকে নীল নদীরেখার উপরে প্রথমে আকাশ যখন পাণ্ডুবর্ণ ও ক্রমশ রক্তিম হইয়া উঠিল, তখন দেখা গেল, নিদ্রাবিহ্বল রমেশ বালির উপরে শুইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার বুকের কাছে বাহুতে মাথা রাখিয়া নববধূ সুগভীর নিদ্রায় মগ্ন।

অবশেষে প্রভাতের মৃদু রৌদ্র যখন উভয়ের চক্ষুপুট স্পর্শ করিল, তখন উভয়ে শশব্যস্ত হইয়া জাগিয়া উঠিয়া বসিল। বিস্মিত হইয়া কিছুক্ষণের জন্য চারিদিকে চাহিল; তাহার পরে হঠাৎ মনে পড়িল যে, তাহারা ঘরে নাই, মনে পড়িল, তাহারা ভাসিয়া আসিয়াছে।

৪

সকালবেলায় জেলেডিঙির সাদা-সাদা পালে নদী খচিত হইয়া উঠিল। রমেশ তাহারই একটিকে ডাকাডাকি করিয়া লইয়া জেলেদের সাহায্যে একখানি বড়ো পানসি ভাড়া করিল এবং নিরুদ্দেশ আত্মীয়দের সন্ধানের জন্য পুলিস নিযুক্ত করিয়া বধূকে লইয়া গৃহে রওনা হইল।

গ্রামের ঘাটের কাছে নৌকা পৌঁছিতেই রমেশ খবর পাইল যে, তাহার পিতার, শাশুড়ীর ও আর-কয়েকটি আত্মীয়-বন্ধুর মৃতদেহ নদী হইতে পুলিস উদ্ধার করিয়াছে। জনকয়েক মাল্লা ছাড়া আর যে কেহ বাঁচিয়াছে, এমন আশা আর কাহারও রহিল না।

বাড়িতে রমেশের বৃদ্ধা ঠাকুরমা ছিলেন, তিনি বধূসহ রমেশকে ফিরিতে দেখিয়া উচ্চকলরবে কাঁদিতে লাগিলেন। পাড়ার যে সকল বরযাত্র গিয়াছিল, তাহাদেরও ঘরে ঘরে কান্না পড়িয়া গেল। শাঁখ বাজিল না, হুলুধ্বনি হইল না, কেহ বধূকে বরণ করিয়া লইল না, কেহ তাহার দিকে তাকাইল না মাত্র।

শ্রাদ্ধশান্তি শেষ হইবার পরেই রমেশ বধূকে লইয়া অন্যত্র যাইবে স্থির করিয়াছিল— কিন্তু পৈতৃক বিষয়সম্পত্তির ব্যবস্থা না করিয়া তাহার শীঘ্র নড়িবার জো ছিল না। পরিবারের শোকাতুর স্ত্রীলোকগণ তীর্থ-বাসের জন্য তাহাকে ধরিয়া পড়িয়াছে, তাহারও বিধান করিতে হইবে।

এই সকল কাজকর্মের অবকাশকালে রমেশ প্রণয়চর্চায় অমনোযোগী ছিল না। যদিও পূর্বে যেমন শুনা গিয়াছিল, বধূ তেমন নিতান্ত বালিকা নয়, এমন কি, গ্রামের মেয়েরা ইহাকে অধিকবয়স্কা বলিয়া ধিক্কার দিতেছিল, তবু ইহার সহিত কেমন করিয়া যে প্রণয় হইতে পারে, এই বি. এ. পাশ করা ছেলেটি তাহার কোনো পুঁথির মধ্যে সে-উপদেশ প্রাপ্ত হয় নাই। সে চিরকাল ইহা অসম্ভব এবং অসংগত বলিয়াই জানিত। তবু কোনো বই-পড়া অভিজ্ঞতার সঙ্গে কিছুমাত্র না মিলিলেও, আশ্চর্য এই যে, তাহার উচ্চশিক্ষিত মন ভিতরে-ভিতরে একটি অপরূপ রসে পরিপূর্ণ হইয়া এই ছোটো মেয়েটির দিকে অবনত হইয়া পড়িয়াছিল। সে এই বালিকার মধ্যে কল্পনার দ্বারা তাহার ভবিষ্যৎ গৃহলক্ষ্মীকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে। সেই উপায়ে তাহার স্ত্রী একইকালে বালিকা বধূ, তরুণী প্রেয়সী এবং সন্তানদিগের অপ্রগল্‌ভা মাতা রূপে তাহার ধ্যাননেত্রের সম্মুখে বিচিত্রভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। চিত্রকর তাহার ভাবী চিত্রকে, কবি তাহার ভাবী কাব্যকে যেরূপ সম্পূর্ণ সুন্দররূপে কল্পনা করিয়া হৃদয়ের মধ্যে একান্ত আদরে লালন করিতে থাকে, রমেশ সেইরূপ এই ক্ষুদ্র বালিকাকে উপলক্ষ্যমাত্র করিয়া ভাবী প্রেয়সীকে— কল্যাণীকে পূর্ণমহীয়সী মূর্তিতে হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিল।

৫

এইরূপে প্রায় তিন মাস অতীত হইয়া গেল। বৈষয়িক ব্যবস্থা সমস্ত সমাধা হইয়া আসিল। প্রাচীনারা তীর্থবাসের জন্য প্রস্তুত হইলেন। প্রতিবেশীমহল হইতে দুই-একটি সঙ্গিনী নববধূর সহিত পরিচয়স্থাপনের

জন্য অগ্রসর হইতে লাগিল। রমেশের সঙ্গে বালিকার প্রণয়ের প্রথম গ্রন্থি অল্পে অল্পে আঁট হইয়া আসিল।

এখন সন্ধ্যাবেলায় নির্জন ছাদে খোলা আকাশের তলে দুজনে মাদুর পাতিয়া বসিতে আরম্ভ করিয়াছে। রমেশ পিছন হইতে হঠাৎ বালিকার চোখ টিপিয়া ধরে, তাহার মাথাটা বুকের কাছে টানিয়া আনে, বধূ যখন রাত্রি অধিক না হইতেই না খাইয়া ঘুমাইয়া পড়ে, রমেশ তখন নানাবিধ উপদ্রবে তাহাকে সচেতন করিয়া তাহার বিরক্তি-তিরস্কার লাভ করে।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় রমেশ বালিকার খোঁপা ধরিয়া নাড়া দিয়া কহিল, "সুশীলা, আজ তোমার চুলবাঁধা ভালো হয় নাই।"

বালিকা বলিয়া বসিল, "আচ্ছা, তোমরা সকলেই আমাকে সুশীলা বলিয়া ডাক কেন।"

রমেশ এ প্রশ্নের তাৎপর্য কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বধূ কহিল, "আমার নাম বদল হইলেই কি আমার পয় ফিরিবে। আমি তো শিশুকাল হইতেই অপয়মন্ত— না মরিলে আমার অলক্ষণ ঘুচিবে না।"

হঠাৎ রমেশের বুক ধক করিয়া উঠিল, তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল— কোথায় কী-একটা প্রমাদ ঘটিয়াছে, এ সংশয় হঠাৎ তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, "শিশুকাল হইতেই তুমি অপয়মন্ত কিসে হইলে।"

বধূ কহিল, "আমার জন্মের পূর্বেই আমার বাবা মরিয়াছেন, আমাকে জন্মদান করিয়া তাহার ছয় মাসের মধ্যে আমার মা মারা গেছেন। মামার বাড়িতে অনেক কষ্টে ছিলাম। হঠাৎ শুনিলাম,

কোথা হইতে আসিয়া তুমি আমাকে পছন্দ করিলে— দুই দিনের মধ্যেই বিবাহ হইয়া গেল, তার পরে দেখো, কী-সব বিপদই ঘটিল।”

রমেশ নিশ্চল হইয়া তাকিয়ার উপরে শুইয়া পড়িল। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল, তাহার জ্যোৎস্না কালি হইয়া গেল। রমেশের দ্বিতীয় প্রশ্ন করিতে ভয় হইতে লাগিল। যতটুকু জানিয়া ফেলিয়াছে, সেটুকুকে সে প্রলাপ বলিয়া, স্বপ্ন বলিয়া সুদূরে ঠেলিয়া রাখিতে চায়। সংজ্ঞাপ্রাপ্ত মূর্ছিতের দীর্ঘশ্বাসের মতো গ্রীষ্মের দক্ষিণ হাওয়া বহিতে লাগিল। জ্যোৎস্নালোকে নিদ্রাহীন কোকিল ডাকিতেছে— অদূরে নদীর ঘাটে বাঁধা নৌকার ছাদ হইতে মাঝিদের গান আকাশে ব্যাপ্ত হইতেছে। অনেকক্ষণ কোনো সাড়া না পাইয়া বধূ অতি ধীরে ধীরে রমেশকে স্পর্শ করিয়া কহিল, “ঘুমাইতেছ ?”

রমেশ কহিল, “না।”

তাহার পরেও অনেকক্ষণ রমেশের আর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। বধূ কখন্ আস্তে আস্তে ঘুমাইয়া পড়িল। রমেশ উঠিয়া বসিয়া তাহার নিদ্রিত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বিধাতা ইহার ললাটে যে গুপ্তলিখন লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহা আজো এই মুখে একটি আঁক কাটে নাই। এমন সৌন্দর্যের ভিতরে সেই ভীষণ পরিণাম কেমন করিয়া প্রচ্ছন্ন হইয়া বাস করিতেছে।

৬

বালিকা যে রমেশের পরিণীতা স্ত্রী নহে, এ-কথা রমেশ বুঝিল, কিন্তু সে যে কাহার স্ত্রী, তাহা বাহির করা সহজ হইল না। রমেশ তাহাকে কৌশল করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “বিবাহের সময় তুমি আমাকে যখন প্রথম দেখিলে, তখন তোমার কী মনে হইল ?”
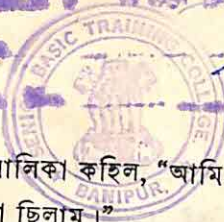
বালিকা কহিল, "আমি তো তোমাকে দেখি নাই, আমি চোখ নিচু করিয়া ছিলাম।"

রমেশ। তুমি আমার নামও শুন নাই ?

বালিকা। যেদিন শুনিলাম বিবাহ হইবে, তাহার পরের দিনই বিবাহ হইয়া গেল— তোমার নাম আমি শুনিই নাই। মামী আমাকে তাড়াতাড়ি বিদায় করিয়া বাঁচিয়াছেন।

রমেশ। আচ্ছা, তুমি যে লিখিতে-পড়িতে শিখিয়াছ, তোমার নিজের নাম বানান করিয়া লেখো দেখি।

রমেশ তাহাকে একটু কাগজ, একটা পেনসিল দিল। সে বলিল, "তা বুঝি আমি আর পারি না। আমার নাম বানান করা খুব সহজ।" —বলিয়া বড়ো বড়ো অক্ষরে নিজের নাম লিখিল—শ্রীমতী কমলা দেবী।

রমেশ। আচ্ছা, মামার নাম লেখো।

কমলা লিখিল— শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়।

জিজ্ঞাসা করিল, "কোথাও ভুল হইয়াছে ?"

রমেশ কহিল, "না। আচ্ছা, তোমাদের গ্রামের নাম লেখো দেখি।"

সে লিখিল, ধোবাপুকুর।

এইরূপে নানা উপায়ে অত্যন্ত সাবধানে রমেশ এই বালিকার যেটুকু জীবনবৃত্তান্ত আবিষ্কার করিল, তাহাতে বড়ো-একটা সুবিধা হইল না।

তাহার পরে রমেশ কর্তব্যসম্বন্ধে ভাবিতে বসিয়া গেল। খুব সম্ভব ইহার স্বামী ডুবিয়া মরিয়াছে। যদি বা শ্বশুরবাড়ির সন্ধান পাওয়া যায়, সেখানে পাঠাইলে তাহারা ইহাকে গ্রহণ করিবে কি না, সন্দেহ। মামার বাড়ি পাঠাইতে গেলেও ইহার প্রতি ন্যায়াচরণ করা হইবে না। এতকাল বধূভাবে অন্যের বাড়িতে বাস করার পর আজ যদি প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করা যায়, তবে সমাজে ইহার কী গতি হইবে, কোথায়

ইহার স্থান হইবে। স্বামী যদি বাঁচিয়াই থাকে, তবে সে কি ইহাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা বা সাহস করিবে। এখন এই মেয়েটিকে যেখানেই ফেলা হইবে, সেখানেই সে অতল সমুদ্রের মধ্যে পড়িবে।

ইহাকে স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোনোরূপেই রমেশ নিজের কাছে রাখিতে পারে না, অন্যত্রও কোথাও ইহাকে রাখিবার স্থান নাই। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাকে নিজের স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করাও চলে না। রমেশ এই বালিকাটিকে ভবিষ্যতের পটে নানাবর্ণের স্নেহসিক্ত তুলি দ্বারা ফলাইয়া যে গৃহলক্ষ্মীর মূর্তি আঁকিয়া তুলিতেছিল, তাহা আবার তাড়াতাড়ি মুছিতে হইল।

রমেশ আর তাহার গ্রামে থাকিতে পারিল না। কলিকাতায় লোকের ভিড়ের মধ্যে আচ্ছন্ন থাকিয়া একটা-কিছু উপায় খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে, এই কথা মনে করিয়া রমেশ কমলাকে লইয়া কলিকাতায় আসিল এবং পূর্বে যেখানে ছিল, সেখান হইতে দূরে নূতন এক বাসা ভাড়া করিল।

কলিকাতা দেখিবার জন্য কমলার আগ্রহের সীমা ছিল না। প্রথম দিন বাসার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সে জানালায় গিয়া বসিল—সেখান হইতে জনস্রোতের অবিশ্রাম প্রবাহে তাহার মনকে নূতন নূতন কৌতূহলে ব্যাপৃত করিয়া রাখিল। ঘরে একজন ঝি ছিল, কলিকাতা তাহার পক্ষে অত্যন্ত পুরাতন। সে বালিকার বিস্ময়কে নিরর্থক মূঢ়তা জ্ঞান করিয়া বিরক্ত হইয়া বলিতে লাগিল, "হাঁগা, হাঁ করিয়া কী দেখিতেছ? বেলা যে অনেক হইল, চান করিবে না?"

ঝি দিনের বেলায় কাজ করিয়া রাত্রে বাড়ি চলিয়া যাইবে। রাত্রে থাকিবে, এমন লোক পাওয়া গেল না। রমেশ ভাবিতে লাগিল,

"কমলাকে এখন তো এক শয্যায় আর রাখিতে পারি না— অপরিচিত জায়গায় সে বালিকা একলাই বা কী করিয়া রাত কাটাইবে।"

রাত্রে আহারের পর ঝি চলিয়া গেল। রমেশ কমলাকে তাহার বিছানা দেখাইয়া কহিল, "তুমি শোও, আমার এই বই পড়া হইলে আমি পরে শুইব।"

এই বলিয়া রমেশ একখানা বই খুলিয়া পড়িবার ভান করিল, শ্রান্ত কমলার ঘুম আসিতে বিলম্ব হইল না।

সে-রাত্রি এমনি করিয়া কাটিল। পররাত্রেও রমেশ কোনো ছলে কমলাকে একলা বিছানায় শোয়াইয়া দিল। সেদিন বড়ো গরম ছিল। শোবার ঘরের সামনে একটুখানি খোলা ছাদ আছে, সেইখানে একটা শতরঞ্চি পাতিয়া রমেশ শয়ন করিল এবং নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে ও হাতপাখার বাতাস খাইতে খাইতে গভীর রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িল।

রাত্রি দুটা-তিনটার সময় আধঘুমে রমেশ অনুভব করিল, সে একলা শুইয়া নয় এবং তাহার পাশে আস্তে আস্তে একটি হাতপাখা চলিতেছে। রমেশ ঘুমের ঘোরে পার্শ্ববর্তিনীকে কাছে টানিয়া লইয়া বিজড়িতস্বরে কহিল, "সুশীলা, তুমি ঘুমাও, আমাকে পাখা করিতে হইবে না।" অন্ধকারভীরু কমলা রমেশের বাহুপাশে তাহার বক্ষপট আশ্রয় করিয়া আরামে ঘুমাইয়া পড়িল।

ভোরের বেলায় রমেশ জাগিয়া চমকিয়া উঠিল। দেখিল, নিদ্রিত কমলার ডান হাতখানি তাহার কণ্ঠে জড়ানো— সে দিব্য অসংকোচে রমেশের 'পরে আপন বিশ্বস্ত অধিকার বিস্তার করিয়া তাহার বক্ষে লগ্ন হইয়াছে। নিদ্রিত বালিকার মুখের দিকে চাহিয়া রমেশের দুই চোখ জলে ভাসিয়া আসিল। এই সংশয়হীন কোমল বাহু পাশ সে কেমন করিয়া বিচ্ছিন্ন করিবে। রাত্রে বালিকা যে কখন্ এক সময় তাহার

পাশে আসিয়া তাহাকে আস্তে আস্তে বাতাস করিতেছিল, সে-কথাও তাহার মনে পড়িল—দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বালিকার বাহুবন্ধন শিথিল করিয়া রমেশ বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া গেল।

অনেক চিন্তা করিয়া রমেশ বালিকাবিদ্যালয়ের বোর্ডিঙে কমলাকে রাখা স্থির করিয়াছে। তাহা হইলে এখনকার মতো অন্তত কিছুকাল সে ভাবনার হাত হইতে উদ্ধার পায়।

রমেশ কমলাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কমলা, তুমি পড়াশুনা করিবে ?"

কমলা রমেশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল— ভাবটা এই যে, "তুমি কী বল।"

রমেশ লেখাপড়ার উপকারিতা ও আনন্দের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিল। তাহার কিছু প্রয়োজন ছিল না। কমলা কহিল, "আমাকে পড়াশুনা শেখাও।"

রমেশ কহিল, "তাহা হইলে তোমাকে ইস্কুলে যাইতে হইবে।"

কমলা বিস্মিত হইয়া কহিল, "ইস্কুলে ? এত বড়ো মেয়ে হইয়া আমি ইস্কুলে যাইব ?"

কমলার এই বয়োমর্যাদার অভিমানে রমেশ ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "তোমার চেয়েও অনেক বড়ো মেয়ে ইস্কুলে যায়।"

কমলা তাহার পরে আর কিছু বলিল না, গাড়ি করিয়া একদিন রমেশের সঙ্গে ইস্কুলে গেল। প্রকাণ্ড বাড়ি— তাহার চেয়ে অনেক বড়ো এবং ছোটো কত যে মেয়ে, তাহার ঠিকানা নাই। বিদ্যালয়ের কর্ত্রীর হাতে কমলাকে সমর্পণ করিয়া রমেশ যখন চলিয়া আসিতেছে, কমলাও তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিল। রমেশ কহিল, "কোথায় আসিতেছ ? তোমাকে যে এইখানে থাকিতে হইবে।"

কমলা ভীতকণ্ঠে কহিল, "তুমি এখানে থাকিবে না ?"

রমেশ। আমি তো এখানে থাকিতে পারি না।

কমলা রমেশের হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "তবে আমি এখানে থাকিতে পারিব না, আমাকে লইয়া চলো।"

রমেশ হাত ছাড়াইয়া কহিল, "ছি কমলা।"

এই ধিক্কারে কমলা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল, তাহার মুখখানি একেবারে ছোটো হইয়া গেল। রমেশ ব্যথিতচিত্তে তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিল, কিন্তু বালিকার সেই স্তম্ভিত অসহায় ভীত মুখশ্রী তাহার মনে মুদ্রিত হইয়া রহিল।

৭

এইবার আলিপুরে ওকালতির কাজ শুরু করিয়া দিবে, রমেশের এইরূপ সংকল্প ছিল। কিন্তু তাহার মন ভাঙিয়া গেছে। চিত্ত স্থির করিয়া কাজে হাত দিবার এবং প্রথম কার্যারম্ভের নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিবার মতো স্ফূর্তি তাহার ছিল না। সে এখন কিছুদিন গঙ্গার পোলের উপর এবং গোলদিঘিতে অনাবশ্যক ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। একবার মনে করিল কিছুদিন পশ্চিমে ভ্রমণ করিয়া আসি, এমন সময় অন্নদাবাবুর কাছ হইতে একখানি চিঠি পাইল।

অন্নদাবাবু লিখিতেছেন—

"গেজেটে দেখিলাম, তুমি পাস হইয়াছ— কিন্তু সে খবর তোমার নিকট হইতে না পাইয়া দুঃখিত হইলাম। বহুকাল তোমার কোনো সংবাদ পাই নাই। তুমি কেমন আছ, এবং কবে কলিকাতায় আসিবে, জানাইয়া আমাকে নিশ্চিন্ত ও সুখী করিবে।"

এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, অন্নদাবাবু যে বিলাতগত ছেলেটির 'পরে তাঁহার চক্ষু রাখিয়াছিলেন, সে ব্যারিস্টার হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে এবং এক ধনিকন্যার সহিত তাহার বিবাহের আয়োজন চলিতেছে।

ইতিমধ্যে যে-সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার পরে হেমনলিনীর সহিত পূর্বের ন্যায় সাক্ষাৎ করা তাহার কর্তব্য হইবে কি না, তাহা রমেশ কোনোমতেই স্থির করিতে পারিল না; সম্প্রতি কমলার সহিত তাহার যে-সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে, সে-কথা কাহাকেও বলা সে কর্তব্য বোধ করে না: নিরপরাধা কমলাকে সে সংসারের কাছে অপদস্থ করিতে পারে না। অথচ সকল কথা স্পষ্ট না বলিয়া হেমনলিনীর নিকট সে তাহার পূর্বের অধিকার লাভ করিবে কী করিয়া।

কিন্তু অন্নদাবাবুর পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব করা আর তো উচিত হয় না। সে লিখিল, "গুরুতর কারণবশত আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অক্ষম হইয়াছি, আমাকে মার্জনা করিবেন।" নিজের নূতন ঠিকানা পত্রে দিল না।

এই চিঠিখানি ডাকে ফেলিয়া তাহার পরদিনেই রমেশ শামলা মাথায় দিয়া আলিপুরের আদালতে হাজিরা দিতে বাহির হইল।

একদিন সে আদালত হইতে ফিরিবার সময় কতক পথ হাঁটিয়া একটি ঠিকাগাড়ির গাড়োয়ানের সঙ্গে ভাড়ার বন্দোবস্ত করিতেছে, এমন সময় একটি পরিচিত ব্যগ্রকণ্ঠের স্বরে শুনিতে পাইল, "বাবা, এই যে রমেশবাবু।"

"গাড়োয়ান, রোখো, রোখো।"

গাড়ি রমেশের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। সেদিন আলিপুরের পশুশালায় একটি চড়িভাতির নিমন্ত্রণ সারিয়া অন্নদাবাবু ও তাঁহার কন্যা বাড়ি ফিরিতেছিলেন— এমন সময়ে হঠাৎ এই সাক্ষাৎ।

গাড়িতে হেমনলিনীর সেই স্নিগ্ধগম্ভীর মুখ, তাহার বিশেষ ধরনের সেই শাড়ি পরা, তাহার চুল বাঁধিবার পরিচিত ভঙ্গি, তাহার হাতের সেই প্লেন বালা এবং তারাকাটা দুইগাছি করিয়া সোনার চুড়ি দেখিবামাত্র রমেশের বুকের মধ্যে একটা ঢেউ যেন একেবারে কণ্ঠ পর্যন্ত উচ্ছ্বসিত হইল।

অন্নদাবাবু কহিলেন, "এই যে রমেশ, ভাগ্যে পথে দেখা হইল। আজকাল চিঠিলেখাই বন্ধ করিয়াছ, যদি বা লেখো, তবু ঠিকানা দাও না। এখন যাইতেছ কোথায়? বিশেষ কোনো কাজ আছে?"

রমেশ কহিল, "না, আদালত হইতে ফিরিতেছি।"

অন্নদাবাবু। তবে চলো, আমাদের ওখানে চা খাইবে চলো।

রমেশের হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছিল— সেখানে আর দ্বিধা করিবার স্থান ছিল না। সে গাড়িতে চড়িয়া বসিল। একান্ত চেষ্টায় সংকোচ কাটাইয়া হেমনলিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি ভালো আছেন?"

হেমনলিনী কুশলপ্রশ্নের উত্তর না দিয়াই কহিল, "আপনি পাস হইয়া আমাদের যে একবার খবর দিলেন না বড়ো?"

রমেশ এই প্রশ্নের কোনো জবাব খুঁজিয়া না পাইয়া কহিল, "আপনিও পাস হইয়াছেন দেখিলাম।"

হেমনলিনী হাসিয়া কহিল, "তবু ভালো, আমাদের খবর রাখেন!"

অন্নদাবাবু কহিলেন, "তুমি এখন বাসা কোথায় করিয়াছ?"

রমেশ কহিল, "দর্জিপাড়ায়।"

অন্নদাবাবু কহিলেন, "কেন, কলুটোলায় তোমার সাবেক বাসা তো মন্দ ছিল না।"

উত্তরের অপেক্ষায় হেমনলিনী বিশেষ কৌতূহলের সহিত রমেশের

দিকে চাহিল। সেই দৃষ্টি রমেশকে আঘাত করিল— সে তৎক্ষণাৎ বলিয়া ফেলিল, "হাঁ, সেই বাসাতেই ফিরিব স্থির করিয়াছি।"

তাহার এই বাসা-বদল করার অপরাধ যে হেমনলিনী গ্রহণ করিয়াছে, তাহা রমেশ বেশ বুঝিল— সাফাই করিবার কোনো উপায় নাই জানিয়া সে মনে মনে পীড়িত হইতে লাগিল। অন্য পক্ষ হইতে আর কোনো প্রশ্ন উঠিল না। হেমনলিনী গাড়ির বাহিরে পথের দিকে চাহিয়া রহিল। রমেশ আর থাকিতে না পারিয়া অকারণে আপনি কহিয়া উঠিল, "আমার একটি আত্মীয় হেদুয়ার কাছে থাকেন, তাঁহার খবর লইবার জন্য দর্জিপাড়ায় বাসা করিয়াছি।"

রমেশ নিতান্ত মিথ্যা বলিল না, কিন্তু কথাটা কেমন অসংগত শুনাইল। মাঝে মাঝে আত্মীয়ের খবর লইবার পক্ষে কলুটোলা হেদুয়া হইতে এতই কি দূর। হেমনলিনীর দুই চক্ষু গাড়ির বাহিরে পথের দিকেই নিবিষ্ট হইয়া রহিল। হতভাগ্য রমেশ ইহার পরে কী বলিবে, কিছুই ভাবিয়া পাইল না। একবার কেবল জিজ্ঞাসা করিল, "যোগেনের খবর কী?" অন্নদাবাবু কহিলেন, "সে আইন-পরীক্ষায় ফেল করিয়া পশ্চিমে হাওয়া খাইতে গেছে।"

গাড়ি যথাস্থানে পৌঁছিলে পর, পরিচিত ঘর ও গৃহসজ্জাগুলি রমেশের উপর মন্ত্রজাল বিস্তার করিয়া দিল। রমেশের বুকের মধ্য হইতে গভীর দীর্ঘনিশ্বাস উত্থিত হইল।

রমেশ কিছু না বলিয়াই চা খাইতে লাগিল। অন্নদাবাবু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এবার তো তুমি অনেকদিন বাড়িতে ছিলে, কাজ ছিল বুঝি?"

রমেশ কহিল, "বাবার মৃত্যু হইয়াছে।"

অন্নদাবাবু। অ্যাঁ, বলো কী। সে কী কথা। কেমন করিয়া হইল।

রমেশ। তিনি পদ্মা বাহিয়া নৌকা করিয়া বাড়ি আসিতেছিলেন, হঠাৎ ঝড়ে নৌকা ডুবিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়।

একটা প্রবল হাওয়া উঠিলে যেমন অকস্মাৎ ঘন মেঘ কাটিয়া আকাশ পরিষ্কার হইয়া যায়, তেমনি এই শোকের সংবাদে রমেশ ও হেমনলিনীর মাঝখানকার গ্লানি মুহূর্তের মধ্যে কাটিয়া গেল। হেম অনুতাপসহকারে মনে মনে কহিল, "রমেশবাবুকে ভুল বুঝিয়াছিলাম,— তিনি পিতৃ-বিয়োগের শোকে এবং গোলমালে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছিলেন। এখনো হয়তো তাহাই লইয়া উন্মনা হইয়া আছেন। উঁহার সাংসারিক কী সংকট ঘটিয়াছে, উঁহার মনের মধ্যে কী ভার চাপিয়াছে, তাহা কিছুই না জানিয়াই আমরা উঁহাকে দোষী করিতেছিলাম।"

হেমনলিনী এই পিতৃহীনকে বেশি করিয়া যত্ন করিতে লাগিল। রমেশের আহারে অভিরুচি ছিল না, হেমনলিনী তাহাকে বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়া খাওয়াইল। কহিল, "আপনি বড়ো রোগা হইয়া গেছেন, শরীরের অযত্ন করিবেন না।" অন্নদাবাবুকে কহিল, "বাবা, রমেশবাবু আজ রাত্রেও এইখানেই খাইয়া যান না।"

অন্নদাবাবু কহিলেন, "বেশ তো।"

এমন সময় অক্ষয় আসিয়া উপস্থিত। অন্নদাবাবুর চায়ের টেবিলে কিছু কাল অক্ষয় একাধিপত্য করিয়া আসিয়াছে। আজ সহসা রমেশকে দেখিয়া সে থমকিয়া গেল। আত্মসংবরণ করিয়া হাসিয়া কহিল, "এ কী। এ যে রমেশবাবু। আমি বলি আমাদের বুঝি একেবারেই ভুলিয়া গেলেন।"

রমেশ কোনো উত্তর না দিয়া একটুখানি হাসিল। অক্ষয় কহিল, "আপনার বাবা আপনাকে যে-রকম তাড়াতাড়ি গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেলেন, আমি ভাবিলাম, তিনি এবার আপনার বিবাহ না দিয়া কিছুতেই ছাড়িবেন না— ফাঁড়া কাটাইয়া আসিয়াছেন তো?"

হেমনলিনী অক্ষয়কে বিরক্তিদৃষ্টিধারা বিদ্ধ করিল।

অন্নদাবাবু কহিলেন, "অক্ষয়, রমেশের পিতৃবিয়োগ হইয়াছে।"

রমেশ বিবর্ণ মুখ নত করিয়া বসিয়া রহিল। তাহাকে বেদনার উপর ব্যথা দিল বলিয়া হেমনলিনী অক্ষয়ের প্রতি মনে মনে ভারি রাগ করিল। রমেশকে তাড়াতাড়ি কহিল, "রমেশবাবু, আপনাকে আমাদের নূতন অ্যালবমখানা দেখানো হয় নাই।"— বলিয়া অ্যালবম আনিয়া রমেশের টেবিলের এক প্রান্তে লইয়া গিয়া ছবি লইয়া আলোচনা করিতে লাগিল এবং এক সময়ে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, "রমেশবাবু, আপনি বোধ হয় নূতন বাসায় একলা থাকেন?"

রমেশ কহিল, "হাঁ।"

হেমনলিনী। আমাদের পাশের বাড়িতে আসিতে আপনি দেরি করিবেন না।

রমেশ কহিল, "না, আমি এই সোমবারেই নিশ্চয় আসিব।"

হেমনলিনী। মনে করিতেছি, আমাদের বি. এ.র ফিলজফি আপনার কাছে মাঝে মাঝে বুঝাইয়া লইব।

রমেশ তাহাতে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিল।

৮

রমেশ পূর্বের বাসায় আসিতে বিলম্ব করিল না।

ইহার আগে হেমনলিনীর সঙ্গে রমেশের যতটুকু দূরভাব ছিল, এবারে তাহা আর রহিল না। রমেশ যেন একেবারে ঘরের লোক। হাসি-কৌতুক নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ খুব জমিয়া উঠিল।

অনেককাল অনেক পড়া মুখস্থ করিয়া ইতিপূর্বে হেমনলিনীর চেহারা

একপ্রকার ক্ষণভঙ্গুর গোছের ছিল। মনে হইত, যেন একটু জোরে হাওয়া লাগিলেই শরীরটা কোমর হইতে হেলিয়া ভাঙিয়া পড়িতে পারে। তখন তাহার কথা অল্প ছিল, এবং তাহার সঙ্গে কথা কহিতেই ভয় হইত— পাছে সামান্য কিছুতেই সে অপরাধ লয়।

অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তাহার আশ্চর্য পরিবর্তন হইয়াছে। তাহার পাংশুবর্ণ কপোলে লাবণ্যের মসৃণতা দেখা দিল। তাহার চক্ষু এখন কথায় কথায় হাস্যচ্ছটায় নাচিয়া উঠে। আগে সে বেশভূষায় মনোযোগ দেওয়াকে চাপল্য, এমনকি, অন্যায় মনে করিত। এখন কারো সঙ্গে কোনো তর্ক না করিয়া কেমন করিয়া যে তাহার মত ফিরিয়া আসিতেছে, তাহা অন্তর্যামী ছাড়া আর কেহ বলিতে পারে না।

কর্তব্যবোধের দ্বারা ভারাক্রান্ত রমেশও বড়ো কম গম্ভীর ছিল না। বিচারশক্তির প্রাবল্যে তাহার শরীরমন যেন মন্থর হইয়া গিয়াছিল। আকাশের জ্যোতির্ময় গ্রহতারা চলিয়া ফিরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু মানমন্দির আপনার যন্ত্রতন্ত্র লইয়া অত্যন্ত সাবধানে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকে— রমেশ সেইরূপ এই চলমান জগৎসংসারের মাঝখানে আপনার পুঁথিপত্র যুক্তিতর্কের আয়োজনভারে স্তম্ভিত হইয়া ছিল, তাহাকেও আজ এতটা হালকা করিয়া দিল কিসে? সেও আজকাল সব সময়ে পরিহাসের সদুত্তর দিতে না পারিলে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠে। তাহার চুলে এখনো চিরুনি উঠে নাই বটে, কিন্তু তাহার চাদর আর পূর্বের মতো ময়লা নাই। তাহার দেহে মনে এখন যেন একটা চলৎশক্তির আবির্ভাব হইয়াছে।

৯

প্রণয়ীদের জন্য কাব্যে যে-সকল আয়োজনের ব্যবস্থা আছে, কলিকাতা শহরে তাহা মেলে না। কোথায় প্রফুল্ল অশোক-বকুলের বীথিকা, কোথায় বিকশিত মাধবীর প্রচ্ছন্ন লতাবিতান, কোথায় চূত-কষায়কণ্ঠ কোকিলের কুহুকাকলি। তবু এই শুষ্ককঠিন সৌন্দর্যহীন আধুনিক নগরে ভালোবাসার জাদুবিদ্যা প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া যায় না। এই গাড়িঘোড়ার বিষম ভিড়ে, এই লৌহনিগড়বদ্ধ ট্রামের রাস্তায় একটি চিরকিশোর প্রাচীন দেবতা তাঁহার ধনুকটি গোপন করিয়া লালপাগড়ি প্রহরীদের চক্ষের সম্মুখ দিয়া কত রাত্রে কত দিনে কত বার কত ঠিকানায় যে আনাগোনা করিতেছেন, তাহা কে বলিতে পারে।

রমেশ ও হেমনলিনী চামড়ার দোকানের সামনে মুদির দোকানের পাশে কলুটোলায় ভাড়াটে বাড়িতে বাস করিতেছিল বলিয়া প্রণয়-বিকাশসম্বন্ধে কুঞ্জকুটিরচারীদের চেয়ে তাহারা যে কিছুমাত্র পিছাইয়া ছিল, এমন কথা কেহ বলিতে পারে না। অন্নদাবাবুদের চা-রস-চিহ্নিত মলিন ক্ষুদ্র টেবিলটি পদ্মসরোবর নহে বলিয়া রমেশ কিছুমাত্র অভাব অনুভব করে নাই। হেমনলিনীর পোষা বিড়ালটি কৃষ্ণসার মৃগশাবক না হইলেও রমেশ পরিপূর্ণ স্নেহে তাহার গলা চুলকাইয়া দিত— এবং সে যখন ধনুকের মতো পিঠ ফুলাইয়া আলস্যত্যাগপূর্বক গাত্রলেহন দ্বারা প্রসাধনে রত হইত, তখন রমেশের মুগ্ধ দৃষ্টিতে এই প্রাণীটি গৌরবে অন্য কোনো চতুষ্পদের চেয়ে ন্যূন বলিয়া প্রতিভাত হইত না।

হেমনলিনী পরীক্ষা পাস করিবার ব্যগ্রতায় সেলাইশিক্ষায় বিশেষ পটুত্ব লাভ করিতে পারে নাই, কিছুদিন হইতে তাহার এক সীবনপটু সখীর কাছে একাগ্রমনে সে সেলাই শিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সেলাই

ব্যাপারটাকে রমেশ অত্যন্ত অনাবশ্যক ও তুচ্ছ বলিয়া জ্ঞান করে। সাহিত্যে দর্শনে হেমনলিনীর সঙ্গে তাহার দেনাপাওয়া চলে, কিন্তু সেলাই ব্যাপারে রমেশকে দূর পড়িয়া থাকিতে হয়। এইজন্য সে প্রায়ই কিছু অধীর হইয়া বলিত, "আজকাল সেলাইয়ের কাজ কেন আপনার এত ভালো লাগে। যাহাদের সময় কাটাইবার আর কোনো সদুপায় নাই, তাহাদের পক্ষেই ইহা ভালো।" হেমনলিনী কোনো উত্তর না দিয়া ঈষৎ হাস্যমুখে ছুঁচে রেশম পরাইতে থাকে। অক্ষয় তীব্রস্বরে বলে, "যে-সকল কাজ সংসারের কোনো প্রয়োজনে লাগে, রমেশবাবুর বিধানমতে সে-সমস্ত তুচ্ছ। মশায় যত-বড়োই তত্ত্বজ্ঞানী এবং কবি হন না কেন, তুচ্ছকে বাদ দিয়া একদিনও চলে না।" রমেশ উত্তেজিত হইয়া ইহার বিরুদ্ধে তর্ক করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া বসে; হেমনলিনী বাধা দিয়া বলে, "রমেশবাবু, আপনি সকল কথারই উত্তর দিবার জন্য এত ব্যস্ত হন কেন। ইহাতে সংসারে অনাবশ্যক কথা যে কত বাড়িয়া যায়, তাহার ঠিক নাই।"—এই বলিয়া সে মাথা নিচু করিয়া ঘর গনিয়া সাবধানে রেশমসূত্র চালাইতে প্রবৃত্ত হয়।

একদিন সকালে রমেশ তাহার পড়িবার ঘরে আসিয়া দেখে টেবিলের উপর রেশমের ফুলকাটা মখমলে বাঁধানো একটি ব্লটিং-বহি সাজানো রহিয়াছে। তাহার একটি কোণে "র" অক্ষর লেখা আছে, আর এক কোণে সোনালি জরি দিয়া একটি পদ্ম আঁকা। বইখানির ইতিহাস ও তাৎপর্য বুঝিতে রমেশের ক্ষণমাত্রও বিলম্ব হইল না। তাহার বুক নাচিয়া উঠিল। সেলাই জিনিসটা তুচ্ছ নহে, তাহা তাহার অন্তরাত্মা বিনা তর্কে বিনা প্রতিবাদ স্বীকার করিয়া লইল। ব্লটিং-বইটা বুকে চাপিয়া ধরিয়া সে অক্ষয়ের কাছেও হার মানিতে রাজি হইল। সেই ব্লটিং-বই খুলিয়া তখনি তাহার উপরে একখানি চিঠির কাগজ রাখিয়া সে লিখিল—

"আমি যদি কবি হইতাম, তবে কবিতা লিখিয়া প্রতিদান দিতাম কিন্তু প্রতিভা হইতে আমি বঞ্চিত। ঈশ্বর আমাকে দিবার ক্ষমতা দেন নাই, কিন্তু লইবার ক্ষমতাও একটা ক্ষমতা। আশাতীত উপহার, আমি যে কেমন করিয়া গ্রহণ করিলাম, অন্তর্যামী ছাড়া তাহা আর কেহ জানিতে পারিবে না। দান চোখে দেখা যায়, কিন্তু আদান হৃদয়ের ভিতরে লুকানো। ইতি। চিরঋণী।"

এই লিখনটুকু হেমনলিনীর হাতে পড়িল। তাহার পরে এ-সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে আর কোনো কথাই হইল না।

বর্ষাকাল ঘনাইয়া আসিল। বর্ষাঋতুটা মোটের উপরে শহরে মনুষ্য-সমাজের পক্ষে তেমন সুখকর নহে— ওটা অরণ্যপ্রকৃতিরই বিশেষ উপযোগী; শহরের বাড়িগুলা তাহার রুদ্ধ বাতায়ন ও ছাদ লইয়া, পথিক তাহার ছাতা লইয়া, ট্রামগাড়ি তাহার পর্দা লইয়া বর্ষাকে কেবল নিষেধ করিবার চেষ্টায় ক্লেদাক্ত পঙ্কিল হইয়া উঠিতেছে। নদী-পর্বত-অরণ্য-প্রান্তর বর্ষাকে সাদর কলরবে বন্ধু বলিয়া আহ্বান করে। সেইখানেই বর্ষার যথার্থ সমারোহ— সেখানে শ্রাবণে দ্যুলোক-ভূলোকের আনন্দ-সম্মিলনের মাঝখানে কোনো বিরোধ নাই।

কিন্তু নূতন ভালোবাসায় মানুষকে অরণ্যপর্বতের সঙ্গেই একশ্রেণীভুক্ত করিয়া দেয়। অবিশ্রাম বর্ষায় অন্নদাবাবুর পাকযন্ত্র দ্বিগুণ বিকল হইয়া গেল, কিন্তু রমেশ-হেমনলিনীর চিত্তস্ফূর্তির কোনো ব্যতিক্রম দেখা গেল না। মেঘের ছায়া, বজ্রের গর্জন, বর্ষণের কলশব্দ তাহাদের দুইজনের মনকে যেন ঘনিষ্ঠতর করিয়া তুলিল। বৃষ্টির উপলক্ষ্যে রমেশের আদালতযাত্রায় প্রায়ই বিঘ্ন ঘটিতে লাগিল। এক-এক দিন সকালে এমনি চাপিয়া বৃষ্টি আসে যে, হেমনলিনী উদ্‌বিগ্ন হইয়া বলে, "রমেশবাবু, এ

বৃষ্টিতে আপনি বাড়ি যাইবেন কী করিয়া।” রমেশ নিতান্ত লজ্জার খাতিরে বলে, “এইটুকু বই তো নয়, কোনোরকম করিয়া যাইতে পারিব।” হেমনলিনী বলে, “কেন ভিজিয়া সর্দি করিবেন। এখানেই খাইয়া যান না।” সর্দির জন্য উৎকণ্ঠা রমেশের কিছুমাত্র ছিল না; অল্পেই যে তাহার সর্দি হয়, এমন কোনো লক্ষণও তাহার আত্মীয়বন্ধুরা দেখে নাই, কিন্তু বর্ষণের দিনে হেমনলিনীর শুশ্রূষাধীনেই তাহাকে কাটাইতে হইত—দুই পা মাত্র চলিয়াও বাসায় যাওয়া অন্যায় দুঃসাহসিকতা বলিয়া গণ্য হইত। কোনোদিন বাদলার একটু বিশেষ লক্ষণ দেখা দিলেই হেমনলিনীদের ঘরে প্রাতঃকালে রমেশের খিচুড়ি এবং অপরাহ্ণে ভাজাভুজি খাইবার নিমন্ত্রণ জুটিত। বেশ দেখা গেল, হঠাৎ সর্দি লাগিবার সম্বন্ধে ইহাদের আশঙ্কা যত অতিরিক্ত প্রবল ছিল, পরিপাকের বিভ্রাটসম্বন্ধে ততটা ছিল না।

এমনি দিন কাটিতে লাগিল। এই আত্মবিস্মৃত হৃদয়াবেগের পরিণাম কোথায়, রমেশ স্পষ্ট করিয়া ভাবে নাই। কিন্তু অন্নদাবাবু ভাবিতেছিলেন, এবং তাঁহাদের সমাজের আরো পাঁচজন আলোচনা করিতেছিল। একে রমেশের পাণ্ডিত্য যতটা কাণ্ডজ্ঞান ততটা নাই, তাহাতে তাহার বর্তমান মুগ্ধ অবস্থায় তাহার সাংসারিক বুদ্ধি আরও অস্পষ্ট হইয়া গেছে। অন্নদাবাবু প্রত্যহই বিশেষ প্রত্যাশার সহিত তাহার মুখের দিকে চান, কিন্তু কোনো জবাবই পান না।

১০

অক্ষয়ের গলা বিশেষ ভালো ছিল না, কিন্তু সে যখন নিজে বেহালা বাজাইয়া গান গাহিত, তখন অত্যন্ত কড়া সমজদার ছাড়া সাধারণ শ্রোতার দল আপত্তি করিত না, এমন কি, আরও গাহিতে অনুরোধ

করিত। অন্নদাবাবুর সংগীতে বিশেষ অনুরক্তি ছিল না, কিন্তু সে-কথা তিনি কবুল করিতে পারিতেন না— তবু তিনি আত্মরক্ষার কথঞ্চিৎ চেষ্টা করিতেন। কেহ অক্ষয়কে গান গাহিতে অনুরোধ করিলে তিনি বলিতেন, "ওই তোমাদের দোষ। বেচারা গাহিতে পারে বলিয়াই কি উহার 'পরে অত্যাচার করিতে হইবে।"

অক্ষয় বিনয় করিয়া বলিত, "না না অন্নদাবাবু, সেজন্য ভাবিবেন না— অত্যাচারটা কাহার 'পরে হইবে, সেইটেই বিচার্য।"

অনুরোধের তরফ হইতে জবাব আসিত, "তবে পরীক্ষা হউক।"

সেদিন অপরাহ্ণে খুব ঘনঘোর করিয়া মেঘ করিয়া আসিয়াছিল। প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল, তবু বৃষ্টির বিরাম নাই। অক্ষয় আবদ্ধ হইয়া পড়িল। হেমনলিনী কহিল, "অক্ষয়বাবু, একটা গান করুন।"

এই বলিয়া হেমনলিনী হার্মোনিয়মে সুর দিল।

অক্ষয় বেহালা মিলাইয়া লইয়া হিন্দুস্থানী গান ধরিল—

"বায়ু বহী পুরবৈঞা, নীদ নহী বিন সৈঞা।"

গানের সকল কথার স্পষ্ট অর্থ বুঝা যায় না— কিন্তু একেবারে প্রত্যেক কথায় কথায় বুঝিবার কোনো প্রয়োজন নাই। মনের মধ্যে যখন বিরহমিলনের বেদনা সঞ্চিত হইয়া আছে, তখন একটু আভাসই যথেষ্ট। এটুকু বোঝা গেল যে, বাদল ঝরিতেছে, ময়ূর ডাকিতেছে এবং একজনের জন্য আর-একজনের ব্যাকুলতার অন্ত নাই।

অক্ষয় সুরের ভাষায় নিজের অব্যক্ত কথা বলিবার চেষ্টা করিতেছিল —কিন্তু সে-ভাষা কাজে লাগিতেছিল আর-দুইজনের। দুইজনের হৃদয় সেই স্বরলহরীকে আশ্রয় করিয়া পরস্পরকে আঘাত-অভিঘাত করিতেছিল। জগতে কিছু আর অকিঞ্চিৎকর রহিল না। সব যেন

মনোরম হইয়া গেল। পৃথিবীতে এ-পর্যন্ত যত মানুষ যত ভালো-বাসিয়াছে, সমস্ত যেন দুটিমাত্র হৃদয়ে বিভক্ত হইয়া অনির্বচনীয় সুখে-দুঃখে আকাঙ্ক্ষায়-আকুলতায় কম্পিত হইতে লাগিল।

সেদিন মেঘের মধ্যে যেমন ফাঁক ছিল না, গানের মধ্যেও তেমনি হইয়া উঠিল। হেমনলিনী কেবল অনুনয় করিয়া বলিতে লাগিল, "অক্ষয়বাবু, থামিবেন না, আর-একটা গান, আর-একটা গান।"

উৎসাহে এবং আবেগে অক্ষয়ের গান অবাধে উৎসারিত হইতে লাগিল। গানের সুর স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত হইল, যেন তাহা সূচিভেদ্য হইয়া উঠিল, যেন তাহার মধ্যে রহিয়া রহিয়া বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল—বেদনাতুর হৃদয় তাহার মধ্যে আচ্ছন্ন-আবৃত হইয়া রহিল।

সেদিন অনেক রাত্রে অক্ষয় চলিয়া গেল। রমেশ বিদায় লইবার সময় যেন গানের সুরের ভিতর দিয়া নীরবে হেমনলিনীর মুখের দিকে একবার চাহিল। হেমনলিনীও চকিতের মতো একবার চাহিল, তাহার দৃষ্টির উপরেও গানের ছায়া।

রমেশ বাড়ি গেল। বৃষ্টি ক্ষণকালমাত্র থামিয়াছিল, আবার ঝুপঝুপ শব্দে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। রমেশ সে-রাত্রে ঘুমাইতে পারিল না। হেমনলিনীও অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া গভীর অন্ধকারের মধ্যে বৃষ্টি-পতনের অবিরাম শব্দ শুনিতেছিল। তাহার কানে বাজিতেছিল—

"বায়ু বহী পুরবৈঞা, নীদ নহী বিন সৈঞা।"

পরদিন প্রাতে রমেশ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, "আমি যদি কেবল গান গাহিতে পারিতাম, তবে তাহার বদলে আমার অন্য অনেক বিদ্যা দান করিতে কুণ্ঠিত হইতাম না।"

কিন্তু কোনো উপায়ে এবং কোনো কালেই সে যে গান গাহিতে পারিবে, এ-ভরসা রমেশের ছিল না। সে স্থির করিল, "আমি বাজাইতে

শিখিব।” ইতিপূর্বে একদিন নির্জন অবকাশে সে অন্নদাবাবুর ঘরে বেহালাখানা লইয়া ছড়ির টান দিয়াছিল, সেই ছড়ির একটিমাত্র আঘাতে সরস্বতী এমনি আর্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিলেন যে, তাহার পক্ষে বেহালার চর্চা নিতান্ত নিষ্ঠুরতা হইবে বলিয়া সে আশা সে পরিত্যাগ করে। আজ সে ছোটো দেখিয়া একটা হার্মোনিয়ম কিনিয়া আনিল। ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করিয়া অতি সাবধানে অঙ্গুলিচালনা করিয়া এটুকু বুঝিল যে, আর যাই হোক এ যন্ত্রের সহিষ্ণুতা বেহালার চেয়ে বেশি।

পরদিনে অন্নদাবাবুর বাড়ি যাইতেই হেমনলিনী রমেশকে কহিল, “আপনার ঘর হইতে কাল যে হার্মোনিয়মের শব্দ পাওয়া যাইতেছিল!”

রমেশ ভাবিয়াছিল, দরজা বন্ধ থাকিলেই ধরা পড়িবার আশঙ্কা নাই। কিন্তু এমন কান আছে, যেখানে রমেশের অবরুদ্ধ ঘরের শব্দও সংবাদ লইয়া আসে। রমেশকে একটুকু লজ্জিত হইয়া কবুল করিতে হইল যে, সে একটা হার্মোনিয়ম কিনিয়া আনিয়াছে এবং বাজাইতে শেখে ইহাই তাহার ইচ্ছা।

হেমনলিনী কহিল, “ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া নিজে কেন মিথ্যা চেষ্টা করিবেন। তাহার চেয়ে আপনি আমাদের এখানে অভ্যাস করুন, আমি যতটুকু জানি সাহায্য করিতে পারিব।”

রমেশ কহিল, “আমি কিন্তু নিতান্ত আনাড়ি, আমাকে লইয়া আপনার অনেক দুঃখ ভোগ করিতে হইবে।”

হেমনলিনী কহিল, “আমার যেটুকু বিদ্যা, তাহাতে আনাড়িকে শেখানোই কোনোমতে চলে।”

ক্রমশই প্রমাণ হইতে লাগিল, রমেশ যে নিজেকে আনাড়ি বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল, তাহা নিতান্ত বিনয় নহে। এমন শিক্ষকের এত অযাচিত সহায়তাসত্ত্বে সুরের জ্ঞান রমেশের মগজের মধ্যে প্রবেশ

করিবার কোনো সন্ধি খুঁজিয়া পাইল না। সন্তরণমূঢ় জলের মধ্যে পড়িয়া যেমন উন্মত্তের মতো হাত পা ছুঁড়িতে থাকে, রমেশ সংগীতের হাঁটুজলে তেমনিতরো ব্যবহার করিতে লাগিল। তাহার কোন্ আঙুল কখন কোথায় গিয়া পড়ে, তাহার ঠিকানা নাই, পদে পদে ভুল সুর বাজে, কিন্তু রমেশের কানে তাহা বাজে না, সুরবেসুরের মধ্যে সে কোনোপ্রকার পক্ষপাত না করিয়া দিব্য নিশ্চিন্তমনে রাগরাগিণীকে সর্বত্র লঙ্ঘন করিয়া যায়। হেমনলিনী যেই বলে, "ও কী করিতেছেন, ভুল হইল যে," অমনি অত্যন্ত তাড়াতাড়ি দ্বিতীয় ভুলের দ্বারা প্রথম ভুলটা নিরাকৃত করিয়া দেয়। গম্ভীরপ্রকৃতি অধ্যবসায়ী রমেশ হাল ছাড়িয়া দিবার লোক নহে। রাস্তা-তৈরির স্টীমরোলার যেমন মন্থর গমনে চলিতে থাকে, তাহার তলায় কী যে দলিত-পিষ্ট হইতেছে, তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্র করে না, হতভাগ্য স্বরলিপি এবং হার্মোনিয়মের চাবিগুলার উপর দিয়া রমেশ সেইরূপ অনিবার্য অন্ধতার সহিত বার বার যাওয়া-আসা করিতে লাগিল।

রমেশের এই মূঢ়তায় হেমনলিনী হাসে, রমেশও হাসে। রমেশের ভুল করিবার অসাধারণ শক্তিতে হেমনলিনীর অত্যন্ত আমোদ বোধ হয়। ভুল হইতে, বেসুর হইতে, অক্ষমতা হইতে আনন্দ পাইবার শক্তি ভালোবাসারই আছে। শিশু চলিতে আরম্ভ করিয়া বার বার ভুল পা ফেলিতে থাকে, তাহাতেই মাতার স্নেহ উদ্‌বেল হইয়া উঠে। বাজনা-সম্বন্ধে রমেশ যে অদ্ভুতরকমের অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করে, হেমনলিনীর এই-এক বড়ো কৌতুক।

রমেশ এক-একবার বলে, "আচ্ছা, আপনি যে এত হাসিতেছেন, আপনি যখন প্রথম বাজাইতে শিখিতেছিলেন, তখন ভুল করেন নাই?"

হেমনলিনী বলে, "ভুল নিশ্চয়ই করিতাম, কিন্তু সত্য বলিতেছি রমেশবাবু, আপনার সঙ্গে তুলনাই হয় না।"

রমেশ ইহাতে দমিত না, হাসিয়া আবার গোড়া হইতে শুরু করিত। অন্নদাবাবু সংগীতের ভালোমন্দ কিছুই বুঝিতেন না, তিনি এক-একবার গম্ভীর হইয়া কান খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়া কহিতেন, "তাই তো, রমেশের ক্রমেই হাত বেশ পাকিয়া আসিতেছে।"

হেমনলিনী বলিত, "হাত বেসুরায় পাকিতেছে।"

অন্নদা। না না, প্রথমে যেমন শুনিয়াছিলাম, এখন তার চেয়ে অনেকটা অভ্যাস হইয়া আসিয়াছে। আমার তো বোধ হয়, রমেশ যদি লাগিয়া থাকে, তাহা হইলে উহার হাত নিতান্ত মন্দ হইবে না। গান-বাজনায় আর কিছু নয়, খুব অভ্যাস করা চাই। একবার সারেগামার বোধটা জন্মিয়া গেলেই তাহার পরে সমস্ত সহজ হইয়া আসে।

এ-সকল কথার উপরে প্রতিবাদ চলে না। সকলকে নিরুত্তর হইয়া শুনিতে হয়।

১১

প্রায় প্রতিবৎসর শরৎকালে পূজার টিকিট বাহির হইলে হেমনলিনীকে লইয়া অন্নদাবাবু জব্বলপুরে তাঁহার ভগিনীপতির কর্মস্থানে বেড়াইতে যাইতেন। পরিপাকশক্তির উন্নতিসাধনের জন্য তাঁহার এই সাংবৎসরিক চেষ্টা।

ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি হইয়া আসিল, এবারে পূজার ছুটির আর বড়ো বেশি বিলম্ব নাই। অন্নদাবাবু এখন হইতেই তাঁহার যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত হইয়াছেন।

আসন্ন বিচ্ছেদের সম্ভাবনায় রমেশ আজকাল খুব বেশি করিয়া হার্মোনিয়ম শিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। একদিন কথায় কথায় হেমনলিনী কহিল, "রমেশবাবু, আমার বোধ হয়, আপনার অন্তত কিছুদিন বায়ু-পরিবর্তন দরকার। না বাবা?"

অন্নদাবাবু ভাবিলেন, কথাটা সংগত বটে, কারণ ইতিমধ্যে রমেশের উপর দিয়া শোকদুঃখের দুর্যোগ গিয়াছে। কহিলেন, "অন্তত কিছুদিনের জন্য কোথাও বেড়াইয়া আসা ভালো। বুঝিয়াছ রমেশ, পশ্চিমই বলো আর যে-দেশই বলো, আমি দেখিয়াছি, কেবল কিছুদিনের জন্য একটু ফল পাওয়া যায়। প্রথম দিনকতক বেশ ক্ষুধা বাড়ে, বেশ খাওয়া যায়, তাহার পরে যে-কে সেই। সেই পেটভার হইয়া আসে, বুকজালা করিতে থাকে, যা খাওয়া যায় তা-ই—"

হেমনলিনী। রমেশবাবু, আপনি নর্মদা-ঝরনা দেখিয়াছেন?

রমেশ। না, দেখি নাই।

হেমনলিনী। এ আপনার দেখা উচিত, না বাবা?

অন্নদা। তা বেশ তো, রমেশ আমাদের সঙ্গেই আসুন না কেন। হাওয়া-বদলও হইবে, মার্বল-পাহাড়ও দেখিবে।

হাওয়া-বদল করা এবং মার্বল-পাহাড় দেখা, এই দুইটি যেন রমেশের পক্ষে সম্প্রতি সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়, সুতরাং রমেশকেও রাজি হইতে হইল।

সেদিন রমেশের শরীরমন যেন হাওয়ার উপরে ভাসিতে লাগিল। অশান্ত হৃদয়ের আবেগকে কোনো-একটা রাস্তায় ছাড়া দিবার জন্য সে আপনার বাসার ঘরের মধ্যে দ্বার রুদ্ধ করিয়া হার্মোনিয়মটা লইয়া পড়িল। আজ আর তাহার যত্ব-ণত্ব-জ্ঞান রহিল না— যন্ত্রটার উপরে তাহার উন্মত্ত আঙুলগুলা তাল-বেতালের নৃত্য বাধাইয়া দিল।

হেমনলিনীর দূরে যাইবার সম্ভাবনায় কয়দিন তাহার হৃদয়টা ভারাক্রান্ত হইয়া ছিল— আজ উল্লাসের বেগে সংগীতবিদ্যাসম্বন্ধে সর্বপ্রকার ন্যায়-অন্যায়-বোধ একেবারে বিসর্জন দিল।

এমন সময় দরজায় ঘা পড়িল, "আ সর্বনাশ, থামুন, থামুন রমেশবাবু, করিতেছেন কী।"

রমেশ অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া আরক্তমুখে দরজা খুলিয়া দিল। অক্ষয় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল, "রমেশবাবু, গোপনে বসিয়া এই যে কাণ্ডটি করিতেছেন, আপনাদের ক্রিমিনাল কোডের কোনো দণ্ডবিধির মধ্যে কি ইহা পড়ে না।"

রমেশ হাসিতে লাগিল, কহিল, "অপরাধ কবুল করিতেছি।"

অক্ষয় কহিল, "রমেশবাবু, আপনি যদি কিছু না মনে করেন, আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আলোচনা করিবার আছে।"

রমেশ উৎকণ্ঠিত হইয়া নীরবে আলোচ্যবিষয়ের প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

অক্ষয়। আপনি এতদিনে এটুকু বুঝিয়াছেন, হেমনলিনীর ভালো-মন্দের প্রতি আমি উদাসীন নহি।

রমেশ হাঁ-না কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল।

অক্ষয়। তাঁহার সম্বন্ধে আপনার অভিপ্রায় কী, তাহা জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার আমার আছে— আমি অন্নদাবাবুর বন্ধু।

কথাটা এবং কথার ধরনটা রমেশের অত্যন্ত খারাপ লাগিল। কিন্তু কড়া জবাব দিবার অভ্যাস ও ক্ষমতা রমেশের নাই। সে মৃদুস্বরে কহিল, "তাঁহার সম্বন্ধে আমার কোনো মন্দ অভিপ্রায় আছে, এ আশঙ্কা আপনার মনে আসিবার কি কোনো কারণ ঘটিয়াছে।"

অক্ষয়। দেখুন, আপনি হিন্দুপরিবারে আছেন, আপনার পিতা

হিন্দু ছিলেন। আমি জানি, পাছে আপনি ব্রাহ্মঘরে বিবাহ করেন, এই আশঙ্কায় তিনি আপনাকে অন্যত্র বিবাহ দিবার জন্য দেশে লইয়া গিয়াছিলেন।

এই সংবাদটি অক্ষয়ের জানিবার বিশেষ কারণ ছিল। কারণ অক্ষয়ই রমেশের পিতার মনে এই আশঙ্কা জন্মাইয়া দিয়াছিল। রমেশ ক্ষণকালের জন্য অক্ষয়ের মুখের দিকে চাহিতে পারিল না।

অক্ষয় কহিল, "হঠাৎ আপনার পিতার মৃত্যু ঘটিল বলিয়াই কি আপনি নিজেকে স্বাধীন মনে করিতেছেন। তাঁহার ইচ্ছা কি—"

রমেশ আর সহ্য করিতে না পারিয়া কহিল, "দেখুন অক্ষয়বাবু, অন্যের সম্বন্ধে আমাকে উপদেশ দিবার অধিকার যদি আপনার থাকে, তবে দিন, আমি শুনিয়া যাইব—কিন্তু আমার পিতার সহিত আমার যে-সম্বন্ধ, তাহাতে আপনার কোনো কথা বলিবার নাই।"

অক্ষয় কহিল, "আচ্ছা বেশ, সে-কথা তবে থাক্। কিন্তু হেম-নলিনীকে বিবাহ করিবার অভিপ্রায় এবং অবস্থা আপনার আছে কি না, সে-কথা আপনাকে বলিতে হইবে।"

রমেশ আঘাতের পর আঘাত খাইয়া ক্রমশই উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিল,— কহিল, "দেখুন অক্ষয়বাবু, আপনি অন্নদাবাবুর বন্ধু হইতে পারেন, কিন্তু আমার সহিত আপনার তেমন বেশি ঘনিষ্ঠতা হয় নাই। দয়া করিয়া আপনি এ-সব প্রসঙ্গ বন্ধ করুন।"

অক্ষয়। আমি বন্ধ করিলেই যদি সব কথা বন্ধ থাকে এবং আপনি এখন যেমন ফলাফলের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া বেশ আরামে দিন কাটাইতেছেন, এমনি বরাবর কাটাইতে পারিতেন, তাহা হইলে কোনো কথা ছিল না। কিন্তু সমাজ আপনাদের মতো নিশ্চিন্তপ্রকৃতি লোকের পক্ষে সুখের স্থান নহে। যদিও আপনারা অত্যন্ত উঁচুদরের লোক,

পৃথিবীর কথা বড়ো বেশি ভাবেন না, তবু চেষ্টা করিলে হয়তো এটুকুও বুঝিতে পারিবেন যে, ভদ্রলোকের কন্যার সহিত আপনি যেরূপ ব্যবহার করিতেছেন, এরূপ করিয়া আপনি বাহিরের লোকের জবাবদিহি হইতে নিজেকে বাঁচাইতে পারেন না—এবং যাঁহাদিগকে আপনি শ্রদ্ধা করেন, তাঁহাদিগকে লোকসমাজে অশ্রদ্ধাভাজন করিবার ইহাই উপায়।

রমেশ। আপনার উপদেশ আমি কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিলাম। আমার যাহা কর্তব্য, তাহা আমি শীঘ্রই স্থির করিব এবং পালন করিব, এ-বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত হইবেন— এ-সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই।

অক্ষয়। আমাকে বাঁচাইলেন রমেশবাবু। এত দীর্ঘকাল পরে আপনি যে কর্তব্য স্থির করিবেন এবং পালন করিবেন বলিতেছেন, ইহাতেই আমি নিশ্চিন্ত হইলাম—আপনার সঙ্গে আলোচনা করিবার শখ আমার নাই। আপনার সংগীতচর্চায় বাধা দিয়া অপরাধী হইয়াছি— মাপ করিবেন। আপনি পুনর্বার শুরু করুন, আমি বিদায় হইলাম।

এই বলিয়া অক্ষয় দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেল।

ইহার পরে অত্যন্ত বেসুরো সংগীতচর্চাও আর চলে না। রমেশ মাথার নিচে দুই হাত রাখিয়া বিছানার উপরে চিত হইয়া শুইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ এইভাবে গেল। হঠাৎ ঘড়িতে টংটং করিয়া পাঁচটা বাজিল শুনিয়াই সে দ্রুত উঠিয়া পড়িল। কী কর্তব্য স্থির করিল, তাহা অন্তর্যামীই জানেন— কিন্তু আশু প্রতিবেশীর ঘরে গিয়া যে পেয়ালা-দুয়েক চা খাওয়া কর্তব্য, সে-সম্বন্ধে তাহার মনে দ্বিধামাত্র রহিল না।

হেমনলিনী চকিত হইয়া কহিল, "রমেশবাবু, আপনার কি অসুখ করিয়াছে।"

রমেশ কহিল, "বিশেষ কিছু না।"

অন্নদাবাবু কহিলেন, "আর কিছুই নয়, হজমের গোল হইয়াছে— পিত্তাধিক্য। আমি যে-পিল ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহার একটা খাইয়া দেখো দেখি—।"

হেমনলিনী হাসিয়া কহিল, "বাবা, ওই পিল খাওয়াই নাই, তোমার এমন আলাপী কেহ দেখি না— কিন্তু তাহাদের এমন কী উপকার হইয়াছে।"

অন্নদা। অনিষ্ট তো হয় নাই। আমি যে নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি— এ-পর্যন্ত যতরকম পিল খাইয়াছি, এইটেই সবচেয়ে উপকারী।

হেমনলিনী। বাবা, যখনি তুমি একটা নূতন পিল খাইতে আরম্ভ কর, তখনি কিছুদিন তাহার অশেষ গুণ দেখিতে পাও—

অন্নদা। তোমরা কিছুই বিশ্বাস কর না— আচ্ছা, অক্ষয়কে জিজ্ঞাসা করিয়ো দেখি, আমার চিকিৎসায় সে উপকার পাইয়াছে কি না।

সেই প্রামাণিক সাক্ষীকে তলবের ভয়ে হেমনলিনীকে নিরুত্তর হইতে হইল। কিন্তু সাক্ষী আপনি আসিয়া হাজির হইল। আসিয়াই অন্নদাবাবুকে কহিল, "অন্নদাবাবু, আপনার সেই পিল আমাকে আর-একটি দিতে হইবে। বড়ো উপকার হইয়াছে। আজ শরীর এমনি হালকা বোধ হইতেছে!"

অন্নদাবাবু সগর্বে তাঁহার কন্যার মুখের দিকে তাকাইলেন।

১২

পিল খাওয়ার পর অন্নদাবাবু অক্ষয়কে শীঘ্র ছাড়িতে চাহিলেন না। অক্ষয়ও যাইবার জন্য বিশেষ ত্বরা প্রকাশ না করিয়া মাঝে মাঝে রমেশের মুখের দিকে কটাক্ষপাত করিতে লাগিল। রমেশের চোখে সহজে কিছু

পড়ে না— কিন্তু আজ অক্ষয়ের এই কটাক্ষগুলি তাহার চোখ এড়াইল না। ইহাতে তাহাকে বার বার উদ্‌বেজিত করিয়া তুলিতে লাগিল।

পশ্চিমে বেড়াইতে যাইবার সময় নিকটবর্তী হইয়া উঠিয়াছে— মনে মনে তাহারই আলোচনায় হেমনলিনীর চিত্ত আজ বিশেষ প্রফুল্ল ছিল। সে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল, আজ রমেশবাবু আসিলে ছুটিযাপন সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে নানাপ্রকার পরামর্শ করিবে। সেখানে নিভৃতে কী কী বই পড়িয়া শেষ করিতে হইবে, দুজনে মিলিয়া তাহার একটা তালিকা করিবার কথা ছিল। স্থির ছিল, রমেশ আজ সকাল-সকাল আসিবে, কেননা, চায়ের সময় অক্ষয় কিংবা কেহ-না-কেহ আসিয়া পড়ে, তখন মন্ত্রণা করিবার অবসর পাওয়া যায় না।

কিন্তু আজ রমেশ অন্যদিনের চেয়েও দেরি করিয়া আসিয়াছে। মুখের ভাবও তাহার অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত। ইহাতে হেমনলিনীর উৎসাহে অনেকটা আঘাত পড়িল। কোনো এক সুযোগে সে রমেশকে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি আজ বড়ো যে দেরি করিয়া আসিলেন?"

রমেশ অন্যমনস্কভাবে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "হাঁ, আজকে একটু দেরি হইয়া গেছে বটে।"

হেমনলিনী আজ তাড়াতাড়ি করিয়া কত সকাল-সকাল চুল বাঁধিয়া লইয়াছে। চুল-বাঁধা, কাপড়-ছাড়ার পরে সে আজ কতবার ঘড়ির দিকে তাকাইয়া আছে— অনেকক্ষণ পর্যন্ত মনে করিয়াছে, তাহার ঘড়িটা ভুল চলিতেছে, এখনো বেশি দেরি হয় নাই। যখন এই বিশ্বাস রক্ষা করা একেবারে অসাধ্য হইয়া উঠিল, তখন সে জানলার কাছে বসিয়া একটা সেলাই লইয়া কোনোমতে মনের অধৈর্য শান্ত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে। তাহার পরে রমেশ মুখ গম্ভীর করিয়া আসিল— কী

কারণে দেরি হইয়াছে, তাহার কোনোপ্রকার জবাবদিহি করিল না— আজ সকাল-সকাল আসিবার যেন কোনো শর্তই ছিল না।

হেমনলিনী কোনোমতে চা-খাওয়া শেষ করিয়া লইল। ঘরের প্রান্তে একটি টিপাইয়ের উপরে কতকগুলি বই ছিল, হেমনলিনী কিছু বিশেষ উদ্যমের সহিত রমেশের মনোযোগ আকর্ষণপূর্বক সেই বইগুলা তুলিয়া লইয়া ঘর হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিল। তখন হঠাৎ রমেশের চেতনা হইল; সে তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া কহিল, "ওগুলি কোথায় লইয়া যাইতেছেন? আজ একবার বইগুলি বাছিয়া লইবেন না?"

হেমনলিনীর ওষ্ঠাধর কাঁপিতেছিল। সে উদ্‌বেল অশ্রুজলের উচ্ছ্বাস বহুকষ্টে সংবরণ করিয়া কম্পিতকণ্ঠে কহিল, "থাক্‌ না, বই বাছিয়া কী আর হইবে।"

এই বলিয়া সে দ্রুতবেগে চলিয়া গেল। উপরের শয়নঘরে গিয়া বইগুলা মেজের উপর ফেলিয়া দিল।

রমেশের মনটা আরও বিকল হইয়া গেল। অক্ষয় মনে মনে হাসিয়া কহিল, "রমেশবাবু, আপনার বোধ হয় শরীরটা আজ তেমন ভালো নাই।"

রমেশ ইহার উত্তরে অর্ধস্ফুটস্বরে কী বলিল, ভালো বোঝা গেল না। শরীরের কথায় অন্নদাবাবু উৎসাহিত হইয়া কহিলেন, "সে তো রমেশকে দেখিয়াই আমি বলিয়াছি।"

অক্ষয় মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, "শরীরের প্রতি মনোযোগ করা রমেশবাবুর মতো লোকেরা বোধ হয় অত্যন্ত তুচ্ছ মনে করেন। উঁহারা ভাবরাজ্যের মানুষ— আহার হজম না হইলে তাহা লইয়া চেষ্টা-চরিত্র করাটাকে গ্রাম্যতা বলিয়া জ্ঞান করেন।"

পড়ে না— কিন্তু আজ অক্ষয়ের এই কটাক্ষগুলি তাহার চোখ এড়াইল না। ইহাতে তাহাকে বার বার উদ্‌বেজিত করিয়া তুলিতে লাগিল।

পশ্চিমে বেড়াইতে যাইবার সময় নিকটবর্তী হইয়া উঠিয়াছে— মনে মনে তাহারই আলোচনায় হেমনলিনীর চিত্ত আজ বিশেষ প্রফুল্ল ছিল। সে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল, আজ রমেশবাবু আসিলে ছুটিযাপন সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে নানাপ্রকার পরামর্শ করিবে। সেখানে নিভৃতে কী কী বই পড়িয়া শেষ করিতে হইবে, দুজনে মিলিয়া তাহার একটা তালিকা করিবার কথা ছিল। স্থির ছিল, রমেশ আজ সকাল-সকাল আসিবে, কেননা, চায়ের সময় অক্ষয় কিংবা কেহ-না-কেহ আসিয়া পড়ে, তখন মন্ত্রণা করিবার অবসর পাওয়া যায় না।

কিন্তু আজ রমেশ অন্যদিনের চেয়েও দেরি করিয়া আসিয়াছে। মুখের ভাবও তাহার অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত। ইহাতে হেমনলিনীর উৎসাহে অনেকটা আঘাত পড়িল। কোনো এক সুযোগে সে রমেশকে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি আজ বড়ো যে দেরি করিয়া আসিলেন ?"

রমেশ অন্যমনস্কভাবে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "হাঁ, আজকে একটু দেরি হইয়া গেছে বটে।"

হেমনলিনী আজ তাড়াতাড়ি করিয়া কত সকাল-সকাল চুল বাঁধিয়া লইয়াছে। চুল-বাঁধা, কাপড়-ছাড়ার পরে সে আজ কতবার ঘড়ির দিকে তাকাইয়া আছে— অনেকক্ষণ পর্যন্ত মনে করিয়াছে, তাহার ঘড়িটা ভুল চলিতেছে, এখনো বেশি দেরি হয় নাই। যখন এই বিশ্বাস রক্ষা করা একেবারে অসাধ্য হইয়া উঠিল, তখন সে জানলার কাছে বসিয়া একটা সেলাই লইয়া কোনোমতে মনের অধৈর্য শান্ত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে। তাহার পরে রমেশ মুখ গম্ভীর করিয়া আসিল— কী

কারণে দেরি হইয়াছে, তাহার কোনোপ্রকার জবাবদিহি করিল না— আজ সকাল-সকাল আসিবার যেন কোনো শর্তই ছিল না।

হেমনলিনী কোনোমতে চা-খাওয়া শেষ করিয়া লইল। ঘরের প্রান্তে একটি টিপাইয়ের উপরে কতকগুলি বই ছিল, হেমনলিনী কিছু বিশেষ উদ্যমের সহিত রমেশের মনোযোগ আকর্ষণপূর্বক সেই বইগুলা তুলিয়া লইয়া ঘর হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিল। তখন হঠাৎ রমেশের চেতনা হইল; সে তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া কহিল, "ওগুলি কোথায় লইয়া যাইতেছেন? আজ একবার বইগুলি বাছিয়া লইবেন না?"

হেমনলিনীর ওষ্ঠাধর কাঁপিতেছিল। সে উদ্‌বেল অশ্রুজলের উচ্ছ্বাস বহুকষ্টে সংবরণ করিয়া কম্পিতকণ্ঠে কহিল, "থাক্ না, বই বাছিয়া কী আর হইবে।"

এই বলিয়া সে দ্রুতবেগে চলিয়া গেল। উপরের শয়নঘরে গিয়া বইগুলা মেজের উপর ফেলিয়া দিল।

রমেশের মনটা আরও বিকল হইয়া গেল। অক্ষয় মনে মনে হাসিয়া কহিল, "রমেশবাবু, আপনার বোধ হয় শরীরটা আজ তেমন ভালো নাই।"

রমেশ ইহার উত্তরে অর্ধস্ফুটস্বরে কী বলিল, ভালো বোঝা গেল না। শরীরের কথায় অন্নদাবাবু উৎসাহিত হইয়া কহিলেন, "সে তো রমেশকে দেখিয়াই আমি বলিয়াছি।"

অক্ষয় মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, "শরীরের প্রতি মনোযোগ করা রমেশবাবুর মতো লোকেরা বোধ হয় অত্যন্ত তুচ্ছ মনে করেন। উঁহারা ভাবরাজ্যের মানুষ— আহার হজম না হইলে তাহা লইয়া চেষ্টা-চরিত্র করাটাকে গ্রাম্যতা বলিয়া জ্ঞান করেন।"

অন্নদাবাবু কথাটাকে গম্ভীরভাবে লইয়া বিস্তারিতরূপে প্রমাণ করিতে বসিলেন যে, ভাবুক হইলেও হজম করাটা চাইই।

রমেশ নীরবে বসিয়া মনে মনে দগ্ধ হইতে লাগিল।

অক্ষয় কহিল, "রমেশবাবু, আমার পরামর্শ শুনুন— অন্নদাবাবুর পিল খাইয়া একটু সকাল-সকাল শুইতে যান।"

রমেশ কহিল, "অন্নদাবাবুর সঙ্গে আজ আমার একটু বিশেষ কথা আছে, সেইজন্য আমি অপেক্ষা করিয়া আছি।"

অক্ষয় চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া কহিল, "এই দেখুন, এ-কথা পূর্বে বলিলেই হইত। রমেশবাবু সকল কথা পেটে রাখিয়া দেন, শেষকালে সময় যখন প্রায় উত্তীর্ণ হইয়া যায়, তখন ব্যস্ত হইয়া উঠেন।"

অক্ষয় চলিয়া গেলে রমেশ নিজের জুতাজোড়াটার প্রতি দুই নত চক্ষু বদ্ধ রাখিয়া বলিতে লাগিল, "অন্নদাবাবু, আপনি আমাকে আত্মীয়ের মতো আপনার ঘরের মধ্যে যাতায়াত করিবার অধিকার দিয়াছেন, ইহা আমি যে কত সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া জ্ঞান করি, তাহা আপনাকে মুখে বলিয়া শেষ করিতে পারিব না।"

অন্নদাবাবু কহিলেন, "বিলক্ষণ। তুমি আমাদের যোগেনের বন্ধু, তোমাকে ঘরের ছেলে বলিয়া মনে করিব না তো কী করিব।"

ভূমিকা তো হইল, তাহার পরে কী বলিতে হইবে, রমেশ কিছুতেই ভাবিয়া পায় না। অন্নদাবাবু রমেশের পথ সুগম করিয়া দিবার জন্য কহিলেন, "রমেশ, তোমার মতো ছেলেকে ঘরের ছেলে করিতে পারা আমারই কি কম সৌভাগ্য।"

ইহার পরেও রমেশের কথা জোগাইল না।

অন্নদাবাবু কহিলেন, "দেখো না, তোমাদের সম্বন্ধে বাহিরের লোক অনেক কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা বলে হেমনলিনীর

বিবাহের বয়স হইয়াছে এখন তাহার সঙ্গিনির্বাচনসম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক। আমি তাহাদিগকে বলি, রমেশকে আমি খুব বিশ্বাস করি— সে আমাদের উপরে কখনই অন্যায় ব্যবহার করিতে পারিবে না।

রমেশ। অন্নদাবাবু, আমার সম্বন্ধে আপনি সমস্তই তো জানেন, আপনি যদি আমাকে যোগ্য পাত্র বলিয়া মনে করেন, তবে—

অন্নদা। সে-কথা বলাই বাহুল্য। আমরা তো একপ্রকার ঠিক করিয়াই রাখিয়াছি— কেবল তোমার সাংসারিক দুর্ঘটনার ব্যাপারে দিন স্থির করিতে পারি নাই। কিন্তু বাপু, আর বিলম্ব করা উচিত হয় না। সমাজে এ লইয়া ক্রমেই নানা কথার সৃষ্টি হইতেছে— সেটা যত শীঘ্র হয় বন্ধ করিয়া দেওয়া কর্তব্য। কী বলো।

রমেশ। আপনি যেরূপ আদেশ করিবেন, তাহাই হইবে। অবশ্য সর্বপ্রথমে আপনার কন্যার মত জানা আবশ্যক।

অন্নদা। সে তো ঠিক কথা। কিন্তু সে একপ্রকার জানাই আছে, তবু কাল সকালেই সে-কথাটা পাকা করিয়া লইব।

রমেশ। আপনার শুইতে যাইবার বিলম্ব হইতেছে, আজ তবে আসি।

অন্নদা। একটু দাঁড়াও। আমি বলি কী, আমরা জব্বলপুরে যাইবার আগেই তোমাদের বিবাহটা হইয়া গেলে ভালো হয়।

রমেশ। সে তো আর বেশি দেরি নাই।

অন্নদা। না, এখনো দিনদশেক আছে। আগামী রবিবারে যদি তোমাদের বিবাহ হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার পরেও যাত্রার আয়োজনের জন্য দু-তিন দিন সময় পাওয়া যাইবে। বুঝিয়াছ রমেশ, এত তাড়া করিতাম না,— কিন্তু আমার শরীরের জন্যই ভাবনা।

রমেশ সম্মত হইল এবং আর-একটা পিল গিলিয়া বাড়ি চলিয়া গেল।

১৩

বিদ্যালয়ের ছুটি নিকটবর্তী। ছুটির সময়ে কমলাকে বিদ্যালয়েই রাখিবার জন্য রমেশ কর্ত্রীর সহিত পূর্বেই ঠিক করিয়াছিল।

রমেশ প্রত্যুষে উঠিয়া ময়দানের নির্জন রাস্তায় পদচারণা করিতে করিতে স্থির করিল, বিবাহের পর সে কমলাসম্বন্ধে হেমনলিনীকে সমস্ত ঘটনা আগাগোড়া বিস্তারিত করিয়া বলিবে। তাহার পরে কমলাকেও সমস্ত কথা বলিবার অবকাশ হইবে। এইরূপ সকল পক্ষে বোঝাপড়া হইয়া গেলে কমলা স্বচ্ছন্দে বন্ধুভাবে হেমনলিনীর সঙ্গেই বাস করিতে পারিবে। দেশে ইহা লইয়া নানা কথা উঠিতে পারে, ইহাই মনে করিয়া সে হাজারিবাগে গিয়া প্র্যাকটিস করিবে স্থির করিয়াছে।

ময়দান হইতে ফিরিয়া আসিয়া রমেশ অন্নদাবাবুর বাড়ি গেল। সিঁড়িতে হঠাৎ হেমনলিনীর সঙ্গে দেখা হইল। অন্যদিন হইলে এরূপ সাক্ষাতে একটু-কিছু আলাপ হইত। আজ হেমনলিনীর মুখ লাল হইয়া উঠিল— সেই রক্তিমার মধ্য দিয়া একটা হাসির আভা উষার আলোকের মতো দীপ্তি পাইল— হেমনলিনী মুখ ফিরাইয়া চোখ নিচু করিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেল।

রমেশ যে গৎটা হেমনলিনীর কাছ হইতে হার্মোনিয়মে শিখিয়াছিল, বাসায় গিয়া সেইটে খুব করিয়া বাজাইতে লাগিল। কিন্তু একটিমাত্র গৎ সমস্ত দিন বাজানো চলে না। কবিতার বই পড়িতে চেষ্টা করিল— মনে হইল, তাহার ভালোবাসার সুর যে সুদূর উচ্চে উঠিতেছে, কোনো কবিতা সে-পর্যন্ত নাগাল পাইতেছে না।

আর হেমনলিনী অশ্রান্ত আনন্দের সহিত তাহার গৃহকর্ম সমস্ত সারিয়া নিভৃত দ্বিপ্রহরে শয়নঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া তাহার সেলাইটি লইয়া

বসিয়াছে। মুখের উপরে একটি পরিপূর্ণ প্রসন্নতার শান্তি। একটি সর্বাঙ্গীণ সার্থকতা তাহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।

চায়ের সময়ের পূর্বেই কবিতার বই এবং হার্মোনিয়ম ফেলিয়া রমেশ অন্নদাবাবুর বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। অন্যদিন হেমনলিনীর সহিত দেখা হইতে বড়ো বিলম্ব হইত না। কিন্তু আজ চায়ের ঘরে দেখিল, সে-ঘর শূন্য, দোতলায় বসিবার ঘরে দেখিল, সে-ঘরও শূন্য, হেমনলিনী এখনো তাহার শয়নগৃহ ছাড়িয়া নামে নাই।

অন্নদাবাবু যথাসময়ে আসিয়া টেবিল অধিকার করিয়া বসিলেন। রমেশ ক্ষণে ক্ষণে চকিতভাবে দরজার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।

পদশব্দ হইল, কিন্তু ঘরে প্রবেশ করিল অক্ষয়। যথেষ্ট হৃদ্যতা দেখাইয়া কহিল, "এই যে রমেশবাবু, আমি আপনার বাসাতেই গিয়াছিলাম।"

শুনিয়াই রমেশের মুখে উদ্‌বেগের ছায়া পড়িল।

অক্ষয় হাসিয়া কহিল, "ভয় কিসের রমেশবাবু। আপনাকে আক্রমণ করিতে যাই নাই। শুভসংবাদে অভিনন্দন প্রকাশ করা বন্ধুবান্ধবের কর্তব্য — তাহাই পালন করিতে গিয়াছিলাম।"

এই কথায় অন্নদাবাবুর মনে পড়িল, হেমনলিনী উপস্থিত নাই। হেমনলিনীকে ডাক দিলেন— উত্তর না পাইয়া তিনি নিজে উপরে গিয়া কহিলেন, "হেম, এ কী, এখনো সেলাই লইয়া বসিয়া আছ? চা তৈরি যে। রমেশ অক্ষয় আসিয়াছে।"

হেমনলিনী মুখ ঈষৎ লাল করিয়া কহিল, "বাবা, আমার চা উপরে পাঠাইয়া দাও— আজ আমি সেলাইটা শেষ করিতে চাই।"

অন্নদা। ওই তোমার দোষ হেম। যখন যেটা লইয়া পড়, তখন

আর-কিছুই খেয়াল কর না। যখন পড়া লইয়া ছিলে, তখন বই কোল হইতে নামিত না— এখন সেলাই লইয়া পড়িয়াছ, এখন আর-সমস্তই বন্ধ। না, না, সে হইবে না— চলো, নিচে গিয়া চা খাইবে চলো।

এই বলিয়া অন্নদাবাবু জোর করিয়াই হেমনলিনীকে নিচে লইয়া আসিলেন। সে আসিয়া কাহারো দিকে দৃষ্টি না করিয়া তাড়াতাড়ি চা ঢালিবার ব্যাপারে ভারি ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

অন্নদাবাবু অধীর হইয়া কহিলেন, "হেম, ও কী করিতেছ। আমার পেয়ালায় চিনি দিতেছ কেন। আমি তো কোনোকালেই চিনি দিয়া চা খাই না।"

অক্ষয় টিপিটিপি হাসিয়া কহিল, "আজ উনি ঔদার্য সংবরণ করিতে পারিতেছেন না— আজ সকলকেই মিষ্ট বিতরণ করিবেন।"

হেমনলিনীর প্রতি এই প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ রমেশের মনে মনে অসহ্য হইল। সে তৎক্ষণাৎ স্থির করিল, "আর যাই হউক, বিবাহের পরে অক্ষয়ের সহিত কোনো সম্পর্ক রাখা হইবে না।"

ইহার তিন-চার দিন পরে একদিন সন্ধ্যার সময় চায়ের টেবিলে অক্ষয় কহিল, "রমেশবাবু, আপনার নামটা বদলাইয়া ফেলুন।"

রমেশ এই রসিকতার চেষ্টায় অধিকতর বিরক্ত হইয়া কহিল, "কেন বলুন দেখি।"

অক্ষয় খবরের কাগজ খুলিয়া কহিল, "এই দেখুন, আপনার নামের একজন ছাত্র অন্যলোককে নিজের নামে চালাইয়া পরীক্ষা দেওয়াইয়া পাস হইয়াছিল, হঠাৎ ধরা পড়িয়াছে।"

হেমনলিনী জানে, রমেশ মুখের উপর উত্তর দিতে পারে না— সেই-জন্য এতকাল অক্ষয় রমেশকে যত আঘাত করিয়াছে, সে-ই তাহার প্রতিঘাত দিয়া আসিয়াছে। আজও থাকিতে পারিল না। গূঢ় ক্রোধের

লক্ষণ চাপিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, "অক্ষয় বলিয়া ঢের লোক বোধ হয় জেলখানায় আছে।"

অক্ষয় কহিল, "ওই দেখুন, বন্ধুভাবে সৎপরামর্শ দিতে গেলে আপনারা রাগ করেন। তবে সমস্ত ইতিহাসটা বলি। আপনি তো জানেন, আমার ছোটো বোন শরৎ বালিকা বিদ্যালয়ে পড়িতে যায়। সে কাল সন্ধ্যার সময় আসিয়া কহিল, 'দাদা, তোমাদের রমেশবাবুর স্ত্রী আমাদের ইস্কুলে পড়েন।'

"আমি বলিলাম, 'দূর পাগলী, আমাদের রমেশবাবু ছাড়া কি আর দ্বিতীয় রমেশবাবু জগতে নাই!' শরৎ কহিল, 'তা যেই হোন, তিনি তাঁর স্ত্রীর উপরে ভারি অন্যায় করিতেছেন। ছুটিতে প্রায় সব মেয়েই বাড়ি যাইতেছে,—তিনি তাঁর স্ত্রীকে বোর্ডিঙে রাখিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। সে-বেচারা কাঁদিয়া কাটিয়া অনর্থপাত করিতেছে।' আমি তখনি মনে মনে কহিলাম, 'এ তো ভালো কথা নহে, শরৎ যেমন ভুল করিয়াছিল, এমন ভুল আরো তো কেহ কেহ করিতে পারে'।"

অন্নদাবাবু হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন, "অক্ষয়, তুমি কী পাগলের মতো কথা কহিতেছ। কোন্ রমেশের স্ত্রী ইস্কুলে পড়িয়া কাঁদিতেছে বলিয়া আমাদের রমেশ নাম বদলাইবে নাকি।"

এমন সময়ে হঠাৎ বিবর্ণমুখে রমেশ ঘর হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল। অক্ষয় বলিয়া উঠিল, "ও কী রমেশবাবু, আপনি রাগ করিয়া চলিয়া গেলেন নাকি। দেখুন দেখি, আপনি কি মনে করেন আপনাকে আমি সন্দেহ করিতেছি।"—বলিয়া রমেশের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাহির হইয়া গেল।

অন্নদাবাবু কহিলেন, "এ কী কাণ্ড।"

হেমনলিনী কাঁদিয়া ফেলিল। অন্নদাবাবু ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "ও কী হেম, কাঁদিস কেন।"

সে উচ্ছ্বসিত রোদনের মধ্যে রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "বাবা, অক্ষয়বাবুর ভারি অন্যায়। কেন উনি আমাদের বাড়িতে ভদ্রলোককে এমন করিয়া অপমান করেন।"

অন্নদাবাবু কহিলেন, "অক্ষয় ঠাট্টা করিয়া একটা কী বলিয়াছে, ইহাতে এত অস্থির হইবার কী দরকার ছিল।"

"এ-রকম ঠাট্টা অসহ্য।"— বলিয়া দ্রুতপদে হেমনলিনী উপরে চলিয়া গেল।

এইবার কলিকাতায় আসার পর রমেশ বিশেষ যত্নের সহিত কমলার স্বামীর সন্ধান করিতেছিল। বহুকষ্টে ধোবাপুকুরটা কোন্ জায়গায়, তাহা বাহির করিয়া কমলার মামা তারিণীচরণকে এক পত্র লিখিয়াছিল।

উক্ত ঘটনার পরদিন প্রাতে রমেশ সেই পত্রের জবাব পাইল। তারিণীচরণ লিখিতেছেন— দুর্ঘটনার পরে তাঁহার জামাতা শ্রীমান্ নলিনাক্ষের কোনো সংবাদই পাওয়া যায় নাই। রংপুরে তিনি ডাক্তারি করিতেন— সেখানে চিঠি লিখিয়া তারিণীচরণ জানিয়াছেন, সেখানেও কেহ আজ পর্যন্ত তাঁহার কোনো খবর পায় নাই। তাঁহার জন্মস্থান কোথায়, তাহা তারিণীচরণের জানা নাই।

কমলার স্বামী নলিনাক্ষ যে বাঁচিয়া আছেন, এ-আশা আজ রমেশের মন হইতে একেবারে দূর হইল।

সকালে রমেশের হাতে আরও অনেকগুলা চিঠি আসিয়া পড়িল। বিবাহের সংবাদ পাইয়া তাহার আলাপী পরিচিত অনেকে তাহাকে অভিনন্দন-পত্র লিখিয়াছে। কেহ বা আহারের দাবি জানাইয়াছে, কেহ বা এতদিন সমস্ত ব্যাপারটা সে গোপন রাখিয়াছে বলিয়া, রমেশকে সকৌতুক তিরস্কার করিয়াছে।

এমন সময়ে অন্নদাবাবুর বাড়ি হইতে চাকর একখানি চিঠি লইয়া রমেশের হাতে দিল। হাতের অক্ষর দেখিয়া রমেশের বুকের ভিতরটা দুলিয়া উঠিল।

হেমনলিনীর চিঠি। রমেশ মনে করিল, "অক্ষয়ের কথা শুনিয়া হেমনলিনীর মনে সন্দেহ জন্মিয়াছে এবং তাহাই দূর করিবার জন্য সে রমেশকে পত্র লিখিয়াছে।"

চিঠি খুলিয়া দেখিল, তাহাতে কেবল এই কটি কথা লেখা আছে—

"অক্ষয়বাবু কাল আপনার উপর ভারি অন্যায় করিয়াছেন। মনে করিয়াছিলাম, আজ সকালেই আপনি আসিবেন, কেন আসিলেন না। অক্ষয়বাবুর কথা কেন আপনি এত করিয়া মনে লইতেছেন। আপনি তো জানেন, আমি তাঁর কথা গ্রাহ্যই করি না। আপনি আজ সকাল-সকাল আসিবেন—আমি আজ সেলাই ফেলিয়া রাখিব।"

এই কটি কথার মধ্যে হেমনলিনীর সান্ত্বনাসুধাপূর্ণ কোমল হৃদয়ের ব্যথা অনুভব করিয়া রমেশের চোখে জল আসিল। রমেশ বুঝিল, কাল হইতেই হেমনলিনী রমেশের বেদনা শান্ত করিবার জন্য ব্যগ্রহৃদয়ে প্রতীক্ষা করিয়া আছে। এমনি করিয়া রাত গিয়াছে, এমনি করিয়া সকালটা কাটিয়াছে, অবশেষে আর থাকিতে না পারিয়া এই চিঠিখানি লিখিয়াছে।

রমেশ কাল হইতে ভাবিতেছে, আর বিলম্ব না করিয়া এইবার হেমনলিনীকে সকল কথা খুলিয়া বলা আবশ্যক হইয়াছে। কিন্তু কল্যকার ব্যাপারের পর বলা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। এখন ঠিক শুনাইবে, যেন অপরাধ ধরা পড়িয়া জবাবদিহির চেষ্টা হইতেছে। শুধু তাহাই নহে, অক্ষয়ের যে কতকটা জয় হইবে, সেও অসহ্য।

রমেশ ভাবিতে লাগিল, "কমলার স্বামী যে আর-কোনো রমেশ, নিশ্চয়ই অক্ষয়ের মনে সেই ধারণাই আছে— নহিলে সে এতক্ষণে কেবল ইঙ্গিত করিয়া থামিয়া থাকিত না, পাড়াসুদ্ধ গোল করিয়া বেড়াইত। অতএব এই বেলা যাহা-হয়-একটা উপায় অবলম্বন করা দরকার।"

এমন সময় আর-একটা ডাকের চিঠি আসিল। রমেশ খুলিয়া দেখিল সে-চিঠি স্ত্রীবিদ্যালয়ের কর্ত্রীর নিকট হইতে আসিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন, কমলা অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছে, তাহাকে এ-অবস্থায় ছুটির সময় বিদ্যালয়ের বোর্ডিঙে রাখা তিনি সংগত বোধ করেন না। আগামী শনিবারে ইস্কুল হইয়া ছুটি হইবে, সেই সময়ে তাহাকে বিদ্যালয় হইতে বাড়ি লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করা নিতান্ত আবশ্যক।

অগামী শনিবারে কমলাকে বিদ্যালয় হইতে লইয়া আসিতে হইবে। আগামী রবিবারে রমেশের বিবাহ।

"রমেশবাবু, আমাকে মাপ করিতে হইবে।"—এই বলিয়া অক্ষয় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। কহিল, "এমন একটা সামান্য ঠাট্টায় আপনি যে এত রাগ করিবেন, তাহা আগে জানিলে আমি ও-কথা তুলিতাম না। ঠাট্টার মধ্যে কিছু সত্য থাকিলেই লোকে চটিয়া ওঠে, কিন্তু যাহা একেবারে অমূলক, তাহা লইয়া আপনি সকলের সাক্ষাতে এত রাগারাগি করিলেন কেন। অন্নদাবাবু তো কাল হইতে আমাকে ভর্ৎসনা করিতেছেন— হেমনলিনী আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করিয়াছেন। আজ সকালে তাঁহাদের ওখানে গিয়াছিলাম, তিনি ঘর ছাড়িয়া চলিয়াই গেলেন। আমি এমন কী অপরাধ করিয়াছিলাম বলুন দেখি।"

রমেশ কহিল, "এ-সমস্ত বিচার যথাসময়ে হইবে। এখন আমাকে মাপ করিবেন— আমার বিশেষ একটা প্রয়োজন আছে।"

অক্ষয়। রোশনচৌকির বায়না দিতে চলিয়াছেন বুঝি। এদিকে সময়সংক্ষেপ। আমি আপনার শুভকর্মে বাধা দিব না, চলিলাম।

অক্ষয় চলিয়া গেলে রমেশ অন্নদাবাবুর বাসায় গিয়া উপস্থিত হইল। ঘরে ঢুকিতেই হেমনলিনীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। আজ রমেশ সকাল-সকাল আসিবে, ইহা হেমনলিনী নিশ্চয় ঠিক করিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়া ছিল। তাহার সেলাইয়ের ব্যাপারটি ভাঁজ করিয়া রুমালে বাঁধিয়া টেবিলের উপরে রাখিয়া দিয়াছিল। পাশে হার্মোনিয়ম-যন্ত্রটি ছিল। আজ খানিকটা সংগীত-আলোচনা হইতে পারিবে, এইরূপ তাহার আশা ছিল। তা ছাড়া অব্যক্ত সংগীত তো আছেই।

রমেশ ঘরে ঢুকিতেই হেমনলিনীর মুখে একটি উজ্জ্বল-কোমল আভা পড়িল। কিন্তু সে-আভা মুহূর্তেই ম্লান হইয়া গেল যখন রমেশ আর কোনো কথা না বলিয়া প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিল, "অন্নদাবাবু কোথায়।"

হেমনলিনী উত্তর করিল, "বাবা তাঁহার বসিবার ঘরে আছেন। কেন। তাঁহাকে কি এখনি প্রয়োজন আছে। তিনি তো সেই চা খাইবার সময় নামিয়া আসিবেন।"

রমেশ। না, আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে। আর বিলম্ব করা উচিত হইবে না।

হেমনলিনী। তবে যান, তিনি ঘরেই আছেন।

রমেশ চলিয়া গেল। প্রয়োজন আছে! সংসারে প্রয়োজনেরই কেবল সবুর সয় না। আর ভালোবাসাকেই দ্বারের বাহিরে অবকাশ-প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়!

শরতের এই অম্লান দিন যেন নিশ্বাস ফেলিয়া আপন আনন্দ-ভাণ্ডারের সোনার সিংহদ্বারটি বন্ধ করিয়া দিল। হেমনলিনী হার্মোনিয়মের নিকট হইতে চৌকি সরাইয়া লইয়া টেবিলের কাছে

বসিয়া একমনে সেলাই করিতে প্রবৃত্ত হইল। ছুঁচ ফুটিতে লাগিল কেবল বাহিরে নহে, ভিতরেও। রমেশের প্রয়োজনও শীঘ্র শেষ হইল না। প্রয়োজন রাজার মতো আপনার পুরা সময় লয়— আর ভালোবাসা কাঙাল।

১৪

রমেশ অন্নদাবাবুর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন অন্নদাবাবু মুখের উপরে খবরের কাগজ চাপা দিয়া কেদারায় পড়িয়া নিদ্রা দিতেছিলেন। রমেশ ঘরে প্রবেশ করিয়া কাসিতেই, তিনি চকিত হইয়া উঠিয়া খবরের কাগজটা তুলিয়া ধরিয়াই কহিলেন, "দেখিয়াছ রমেশ, এবারে ওলাউঠায় কত লোক মরিয়াছে।"

রমেশ কহিল, "বিবাহ এখন কিছুদিন বন্ধ রাখিতে হইবে—আমার বিশেষ কাজ আছে।"

অন্নদাবাবুর মাথা হইতে শহরের মৃত্যুতালিকার বিবরণ একেবারে লুপ্ত হইয়া গেল। ক্ষণকাল রমেশের মুখের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "সে কী কথা রমেশ। নিমন্ত্রণ যে হইয়া গেছে।"

রমেশ কহিল, "এই রবিবারের পরের রবিবারে দিন পিছাইয়া দিয়া আজই পত্র বিলি করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।"

অন্নদা। রমেশ, তুমি আমাকে অবাক করিলে। এ কি মকদ্দমা যে, তোমার সুবিধামতো তুমি দিন পিছাইয়া মুলতুবি করিতে থাকিবে। তোমার প্রয়োজনটা কী, শুনি।

রমেশ। সে অত্যন্ত বিশেষ প্রয়োজন, বিলম্ব করিলে চলিবে না।

অন্নদাবাবু বাতাহত কদলীবৃক্ষের মতো কেদারার উপর হেলান দিয়া

পড়িলেন— কহিলেন, "বিলম্ব করিলে চলিবে না। বেশ কথা, অতি উত্তম কথা। এখন তোমার যাহা ইচ্ছা হয় করো। নিমন্ত্রণ ফিরাইয়া লইবার ব্যবস্থা তোমার বুদ্ধিতে যাহা আসে, তাহাই হোক। লোকে যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিবে, আমি বলিব, 'আমি ও-সব কিছুই জানি না,—তাঁহার কী আবশ্যক, সে তিনিই জানেন, আর কবে তাঁহার সুবিধা হইবে, সে তিনিই বলিতে পারেন।"

রমেশ উত্তর না করিয়া নতমুখে বসিয়া রহিল। অন্নদাবাবু কহিলেন, "হেমনলিনীকে সব কথা বলা হইয়াছে?"

রমেশ। না, তিনি এখনো জানেন না।

অন্নদা। তাঁহার তো জানা আবশ্যক। তোমার তো একলার বিবাহ নয়।

রমেশ। আপনাকে আগে জানাইয়া তাঁহাকে জানাইব স্থির করিয়াছি।

অন্নদাবাবু ডাকিয়া উঠিলেন, "হেম, হেম।"

হেমনলিনী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল, "কী বাবা।"

অন্নদা। রমেশ বলিতেছেন, উঁহার কী-একটা বিশেষ কাজ পড়িয়াছে, এখন উঁহার বিবাহ করিবার অবকাশ হইবে না।

হেমনলিনী একবার বিবর্ণমুখে রমেশের মুখের দিকে চাহিল। রমেশ অপরাধীর মতো নিরুত্তরে বসিয়া রহিল।

হেমনলিনীর কাছে এ-খবরটা যে এমন করিয়া দেওয়া হইবে, রমেশ তাহা প্রত্যাশা করে নাই। অপ্রিয় বার্তা অকস্মাৎ এইরূপ নিতান্ত রূঢ়ভাবে হেমনলিনীকে যে কিরূপ মর্মান্তিকরূপে আঘাত করিল, রমেশ তাহা নিজের ব্যথিত অন্তঃকরণের মধ্যেই সম্পূর্ণ অনুভব করিতে পারিল। কিন্তু যে-তীর একবার নিক্ষিপ্ত হয়, তাহা আর ফেরে না,—রমেশ যে

স্পষ্ট দেখিতে পাইল, এই নিষ্ঠুর তীর হেমনলিনীর হৃদয়ের ঠিক মাঝখানে গিয়া বিঁধিয়া রহিল।

এখন কথাটা আর কোনোমতে নরম করিয়া লইবার উপায় নাই। সবই সত্য— বিবাহ এখন স্থগিত রাখিতে হইবে, রমেশের বিশেষ প্রয়োজন আছে, কী প্রয়োজন তাহাও সে বলিতে ইচ্ছা করে না। ইহার উপরে এখন আর নূতন ব্যাখ্যা কী হইতে পারে।

অন্নদাবাবু হেমনলিনীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তোমাদেরই কাজ, এখন তোমরাই ইহার যা হয় একটা মীমাংসা করিয়া লও।"

হেমনলিনী মুখ নত করিয়া বলিল, "বাবা আমি ইহার কিছুই জানি না।"—এই বলিয়া ঝড়ের মেঘের মুখে সূর্যাস্তের ম্লান আভাটুকু যেমন মিলাইয়া যায়, তেমনি করিয়া সে চলিয়া গেল।

অন্নদাবাবু খবরের কাগজ মুখের উপর তুলিয়া পড়িবার ভান করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। রমেশ নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

হঠাৎ রমেশ একসময় চমকিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল। বসিবার বড়ো ঘরে গিয়া দেখিল, হেমনলিনী জানলার কাছে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার দৃষ্টির সম্মুখে আসন্ন পূজার ছুটির কলিকাতা, জোয়ারের নদীর মতো তাহার সমস্ত রাস্তা ও গলির মধ্যে স্ফীত জনপ্রবাহে চঞ্চল-মুখর হইয়া উঠিয়াছে।

রমেশ একেবারে তাহার পার্শ্বে যাইতে কুণ্ঠিত হইল। পশ্চাৎ হইতে কিছুক্ষণের জন্য স্থিরদৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতে লাগিল। শরতের অপরাহ্ণ-আলোকে বাতায়নবর্তিনী এই স্তব্ধ মূর্তিটি রমেশের মনের মধ্যে একটি চিরস্থায়ী ছবি আঁকিয়া দিল। ওই সুকুমার কপোলের একটি অংশ, ওই সযত্নরচিত কবরীর ভঙ্গি, ওই গ্রীবার উপরে কোমলবিরল কেশগুলি, তাহারই নিচে সোনার হারের একটুখানি আভাস, বাম স্কন্ধ

হইতে লম্বিত অঞ্চলের বঙ্কিম প্রান্ত, সমস্তই রেখায় রেখায় তাহার পীড়িত চিত্তের মধ্যে যেন কাটিয়া কাটিয়া বসিয়া গেল।

রমেশ আস্তে আস্তে হেমনলিনীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। হেমনলিনী রমেশের চেয়ে রাস্তার লোকদের জন্য যেন বেশি ঔৎসুক্য বোধ করিতে লাগিল। রমেশ বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "আপনার কাছে আমার একটি ভিক্ষা আছে।"

রমেশের কণ্ঠস্বরে উদ্‌বেল বেদনার আঘাত অনুভব করিয়া মুহূর্তের মধ্যে হেমনলিনীর মুখ ফিরিয়া আসিল। রমেশ বলিয়া উঠিল, "তুমি আমাকে অবিশ্বাস করিয়ো না।" রমেশ এই প্রথম হেমনলিনীকে 'তুমি' বলিল। "এই কথা আমাকে বলো যে, তুমি আমাকে কখনো অবিশ্বাস করিবে না। আমিও অন্তর্যামীকে অন্তরে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি, তোমার কাছে আমি কখনো অবিশ্বাসী হইব না।"

রমেশের আর কথা বাহির হইল না, তাহার চোখের প্রান্তে জল দেখা দিল। তখন হেমনলিনী তাহার স্নিগ্ধকরুণ দুই চক্ষু তুলিয়া রমেশের মুখের দিকে স্থির করিয়া রাখিল। তাহার পরে সহসা বিগলিত অশ্রুধারা হেমনলিনীর দুই কপোল বাহিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সেই নিভৃত বাতায়নতলে দুইজনের মধ্যে একটি বাক্যহীন শান্তি ও সান্ত্বনার স্বর্গখণ্ড সৃজিত হইয়া গেল।

কিছুক্ষণ এই অশ্রুজলপ্লাবিত সুগভীর মৌনের মধ্যে হৃদয়মন নিমগ্ন রাখিয়া একটি আরামের দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রমেশ কহিল, "কেন আমি এখন সপ্তাহের জন্য বিবাহ স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছি, তাহার কারণ কি তুমি জানিতে চাও।"

হেমনলিনী নীরবে মাথা নাড়িল— সে জানিতে চায় না।

রমেশ কহিল, "বিবাহের পরে আমি তোমাকে সব কথা খুলিয়া বলিব।"

এই কথাটায় হেমনলিনীর কপোলের কাছটা একটুখানি রাঙা হইয়া উঠিল।

আজ আহারান্তে হেমনলিনী যখন রমেশের সহিত মিলনপ্রত্যাশায় উৎসুকচিত্তে সাজ করিতেছিল তখন সে অনেক হাসিগল্প, অনেক নিভৃত পরামর্শ, অনেক ছোটোখাটো সুখের ছবি কল্পনায় সৃজন করিয়া লইতেছিল। কিন্তু এই যে অল্প কয় মুহূর্তে দুই হৃদয়ের মধ্যে বিশ্বাসের মালাবদল হইয়া গেল— এই যে চোখের জল ঝরিয়া পড়িল, কথাবার্তা কিছুই হইল না, কিছুক্ষণের জন্য দুইজনে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া রহিল— ইহার নিবিড় আনন্দ, ইহার গভীর শান্তি, ইহার পরম আশ্বাস সে কল্পনাও করিতে পারে নাই।

হেমনলিনী কহিল, "তুমি একবার বাবার কাছে যাও, তিনি বিরক্ত হইয়া আছেন।"

রমেশ প্রফুল্লচিত্তে সংসারের ছোটো-বড়ো আঘাত-সংঘাত বুক পাতিয়া লইবার জন্য চলিয়া গেল।

১৫

অন্নদাবাবু রমেশকে পুনরায় গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া উদ্‌বিগ্নভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন।

রমেশ কহিল, "নিমন্ত্রণের ফর্দটা যদি আমার হাতে দেন, তবে দিনপরিবর্তনের চিঠিগুলি আজি রওনা করিয়া দিতে পারি।"

অন্নদাবাবু কহিলেন, "তবে দিনপরিবর্তনই স্থির রহিল?"

রমেশ কহিল, "হাঁ, অন্য উপায় আর কিছুই দেখি না।"

অন্নদাবাবু কহিলেন, "দেখো বাপু, তবে আমি ইহার মধ্যে নাই। যাহা-কিছু বন্দোবস্ত করিবার, সে তুমিই করিয়ো। আমি লোক হাসাইতে পারিব না। বিবাহ-ব্যাপারটাকে যদি নিজের মর্জি অনুসারে ছেলেখেলা করিয়া তোলো, তবে আমার মতো বয়সের লোকের ইহার মধ্যে না থাকাই ভালো। এই লও তোমার নিমন্ত্রণের ফর্দ। ইতিমধ্যে আমি কতকগুলা টাকা খরচ করিয়া ফেলিয়াছি, তাহার অনেকটাই নষ্ট হইবে। এমনি করিয়া বার বার টাকা জলে ফেলিয়া দিতে পারি, এমন সংগতি আমার নাই।"

রমেশ সমস্ত ব্যয় ও ব্যবস্থার ভার নিজের স্কন্ধে লইতেই প্রস্তুত হইল। সে উঠিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় অন্নদাবাবু কহিলেন, "রমেশ, বিবাহের পরে তুমি কোথায় প্র্যাকটিস করিবে, কিছু স্থির করিয়াছ? কলিকাতায় নয়?"

রমেশ কহিল, "না। পশ্চিমে একটা ভালো জায়গার সন্ধান করিতেছি।"

অন্নদাবাবু। সেই ভালো, পশ্চিমই ভালো। এটোয়া তো মন্দ জায়গা নয়। সেখানকার জল হজমের পক্ষে অতি উত্তম— আমি সেখানে মাসখানেক ছিলাম— সেই এক মাসে আমার আহারের পরিমাণ ডবল বাড়িয়া গিয়াছিল। দেখো বাপু, সংসারে আমার ওই একটিমাত্র মেয়ে — আমি সর্বদা উহার কাছে-কাছে না থাকিলে সেও সুখী হইবে না, আমিও নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না। তাই আমার ইচ্ছা, তোমাকে একটা স্বাস্থ্যকর জায়গা বাছিয়া লইতে হইবে।

অন্নদাবাবু রমেশের একটা অপরাধের অবকাশ পাইয়া সেই সুযোগে নিজের বড়ো বড়ো দাবিগুলা উপস্থিত করিতে আরম্ভ করিলেন।

সে-সময়ে রমেশকে তিনি যদি এটোয়া না বলিয়া গারো বা চেরাপুঞ্জির কথা বলিতেন, তবে তৎক্ষণাৎ সে রাজি হইত। সে কহিল, "যে আজ্ঞা, আমি এটোয়াতেই প্র্যাকটিস করিব।"— এই বলিয়া রমেশ নিমন্ত্রণ-প্রত্যাখ্যানের কার্যভার লইয়া প্রস্থান করিল।

অনতিকাল পরে অক্ষয় ঘরে ঢুকিতেই অন্নদাবাবু কহিলেন, "রমেশ তাহার বিবাহের দিন এক সপ্তাহ পিছাইয়া দিয়াছে।"

অক্ষয়। না না, আপনি বলেন কী। সে কি কখনো হইতে পারে। পরশু যে বিবাহ!

অন্নদা। হইতে তো না পারাই উচিত ছিল— সাধারণ লোকের তো এমনতরো হয় না। কিন্তু আজকাল তোমাদের যে-রকম কাণ্ড দেখিতেছি, সবই সম্ভব।

অক্ষয় অত্যন্ত মুখ গম্ভীর করিয়া আড়ম্বর-সহকারে চিন্তা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে কহিল, "আপনারা যাহাকে একবার সৎপাত্র বলিয়া ঠাওরাইয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে ভুটি চক্ষু বুজিয়া থাকেন। মেয়েকে যাহার হাতে চিরদিনের মতো সমর্পণ করিতে যাইতেছেন, ভালো করিয়া তাহার সম্বন্ধে খোঁজখবর রাখা উচিত। হোক না কেন সে স্বর্গের দেবতা, তবু সাবধানের বিনাশ নাই।"

অন্নদা। রমেশের মতো ছেলেকেও যদি সন্দেহ করিয়া চলিতে হয়, তবে তো সংসারে কাহারো সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

অক্ষয়। আচ্ছা, এই যে দিন পিছাইয়া দিতেছেন, রমেশবাবু তাহার কারণ কিছু বলিয়াছেন?

অন্নদাবাবু মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, "না, কারণ তো কিছু বলিল না— জিজ্ঞাসা করিলে বলে, বিশেষ দরকার আছে।"

অক্ষয় মুখ ফিরাইয়া ঈষৎ একটু হাসিল মাত্র। তাহার পরে কহিল,

"বোধ হয় আপনার মেয়ের কাছে রমেশবাবু একটা কারণ নিশ্চয় কী বলিয়াছেন।"

অন্নদাবাবু। সম্ভব বটে।

অক্ষয়। তাঁহাকে একবার ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিলে ভালো হয় না?

"ঠিক বলিয়াছ।"— বলিয়া অন্নদাবাবু উচ্চৈঃস্বরে হেমনলিনীকে ডাক দিলেন। হেমনলিনী ঘরে ঢুকিয়া অক্ষয়কে দেখিয়া তাহার বাপের পাশে এমন করিয়া দাঁড়াইল, যাহাতে অক্ষয় তাহার মুখ না দেখিতে পায়।

অন্নদাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিবাহের দিন যে হঠাৎ পিছাইয়া গেল, রমেশ তাহার কারণ তোমাকে কিছু বলিয়াছেন?"

হেমনলিনী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "না।"

অন্নদাবাবু। তুমি তাহাকে কারণ জিজ্ঞাসা কর নাই?

হেমনলিনী। না।

অন্নদাবাবু। আশ্চর্য ব্যাপার। যেমন রমেশ, তুমিও দেখি তেমনি। তিনি আসিয়া বলিলেন, 'আমার বিবাহে ফুরসৎ হইতেছে না'— তুমিও বলিলে, 'বেশ ভালো, আর-একদিন হইবে।' বাস্, আর কোনো কথাবার্তা নাই!

অক্ষয় হেমনলিনীর পক্ষ লইয়া কহিল, "একজন লোক যখন স্পষ্টই কারণ গোপন করিতেছে, তখন সে-কথা লইয়া তাঁহাকে কি কোনো প্রশ্ন করা ভালো দেখায়। যদি বলিবার মতো কিছু হইত, তবে তো রমেশবাবু আপনিই বলিতেন।"

হেমনলিনীর মুখ লাল হইয়া উঠিল— সে কহিল, "এই বিষয় লইয়া আমি বাহিরের লোকের কাছে কোনো কথাই শুনিতে চাই না। যাহা ঘটিয়াছে, তাহাতে আমার মনে কোনো ক্ষোভ নাই।"

এই বলিয়া হেমনলিনী দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। অক্ষয় পাংশু মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া কহিল, "সংসারে বন্ধুর কাজটাতেই সবচেয়ে লাঞ্ছনা বেশি। সেইজন্যই আমি বন্ধুত্বের গৌরব বেশি অনুভব করি। আপনারা আমাকে ঘৃণা করুন আর গালি দিন, রমেশকে সন্দেহ করাই আমি বন্ধুর কর্তব্য বলিয়া জ্ঞান করি। আপনাদের যেখানে কোনো বিপদের সম্ভাবনা দেখি, সেখানে আমি অসংশয়ে থাকিতে পারি না— আমার এই একটা মস্ত দুর্বলতা আছে, এ-কথা আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে। যাই হোক, যোগেন তো কালই আসিতেছে, সেও যদি সমস্ত দেখিয়া-শুনিয়া নিজের বোনের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকে, তবে এ-বিষয়ে আমি আর-কোনো কথা কহিব না।"

রমেশের ব্যবহারসম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার সময় আসিয়াছে, অন্নদাবাবু এ-কথা একেবারে বোঝেন না, তাহা নহে— কিন্তু যাহা অগোচরে আছে, তাহাকে বলপূর্বক আলোড়িত করিয়া তাহার মধ্য হইতে হঠাৎ একটা ঝঞ্ঝা আবিষ্কারের সম্ভাবনায় তিনি স্বভাবত তাহাতে কিছুমাত্র আগ্রহ-বোধ করেন না।

অক্ষয়ের উপর তাঁহার রাগ হইল। তিনি কহিলেন, "অক্ষয়, তোমার স্বভাবটা বড়ো সন্দিগ্ধ। প্রমাণ না পাইয়া কেন তুমি—"

অক্ষয় আপনাকে দমন করিতে জানে. কিন্তু উত্তরোত্তর আঘাতে আজ তাহার ধৈর্য ভাঙিয়া গেল। সে উত্তেজিত হইয়া কহিল, "দেখুন অন্নদাবাবু, আমার অনেক দোষ আছে। আমি সৎপাত্রের প্রতি ঈর্ষা করি, আমি সাধুলোককে সন্দেহ করি। ভদ্রলোকের মেয়েদের ফিলজফি পড়াইবার মতো বিদ্যা আমার নাই, এবং তাঁহাদের সহিত কাব্য আলোচনা করিবার স্পর্ধাও আমি রাখি না— আমি সাধারণ দশজনের মধ্যেই গণ্য— কিন্তু চিরদিন আমি আপনাদের প্রতি অনুরক্ত, আপনাদের

অনুগত। রমেশবাবুর সঙ্গে আর-কোনো বিষয়ে আমার তুলনা হইতে পারে না— কিন্তু এইটুকুমাত্র অহংকার আমার আছে, আপনাদের কাছে কোনোদিন আমার কিছু লুকাইবার নাই। আপনাদের কাছে আমার সমস্ত দৈন্য প্রকাশ করিয়া আমি ভিক্ষা চাহিতে পারি, কিন্তু সিঁদ কাটিয়া চুরি করা আমার স্বভাব নহে। এ-কথার কী অর্থ, তাহা কালই আপনারা বুঝিতে পারিবেন।"

১৬

চিঠি বিলি করিয়া দিতে রাত হইয়া পড়িল। রমেশ শুইতে গেল, কিন্তু ঘুম হইল না। তাহার মনের ভিতর গঙ্গাযমুনার মতো সাদা-কালো দুই রঙের চিন্তাধারা প্রবাহিত হইতেছিল। দুইটার কল্লোল একসঙ্গে মিশিয়া তাহার বিশ্রামক্ষণকে মুখর করিয়া তুলিতেছিল।

বারকয়েক পাশ ফিরিয়া সে উঠিয়া পড়িল। জানলার কাছে দাঁড়াইয়া দেখিল, তাহাদের জনশূন্য গলির একপাশে বাড়িগুলির ছায়া, আর-একপাশে শুভ্র জ্যোৎস্নার রেখা।

রমেশ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যাহা নিত্য, যাহা শান্ত, যাহা বিশ্বব্যাপী, যাহার মধ্যে দ্বন্দ্ব নাই, দ্বিধা নাই, রমেশের সমস্ত অন্তঃপ্রকৃতি বিগলিত হইয়া তাহার মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল। যে শব্দবিহীন সীমাবিহীন মহালোকের নেপথ্য হইতে চিরকাল ধরিয়া জন্ম এবং মৃত্যু, কর্ম এবং বিশ্রাম, আরম্ভ এবং অবসান, কোন্ অশ্রুত সংগীতের অপরূপ তালে বিশ্বরঙ্গভূমির মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, রমেশ সেই আলো-অন্ধকারের অতীত দেশ হইতে নরনারীর যুগল প্রেমকে এই নক্ষত্র-দীপালোকিত নিখিলের মধ্যে আবির্ভূত হইতে দেখিল।

রমেশ তখন ধীরে ধীরে ছাদের উপর উঠিল। অন্নদাবাবুর বাড়ির দিকে চাহিল। সমস্ত নিস্তব্ধ। বাড়ির দেওয়ালের উপরে, কার্নিসের নিচে, জানলা-দরজার খাঁজের মধ্যে, চুনবালিখসা ভিতের গায়ে জ্যোৎস্না এবং ছায়া বিচিত্র আকারের রেখা ফেলিয়াছে।

এ কী বিস্ময়। এই জনপূর্ণ নগরের মধ্যে ওই সামান্য গৃহের ভিতরে একটি মানবীর বেশে এ কী বিস্ময়। এই রাজধানীতে কত ছাত্র, কত উকিল, কত প্রবাসী ও নিবাসী আছে, তাহার মধ্যে রমেশের মতো একজন সাধারণ লোক কোথা হইতে একদিন আশ্বিনের পীতাভ রৌদ্রে ওই বাতায়নে একটি বালিকার পাশে নীরবে দাঁড়াইয়া জীবনকে ও জগৎকে এক অপরিসীম-আনন্দময় রহস্যের মাঝখানে ভাসমান দেখিল— এ কী বিস্ময়। হৃদয়ের ভিতরে আজ এ কী বিস্ময়, হৃদয়ের বাহিরে আজ এ কী বিস্ময়।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত রমেশ ছাদে বেড়াইল। ধীরে ধীরে কখন এক-সময়ে খণ্ড-চাঁদ সম্মুখের বাড়ির আড়ালে নামিয়া গেল। পৃথিবীতলে রাত্রির কালিমা ঘনীভূত হইল— আকাশ তখনো বিদায়োন্মুখ আলোকের আলিঙ্গনে পাণ্ডুবর্ণ।

রমেশের ক্লান্ত শরীর শীতে শিহরিয়া উঠিল। হঠাৎ একটা আশঙ্কা থাকিয়া থাকিয়া তাহার হৃৎপিণ্ডকে চাপিয়া ধরিতে লাগিল। মনে পড়িয়া গেল, জীবনের রণক্ষেত্রে কাল আবার সংগ্রাম করিতে বাহির হইতে হইবে। ওই আকাশে যদিও চিন্তার রেখা নাই, জ্যোৎস্নার মধ্যে চেষ্টার চাঞ্চল্য নাই, রাত্রি যদিও নিস্তব্ধ শান্ত, বিশ্বপ্রকৃতি ওই অগণ্য নক্ষত্রলোকের চিরকর্মের মধ্যে চিরবিশ্রামে বিলীন— তবু মানুষের আনাগোনা-বোঝাযুঝির অন্ত নাই, সুখে-দুঃখে বাধায়-বিঘ্নে সমস্ত জনসমাজ তরঙ্গিত। এক দিকে অনন্তের ওই নিত্য শান্তি, আর-এক দিকে

সংসারের এই নিত্য সংগ্রাম— দুই একইকালে একসঙ্গে কেমন করিয়া থাকিতে পারে, দুশ্চিন্তার মধ্যেও রমেশের মনে এই প্রশ্নের উদয় হইল। কিছুক্ষণ পূর্বে রমেশ বিশ্বলোকের অন্তঃপুরের মধ্যে প্রেমের যে একটি শাশ্বত সম্পূর্ণ শান্ত মূর্তি দেখিয়াছিল,— সেই প্রেমকেই ক্ষণকাল পরে সংসারের সংঘর্ষে, জীবনের জটিলতায় পদে-পদে ক্ষুব্ধক্ষুণ্ন দেখিতে লাগিল। ইহার মধ্যে কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা মায়া।

১৭

পরদিন সকালের গাড়িতে যোগেন্দ্র পশ্চিম হইতে ফিরিয়া আসিল। আজ শনিবার, কাল রবিবারে হেমনলিনীর বিবাহের কথা। কিন্তু যোগেন্দ্র তাহাদের বাসার দ্বারের কাছে আসিয়া উৎসবের স্বাদগন্ধ কিছুই পাইল না। যোগেন্দ্র মনে করিয়া আসিতেছিল, এতক্ষণে তাহাদের বাসার বারান্দার উপর দেবদারুপাতার মালা ঝোলানো শুরু হইয়াছে— কাছে আসিয়া দেখিল, শ্রীহীন মালিন্যে পাশের বাড়ির সঙ্গে তাহাদের বাড়ির কোনো প্রভেদ নাই।

ভয় হইল, পাছে কাহারো অসুখ-বিসুখ করিয়া থাকে। বাড়িতে প্রবেশ করিয়া দেখিল, চায়ের টেবিলে তাহার জন্য আহারাদি প্রস্তুত রহিয়াছে এবং অন্নদাবাবু অর্ধভুক্ত চায়ের পেয়ালা সম্মুখে রাখিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছেন।

যোগেন্দ্র ঘরে ঢুকিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "হেম কেমন আছে।"

অন্নদাবাবু। ভালো।

যোগেন্দ্র। বিবাহের কী হইল?

অন্নদাবাবু। কাল রবিবারের পরের রবিবারে হইবে।

যোগেন্দ্র। কেন।

অন্নদাবাবু। কেন, তাহা তোমার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করো। রমেশ আমাদের কেবল এইটুকু জানাইয়াছে যে, তাহার বিশেষ প্রয়োজন আছে, এ-রবিবারে বিবাহ বন্ধ রাখিতে হইবে।

যোগেন্দ্র তাহার অক্ষম বাপের উপরে মনে মনে বিরক্ত হইয়া কহিল, "বাবা, আমি না থাকিলে তোমাদের নানান গলদ ঘটে। রমেশের আবার প্রয়োজন কিসের। সে স্বাধীন। তাহার আত্মীয় বলিতে কেহ নাই বলিলেই হয়। যদি তাহার বৈষয়িক বিশেষ কোনো গোলযোগ ঘটিয়া থাকে, সে-কথা খুলিয়া বলিবার কোনো বাধা দেখি না। রমেশকে তুমি এত সহজে ছাড়িয়া দিলে কেন।"

অন্নদাবাবু। আচ্ছা বেশ তো, সে তো এখনো পালায় নাই, তুমিই তাহাকে প্রশ্ন করিয়া দেখো না।

যোগেন্দ্র শুনিয়া তৎক্ষণাৎ এক পেয়ালা গরম চা তাড়াতাড়ি নিঃশেষ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

অন্নদাবাবু কহিলেন, "আহা, যোগেন, এত তাড়াতাড়ি কিসের। তোমার যে খাওয়া হইল না।"

সে-কথা যোগেন্দ্রের কানে পৌঁছিল না। সে রমেশের বাসায় ঢুকিয়া সশব্দ দ্রুতপদে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া গেল। "রমেশ! রমেশ!" রমেশের কোনো সাড়া নাই। ঘরে ঘরে খুঁজিয়া দেখিল, রমেশ শুইবার ঘরে নাই, বসিবার ঘরে নাই। ছাদে নাই, একতলায় নাই। অনেক ডাকাডাকির পর বেহারাটাকে সন্ধান করিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু কোথায়?"

বেহারা কহিল, "বাবু তো ভোরে বাহির হইয়া গেছেন।"

যোগেন্দ্র। কখন আসিবে?

বেহারা জানাইল, বাবু তাঁহার কতক-কতক কাপড়-চোপড় লইয়া চলিয়া গেছেন। বলিয়া গেছেন, ফিরিয়া আসিতে তাঁহার চার-পাঁচ দিন দেরি হইতে পারে। কোথায় গেছেন, তাহা বেহারা জানে না।

যোগেন্দ্র গম্ভীর হইয়া চায়ের টেবিলে ফিরিয়া আসিল। অন্নদাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী হইল।"

যোগেন্দ্র বিরক্ত হইয়া কহিল, "হইবে আর কী, যাহার সঙ্গে আজ বাদে কাল মেয়ের বিবাহ দিবে, তাহার কী কাজ পড়িয়াছে, সে কখন কোথায় থাকে, তাহার খোঁজ-খবর তোমরা কিছুই রাখ না। অথচ তোমার বাড়ির পাশেই তাহার বাসা।"

অন্নদাবাবু কহিলেন, "কেন, কাল রাত্রেও তো রমেশ ওই বাসাতেই ছিল।"

যোগেন্দ্র উত্তেজিত হইয়া কহিল, "তোমরা জানো না সে কোথায় যাইবে, তাহার বেহারা জানে না সে কোথায় গেছে, এ কী রকম লুকোচুরি ব্যাপার চলিতেছে? আমার কাছে এ তো কিছুই ভালো ঠেকিতেছে না। বাবা, তুমি এমন নিশ্চিন্ত আছ কী করিয়া।"

অন্নদাবাবু এই ভর্ৎসনায় হঠাৎ অত্যন্ত চিন্তিত হইবার চেষ্টা করিলেন। গম্ভীর মুখ করিয়া কহিলেন, "তাই তো, এ-সব কী।"

কাণ্ডজ্ঞানহীন রমেশ অনায়াসে কাল রাত্রে অন্নদাবাবুর কাছে বিদায় লইয়া যাইতে পারিত। কিন্তু সে-কথা তাহার মনে উদয়ও হয় নাই। ওই যে সে "বিশেষ প্রয়োজন আছে" বলিয়া রাখিয়াছে, তাহার মধ্যেই তাহার সকল কথা বলা হইয়া গেছে, এইরূপ রমেশের ধারণা। ওই এক কথাতেই আপাতত সকল রকমের ছুটি পাইয়াছে জানিয়া, সে তাহার উপস্থিত কর্তব্যসাধনে বিব্রত হইয়া বেড়াইতেছে।

যোগেন্দ্র। হেমনলিনী কোথায়?

অন্নদাবাবু। সে আজ সকাল-সকাল চা খাইয়া উপরেই গেছে।

যোগেন্দ্র কহিল, "রমেশের এই সমস্ত অদ্ভুত আচরণে বেচারা বোধ হয় অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া আছে— সেইজন্য সে আমার সঙ্গে দেখা হইবার ভয়ে পালাইয়া রহিয়াছে।"

সংকুচিত ও ব্যথিত হেমনলিনীকে আশ্বাস দিবার জন্য যোগেন্দ্র উপরে গেল। হেমনলিনী তাহাদের বড়ো ঘরে চৌকির উপরে চুপ করিয়া একা বসিয়া ছিল। যোগেন্দ্রের পদশব্দ শুনিয়াই সে তাড়াতাড়ি একটা বই টানিয়া লইয়া পড়িবার ভান করিল। যোগেন্দ্র ঘরে আসিতেই বই রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাসিমুখে কহিল, "এই যে দাদা। কখন এলে? তোমাকে তো তেমন বিশেষ ভালো দেখাইতেছে না।"

যোগেন্দ্র চৌকিতে বসিয়া পড়িয়া কহিল, "ভালো দেখাইবার তো কথা নয়। আমি সব কথা শুনিয়াছি হেম। কিন্তু এ-সম্বন্ধে তুমি কোনো চিন্তা করিয়ো না। আমি ছিলাম না বলিয়াই এই রকম গোলমাল ঘটিতে পারিয়াছে। আমি সমস্ত ঠিক করিয়া দিব। আচ্ছা হেম, রমেশ তোমাকে কোনো কারণ বলে নাই?"

হেমনলিনী মুশকিলে পড়িল। রমেশসম্বন্ধে এই সকল সন্দিগ্ধ আলোচনা তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। রমেশ তাহাকে বিবাহদিন পিছাইবার কোনো কারণ বলে নাই, এ-কথা যোগেন্দ্রকে বলিতে তাহার ইচ্ছা নাই, অথচ মিথ্যা বলাও তাহার পক্ষে অসম্ভব। হেমনলিনী কহিল, "তিনি আমাকে কারণ বলিতে প্রস্তুত ছিলেন, আমি শোনা দরকার মনে করি নাই।"

যোগেন্দ্র মনে করিল, "ইহা গুরুতর অভিমানের কথা এবং এরূপ অভিমান সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।" কহিল, "আচ্ছা, তুমি কিছুই ভয় করিয়ো না, 'কারণ' আমি আজই বাহির করিয়া আনিব।"

হেমনলিনী কোলের বইখানার পাতা অনাবশ্যক উল্টাইতে উল্টাইতে কহিল, "দাদা, আমি ভয় কিছুই করি না। 'কারণ' বাহির করিবার জন্য তুমি তাঁহাকে পীড়াপীড়ি কর, এমন আমার ইচ্ছা নয়।"

যোগেন্দ্র ভাবিল, "ইহাও অভিমানের কথা।" কহিল, "আচ্ছা, সে তোমাকে কিছুই ভাবিতে হইবে না।" বলিয়া তখনি চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

হেমনলিনী তখনি চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া কহিল, "না দাদা, এ-কথা লইয়া তুমি তাঁহার সঙ্গে আলোচনা করিতে যাইতে পারিবে না। তোমরা তাঁহাকে যাহাই মনে কর না কেন, আমি তাঁহাকে কিছুমাত্র সন্দেহ করি না।"

তখন যোগেন্দ্রের হঠাৎ মনে হইল, এ তো অভিমানের মতো শুনাইতেছে না। তখন স্নেহমিশ্রিত করুণায় তাহার মনে মনে হাসি পাইল। ভাবিল, "ইহাদের সংসারের জ্ঞান কিছুই নাই। এদিকে পড়াশুনা এত করিয়াছে, পৃথিবীর খোঁজখবরও অনেক রাখে; কিন্তু কোন্‌খানে সন্দেহ করিতে হইবে, সে-অভিজ্ঞতাটুকুও ইহার হয় নাই।" এই নিঃসংশয় নির্ভরের সহিত রমেশের ছদ্মব্যবহারের তুলনা করিয়া যোগেন্দ্র মনে মনে রমেশের উপর আরও চটিয়া উঠিল। 'কারণ' বাহির করিবার প্রতিজ্ঞা তাহার মনে আরও দৃঢ় হইল। যোগেন্দ্র দ্বিতীয়বার চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে হেমনলিনী কাছে গিয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "দাদা, তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে, তাঁহার কাছে এ-সব কথা একেবারে উত্থাপনমাত্র করিবে না।"

যোগেন্দ্র কহিল, "সে দেখা যাইবে।"

হেমনলিনী। না দাদা, দেখা যাইবে না। আমার কাছে কথা

দিয়া যাও। আমি তোমাদের নিশ্চয় বলিতেছি, তোমাদের কোনো চিন্তার বিষয় নাই। একটিবার আমার এই একটি কথা রাখো।

হেমনলিনীর এইরূপ দৃঢ়তা দেখিয়া যোগেন্দ্র ভাবিল, "তবে নিশ্চয় রমেশ হেমের কাছে সকল কথা বলিয়াছে। কিন্তু হেমকে যাহা-তাহা বলিয়া ভুলানো তো শক্ত নয়।" কহিল, "দেখো হেম, অবিশ্বাসের কথা হইতেছে না। কন্যাপক্ষের অভিভাবকদের যাহা কর্তব্য তাহা করিতে হইবে তো। তোমার সঙ্গে তার যদি কিছু বোঝাপড়া হইয়া থাকে, সে তোমরাই জানো, কিন্তু সেই হইলেই তো যথেষ্ট হইল না—আমাদের সঙ্গেও তাহার বোঝাপড়া করিবার আছে। সত্য কথা বলিতে কী হেম, এখন তোমার চেয়ে আমাদেরই সঙ্গে তাহার বোঝাপড়ার সম্পর্ক বেশি—বিবাহ হইয়া গেলে তখন আমাদের বেশি কথা বলিবার থাকিবে না।"

এই বলিয়া যোগেন্দ্র তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। ভালোবাসা যে আড়াল যে আবরণ খোঁজে, সে আর রহিল না। হেমনলিনী ও রমেশের যে-সম্বন্ধ ক্রমে বিশেষভাবে ঘনিষ্ঠ হইয়া দুইজনকে কেবল দুইজনেরই করিয়া দিবে, আজ তাহারই উপরে দশজনের সন্দেহের কঠিন স্পর্শ আসিয়া বারংবার আঘাত করিতেছে। চারিদিকের এইসকল আন্দোলনের অভিঘাতে হেমনলিনী এমনি ব্যথিত হইয়া আছে যে, আত্মীয়বন্ধুদের সহিত সাক্ষাৎমাত্রও তাহাকে কুণ্ঠিত করিয়া তুলিতেছে। যোগেন্দ্র চলিয়া গেলে হেমনলিনী চৌকিতে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

যোগেন্দ্র বাহিরে যাইতেই অক্ষয় আসিয়া কহিল, "এই যে, যোগেন আসিয়াছ! সব কথা শুনিয়াছ তো? এখন তোমার কী মনে হইতেছে?"

যোগেন্দ্র। মনে তো অনেক রকম হইতেছে, সে-সমস্ত অনুমান

লইয়া মিথ্যা বাদানুবাদ করিয়া কী হইবে। এখন কি চায়ের টেবিলে বসিয়া মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম আলোচনার সময়।

অক্ষয়। তুমি তো জানই সূক্ষ্ম আলোচনাটা আমার স্বভাব নয়, তা মনস্তত্ত্বই বল, দর্শনই বল, আর কাব্যই বল। আমি কাজের কথাই বুঝি ভালো— তোমার সঙ্গে সেই কথাই বলিতে আসিয়াছি।

অধীরস্বভাব যোগেন্দ্র কহিল, "আচ্ছা, কাজের কথা হবে। এখন বলিতে পার, রমেশ কোথায় গেছে।"

অক্ষয় কহিল, "পারি।"

যোগেন্দ্র প্রশ্ন করিল, "কোথায়।"

অক্ষয় কহিল, "এখন সে আমি তোমাকে বলিব না—আজ তিনটার সময় একেবারে তোমাকে রমেশের সঙ্গে দেখা করাইয়া দিব।"

যোগেন্দ্র কহিল, "কাণ্ডখানা কী বলো দেখি! তোমরা সবাই যে মূর্তিমান হেঁয়ালি হইয়া উঠিলে। আমি এই ক'দিনমাত্র বেড়াইতে গেছি, সেই সুযোগে পৃথিবীটা এমন ভয়ানক রহস্যময় হইয়া উঠিল! না না অক্ষয়, অমন ঢাকাঢাকি করিলে চলিবে না।"

অক্ষয়। শুনিয়া খুশি হইলাম। ঢাকাঢাকি করি নাই বলিয়া আমার পক্ষে একপ্রকার অচল হইয়া উঠিয়াছে— তোমার বোন তো আমার মুখদেখা বন্ধ করিয়াছেন, তোমার বাবা আমাকে সন্দিগ্ধপ্রকৃতি বলিয়া গালি দেন, আর রমেশবাবুও আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে আনন্দে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠেন না। এখন কেবল তুমিই বাকি আছ। তোমাকে আমি ভয় করি— তুমি সূক্ষ্ম আলোচনার লোক নও, মোটা কাজটাই তোমার সহজে আসে— আমি কাহিল মানুষ, তোমার ঘা আমার সহ্য হইবে না।

যোগেন্দ্র। দেখো অক্ষয়, তোমার ওই-সকল প্যাচালো চাল আমার

ভালো লাগে না। বেশ বুঝিতেছি, একটা কী খবর তোমার বলিবার আছে, সেটাকে আড়াল করিয়া অমন দরবৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছ কেন। সরলভাবে বলিয়া ফেলো, চুকিয়া যাক।

অক্ষয়। আচ্ছা বেশ, তাহা হইলে গোড়া হইতেই বলি— তুমি অনেক কথাই জানো না।

১৮

রমেশ দর্জিপাড়ায় যে-বাসায় ছিল, সে-বাসার মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া যায় নাই, তাহা আর-কাহাকেও ভাড়া দেওয়া সম্বন্ধে রমেশ চিন্তা করিবার অবসর পায় নাই। সে এই কয়েকমাস সংসারের বাহিরে উধাও হইয়া গিয়াছিল, লাভক্ষতিকে বিচারের মধ্যেই আনে নাই।

আজ সে প্রত্যুষে সেই বাসায় গিয়া ঘর-দুয়ার সাফ করাইয়া লইয়াছে, তক্তাপোশের উপর বিছানা পাতাইয়াছে এবং আহারাদিরও বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছে। আজ ইস্কুলের ছুটির পর কমলাকে আনিতে হইবে।

সে এখনো দেরি আছে। ইতিমধ্যে রমেশ তক্তাপোশের উপর চিত হইয়া ভবিষ্যতের কথা ভাবিতে লাগিল। এটোয়া সে কখনো দেখে নাই— কিন্তু পশ্চিমের দৃশ্য কল্পনা করা কঠিন নহে। শহরের প্রান্তে তাহার বাড়ি— তরুশ্রেণীদ্বারা ছায়াখচিত বড়ো রাস্তা তাহার বাগানের ধার দিয়া চলিয়া গেছে— রাস্তার ও-পারে প্রকাণ্ড মাঠ, তাহার মাঝে-মাঝে কূপ, মাঝে-মাঝে পশুপক্ষী তাড়াইবার জন্য মাচা বাঁধা। ক্ষেত্র-সেচনের জন্য গোরু দিয়া জল তোলা হইতেছে, সমস্ত মধ্যাহ্নে তাহার করুণ শব্দ শোনা যায়— রাস্তা দিয়া প্রচুর ধুলা উড়াইয়া মাঝে-মাঝে একাগাড়ি ছুটিয়াছে, তাহার ঝনঝন শব্দে রৌদ্রদগ্ধ আকাশ জাগিয়া

উঠিতেছে। এই সুদূর প্রবাসের প্রখর তাপ, উদাস মধ্যাহ্ন ও শূন্য নির্জনতার মধ্যে সে তাহার রুদ্ধদ্বার বাংলাঘরে সমস্ত দিন হেমনলিনীকে একা কল্পনা করিতে গেলে ক্লেশ অনুভব করিত। তাহার পাশে চির-সখীরূপে কমলাকে দেখিয়া সে আরামবোধ করিল।

রমেশ ঠিক করিয়াছে, এখন সে কমলাকে কিছু বলিবে না। বিবাহের পর হেমনলিনী তাহাকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া সুযোগ বুঝিয়া সকরুণ স্নেহের সহিত ক্রমে ক্রমে তাহাকে তাহার প্রকৃত ইতিহাস জানাইবে,— যত অল্প বেদনা দিয়া সম্ভব, কমলার জীবনের এই জটিল রহস্যজাল ধীরে ধীরে ছাড়াইয়া দিবে। তাহার পরে সেই দূর বিদেশে তাহাদের পরিচিত সমাজের বাহিরে, কোনোপ্রকার আঘাত না পাইয়া কমলা অতি সহজেই তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া আপনার হইয়া যাইবে।

তখন দ্বিপ্রহরে গলি নিস্তব্ধ;—যাহারা আপিসে যাইবার তাহারা আপিসে গেছে, যাহারা না যাইবার তাহারা দিবানিদ্রার আয়োজন করিতেছে। অনতিতপ্ত আশ্বিনের মধ্যাহ্নটি মধুর হইয়া উঠিয়াছে— আগামী ছুটির উল্লাস এখনি যেন আকাশকে আনন্দের আভাস দিয়া মাখাইয়া রাখিয়াছে। রমেশ তাহার নির্জন বাসায় নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে সুখের ছবি উত্তরোত্তর ফলাও করিয়া আঁকিতে লাগিল।

এমন সময়ে খুব একটা ভারি গাড়ির শব্দ শোনা গেল। সে গাড়ি রমেশের বাসার দ্বারের কাছে আসিয়া থামিল। রমেশ বুঝিল, ইস্কুলের গাড়ি কমলাকে পৌঁছাইয়া দিতে আসিতেছে। তাহার বুকের ভিতরটা চঞ্চল হইয়া উঠিল। কমলাকে কিরূপ দেখিবে, তাহার সঙ্গে কী ভাবে কথাবার্তা হইবে, কমলাই বা রমেশকে কী ভাবে গ্রহণ করিবে, হঠাৎ এই চিন্তা তাহাকে আন্দোলিত করিয়া তুলিল।

নিচে তাহার দুইজন চাকর ছিল—প্রথমে তাহারা ধরাধরি করিয়া

কমলার তোরঙ্গ লইয়া আসিয়া বারান্দায় রাখিল— তাহার পশ্চাতে কমলা ঘরের দ্বারের সম্মুখ পর্যন্ত আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, ভিতরে প্রবেশ করিল না।

রমেশ কহিল, "কমলা, ঘরে এসো।"

কমলা একটা সংকোচের আক্রমণ কাটাইয়া লইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। ছুটির সময়ে রমেশ তাহাকে বিদ্যালয়ে ফেলিয়া রাখিতে চাহিয়াছিল, সে কান্নাকাটি করিয়া চলিয়া আসিয়াছে, এই ঘটনায় এবং কয়েক-মাসের বিচ্ছেদে রমেশের সঙ্গে তাহার যেন একটু মনের ছাড়াছাড়ি হইয়া গেছে। তাই কমলা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রমেশের মুখের দিকে না চাহিয়া একটুখানি ঘাড় বাঁকাইয়া খোলা দরজার বাহিরে চাহিয়া রহিল।

রমেশ কমলাকে দেখিবামাত্র বিস্মিত হইয়া উঠিল। যেন তাহাকে আর-একবার নূতন করিয়া দেখিল। এই কয়মাসে তাহার আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটিয়াছে। অনতিপল্লবিতা লতার মতো সে অনেকটা বাড়িয়া উঠিয়াছে। পাড়াগেঁয়ে মেয়েটির অপরিস্ফুট সর্বাঙ্গে প্রচুর স্বাস্থ্যের যে একটি পরিপুষ্টতা ছিল, সে কোথায় গেল? তাহার গোলগাল মুখটি ঝরিয়া লম্বা হইয়া একটি বিশেষত্ব লাভ করিয়াছে, তাহার গালদুটি পূর্বের শ্যামাভ চিক্কণতা ত্যাগ করিয়া কোমল পাণ্ডুবর্ণ হইয়া আসিয়াছে, এখন তাহার গতিবিধি-ভাবভঙ্গিতে কোনোপ্রকার জড়তা নাই। আজ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যখন সে ঋজুদেহে-ঈষৎ-বঙ্কিম-মুখে খোলা জানালার সম্মুখে দাঁড়াইল, তাহার মুখের উপরে শরৎ-মধ্যাহ্নের আলো আসিয়া পড়িল, তাহার মাথায় কাপড় নাই, অগ্রভাগে লালফিতার গ্রন্থিবাঁধা বেণীটি পিঠের উপরে পড়িয়াছে, ফিকে হলদে রঙের মেরিনোর শাড়ি তাহার স্ফুটনোন্মুখ শরীরকে আঁটিয়া বেষ্টন করিয়াছে— তখন রমেশ তাহার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল।

কমলার সৌন্দর্য এই কয়মাসে রমেশের মনে আবছায়ার মতো হইয়া আসিয়াছিল, আজ সেই সৌন্দর্য নবতর বিকাশ লাভ করিয়া হঠাৎ তাহাকে চমক লাগাইয়া দিল। সে যেন ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল না।

রমেশ কহিল, "কমলা বসো।"

কমলা একটা চৌকিতে বসিল। রমেশ কহিল, "ইস্কুলে তোমার পড়াশুনা কেমন চলিতেছে?"

কমলা অত্যন্ত সংক্ষেপে কহিল, "বেশ।"

রমেশ ভাবিতে লাগিল, "এইবার কী বলা যাইবে।" হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িয়া গেল— কহিল, "বোধ হয় অনেকক্ষণ খাও নাই। তোমার খাবার তৈরি আছে। এইখানেই আনিতে বলি?"

কমলা কহিল, "খাইব না, আমি খাইয়া আসিয়াছি।"

রমেশ কহিল, "একটু-কিছু খাইবে না? মিষ্ট না খাও তো ফল আছে— আতা, আপেল, বেদানা—"

কমলা কোনো কথা না বলিয়া ঘাড় নাড়িল।

রমেশ আর-একবার কমলার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। কমলা তখন ঈষৎ মুখ নত করিয়া তাহার ইংরেজিশিক্ষার বহি হইতে ছবি দেখিতেছিল। সুন্দর মুখ সোনার কাঠির মতো নিজের চারিদিকের সুপ্ত সৌন্দর্যকে জাগাইয়া তোলে। শরতের আলোক হঠাৎ যেন প্রাণ পাইল, আশ্বিনের দিন যেন আকার ধারণ করিল। কেন্দ্র যেমন তাহার পরিধিকে নিয়মিত করে— তেমনি এই মেয়েটি আকাশকে, বাতাসকে, আলোককে আপনার চারিদিকে যেন বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়া আনিল—অথচ সে নিজে ইহার কিছুই না জানিয়া চুপ করিয়া বসিয়া তাহার পড়িবার বইয়ের ছবি দেখিতেছিল।

রমেশ তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া একটা থালায় কতকগুলি আপেল, নাসপাতি, বেদানা লইয়া উপস্থিত করিল। কহিল, "কমলা, তুমি তো খাবে না দেখিতেছি, কিন্তু আমার ক্ষুধা পাইয়াছে, আমি তো আর সবুর করিতে পারি না।"

শুনিয়া কমলা একটুখানি হাসিল। এই অকস্মাৎ হাসির আলোকে উভয়ের ভিতরকার কুয়াশা যেন অনেকখানি কাটিয়া গেল।

রমেশ ছুরি লইয়া আপেল কাটিতে লাগিল। কিন্তু কোনোপ্রকার হাতের কাজে রমেশের কিছুমাত্র দক্ষতা নাই। তাহার একদিকে ক্ষুধার আগ্রহ, অন্যদিকে এলোমেলো কাটিবার ভঙ্গি দেখিয়া বালিকার ভারি হাসি পাইল— সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

রমেশ এই হাস্যোচ্ছ্বাসে খুশি হইয়া কহিল, "আমি বুঝি ভালো কাটিতে পারি না, তাই হাসিতেছ। আচ্ছা, তুমি কাটিয়া দাও দেখি, তোমার কিরূপ বিদ্যা।"

কমলা কহিল, "বঁটি হইলে আমি কাটিয়া দিতে পারি, ছুরিতে পারি না।"

রমেশ কহিল, "তুমি মনে করিতেছ, বঁটি এখানে নাই?" চাকরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বঁটি আছে?" সে কহিল, "আছে— রাত্রের আহারের জন্য সমস্ত আনা হইয়াছে।"

রমেশ কহিল, "ভালো করিয়া ধুইয়া একটা বঁটি লইয়া আয়।"

চাকর বঁটি লইয়া আসিল।

কমলা জুতা খুলিয়া বঁটি পাতিয়া নিচে বসিল এবং হাসিমুখে নিপুণহস্তে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ফলের খোসা ছাড়াইয়া চাকলা চাকলা করিয়া কাটিতে লাগিল। রমেশ তাহার সম্মুখে মাটিতে বসিয়া ফলের খণ্ডগুলি থালায় ধরিয়া লইল।

রমেশ কহিল, "তোমাকেও খাইতে হইবে।"

কমলা কহিল, "না।"

রমেশ কহিল, "তবে আমিও খাইব না।"

কমলা রমেশের মুখের উপরে দুই চোখ তুলিয়া কহিল, "আচ্ছা, তুমি আগে খাও, তারপরে আমি খাইব।"

রমেশ কহিল, "দেখিয়ো, শেষকালে ফাঁকি দিয়ো না।"

কমলা গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "না, সত্যি বলিতেছি, ফাঁকি দিব না।"

বালিকার এই সত্যপ্রতিজ্ঞায় আশ্বস্ত হইয়া রমেশ থালা হইতে এক টুকরা ফল লইয়া মুখে পুরিয়া দিল।

হঠাৎ তাহার চিবানো বন্ধ হইয়া গেল। হঠাৎ দেখিল, তাহার সম্মুখেই দ্বারের বাহিরে যোগেন্দ্র এবং অক্ষয় আসিয়া উপস্থিত।

অক্ষয় কহিল, "রমেশবাবু, মাপ করিবেন, আমি ভাবিয়াছিলাম, আপনি এখানে বুঝি একলাই আছেন। যোগেন, খবর না দিয়া হঠাৎ এমন করিয়া আসিয়া পড়াটা ভালো হয় নাই। চলো, আমরা নিচে বসি গিয়া।"

বঁটি ফেলিয়া কমলা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। ঘর হইতে পালাইবার পথেই দুজনে দাঁড়াইয়া ছিল। যোগেন্দ্র একটুখানি সরিয়া পথ ছাড়িয়া দিল, কিন্তু কমলার মুখের উপর হইতে চোখ ফিরাইল না— তাহাকে তীব্রদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া লইল। কমলা সংকুচিত হইয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

১৯

যোগেন্দ্র কহিল, "রমেশ, এই মেয়েটি কে।"

রমেশ কহিল, "আমার একটি আত্মীয়।"

যোগেন্দ্র কহিল, "কী রকমের আত্মীয়? বোধ হয় গুরুজন কেহ হইবেন না, স্নেহের সম্পর্কও বোধ হইল না। তোমার সকল আত্মীয়ের কথাই তো তোমার কাছ হইতে শুনিয়াছি, এ-আত্মীয়ের তো কোনো বিবরণ শুনি নাই।"

অক্ষয় কহিল, "যোগেন, এ তোমার অন্যায়, মানুষের কি এমন কোনো কথা থাকিতে পারে না, যাহা বন্ধুর কাছেও গোপনীয়।"

যোগেন্দ্র। কী রমেশ, অত্যন্ত গোপনীয় নাকি।

রমেশের মুখ লাল হইয়া উঠিল, সে কহিল, "হাঁ, গোপনীয়। এই মেয়েটির সম্বন্ধে আমি তোমাদের সঙ্গে কোনো আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি না"

যোগেন্দ্র। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, আমি তোমার সঙ্গে আলোচনা করিতে বিশেষ ইচ্ছা করি। হেমের সহিত যদি তোমার বিবাহের প্রস্তাব না হইত, তবে কার সঙ্গে তোমার কতটা-দূর আত্মীয়তা গড়াইয়াছে, তাহা লইয়া এত তোলাপাড়া করিবার কোনো প্রয়োজন হইত না— যাহা গোপনীয়, তাহা গোপনেই থাকিত।

রমেশ কহিল, "এইটুকু পর্যন্ত আমি তোমাদিগকে বলিতে পারি, পৃথিবীতে কাহারো সহিত আমার এমন সম্পর্ক নাই, যাহাতে হেমনলিনীর সহিত পবিত্র সম্বন্ধে বদ্ধ হইতে আমার কোনো বাধা থাকিতে পারে।"

যোগেন্দ্র। তোমার হয়তো কিছুতেই বাধা না থাকিতে পারে—

কিন্তু হেমনলিনীর আত্মীয়দের থাকিতে পারে। একটা কথা আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, যার সঙ্গে তোমার যেরূপ আত্মীয়তা থাক্ না কেন, তাহা গোপনে রাখিবার কী কারণ আছে।

রমেশ। সেই কারণটি যদি বলি, তবে গোপনে রাখা আর চলে না। তুমি আমাকে ছেলেবেলা হইতে জান— কোনো কারণ জিজ্ঞাসা না করিয়া শুদ্ধ আমার কথার উপরে তোমাদিগকে বিশ্বাস রাখিতে হইবে।

যোগেন্দ্র। এই মেয়ের নাম কমলা কি না?

রমেশ। হাঁ।

যোগেন্দ্র। ইহাকে তোমার স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিয়াছ কি না?

রমেশ। হাঁ দিয়াছি।

যোগেন্দ্র। তবু তোমার উপরে বিশ্বাস রাখিতে হইবে? তুমি আমাদিগকে জানাইতে চাও, এই মেয়েটি তোমার স্ত্রী নহে; অন্য সকলকে জানাইয়াছ, এই তোমার স্ত্রী— ইহা ঠিক সত্যপরায়ণতার দৃষ্টান্ত নহে।

অক্ষয়। অর্থাৎ বিদ্যালয়ের নীতিবোধে এ-দৃষ্টান্ত ব্যবহার করা চলে না— কিন্তু ভাই যোগেন, সংসারে দুই পক্ষের কাছে দুই রকম কথা বলা হয়তো অবস্থাবিশেষে আবশ্যক হইতে পারে। অন্তত তাহার মধ্যে একটা সত্য হওয়াই সম্ভব। হয়তো রমেশবাবু তোমাদিগকে যেটা বলিতেছেন, সেইটেই সত্য।

রমেশ। আমি তোমাদিগকে কোনো কথাই বলিতেছি না। আমি কেবল এই কথা বলিতেছি, হেমনলিনীর সহিত বিবাহ আমার কর্তব্য-বিরুদ্ধ নহে। কমলাসম্বন্ধে তোমাদের সঙ্গে সকল কথা আলোচনা করিবার গুরুতর বাধা আছে— তোমরা আমাকে সন্দেহ করিলেও সে-অন্যায় আমি কিছুতে করিতে পারিব না। আমার নিজের সুখ-দুঃখ

মান-অপমানের বিষয় হইলে আমি তোমাদের কাছে গোপন করিতাম না, কিন্তু অন্যের প্রতি অন্যায় করিতে পারি না।

যোগেন্দ্র। হেমনলিনীকে সকল কথা বলিয়াছ ?

রমেশ। না। বিবাহের পর তাঁহাকে বলিব, এইরূপ কথা আছে, যদি তিনি ইচ্ছা করেন, এখনো তাঁহাকে বলিতে পারি।

যোগেন্দ্র। আচ্ছা, কমলাকে এ-সম্বন্ধে দুই-একটা প্রশ্ন করিতে পারি ?

রমেশ। না, কোনোমতেই না। আমাকে যদি অপরাধী বলিয়া জ্ঞান কর, তবে আমার সম্বন্ধে যথোচিত বিধান করিতে পার— কিন্তু তোমাদের সম্মুখে প্রশ্নোত্তর করিবার জন্য নির্দোষী কমলাকে দাঁড় করাইতে পারিব না।

যোগেন্দ্র। কাহাকেও প্রশ্নোত্তর করিবার কোনো প্রয়োজন নাই। যাহা জানিবার, তাহা জানিয়াছি। প্রমাণ যথেষ্ট হইয়াছে। এখন তোমাকে আমি স্পষ্টই বলিতেছি, ইহার পরে আমাদের বাড়িতে যদি প্রবেশের চেষ্টা কর, তবে তোমাকে অপমানিত হইতে হইবে।

রমেশ পাংশুবর্ণমুখে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

যোগেন্দ্র কহিল, "আর-একটি কথা আছে— হেমকে তুমি চিঠি লিখিতে পারিবে না— তাহার সঙ্গে প্রকাশ্যে বা গোপনে তোমার সুদূর সম্পর্কও থাকিবে না। যদি চিঠি লেখ, তবে যে-কথা তুমি গোপন রাখিতে চাহিতেছ, সেই কথা আমি সমস্ত প্রমাণের সহিত সর্বসাধারণের কাছে প্রকাশ করিব। এখন যদি কেহ আমাদের জিজ্ঞাসা করে, তোমার সঙ্গে হেমের বিবাহ কেন ভাঙিয়া গেল, আমি বলিব, এ-বিবাহে আমার সম্মতি নাই বলিয়া ভাঙিয়া দিয়াছি, ভিতরকার কথাটা বলিব না। কিন্তু তুমি যদি সাবধান না হও, তবে সমস্ত কথা বাহির হইয়া যাইবে। তুমি

এমন পাষণ্ডের মতো ব্যবহার করিয়াছ, তবু যে আমি আপনাকে দমন করিয়া রাখিয়াছি, সে তোমার উপরে দয়া করিয়া নহে— ইহার মধ্যে আমার বোন হেমের সংস্রব আছে বলিয়াই তুমি এত সহজে নিষ্কৃতি পাইলে। এখন তোমার কাছে আমার এই শেষ বক্তব্য যে, কোনো-কালে হেমের সঙ্গে তোমার যে কোনো পরিচয় ছিল, তোমার কথায়-বার্তায় বা ব্যবহারে তাহার যেন কোনো প্রমাণ না পাওয়া যায়। এ-সম্বন্ধে তোমাকে সত্য করাইয়া লইতে পারিলাম না, কারণ, এত মিথ্যার পরে সত্য তোমার মুখে মানাইবে না। তবে এখনো যদি লজ্জা থাকে, অপমানের ভয় থাকে, তবে আমার এই কথাটা ভ্রমেও অবহেলা করিয়ো না।”

অক্ষয়। আহা যোগেন, আর কেন। রমেশবাবু নিরুত্তর হইয়া আছেন, তবু তোমার মনে একটু দয়া হইতেছে না ? এইবার চলো। রমেশবাবু, কিছু মনে করিবেন না, আমরা এখন আসি।

যোগেন্দ্র-অক্ষয় চলিয়া গেল। রমেশ কাঠের মূর্তির মতো কঠিন হইয়া বসিয়া রহিল। হতবুদ্ধি-ভাবটা কাটিয়া গেলে তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল, বাসা হইতে বাহির হইয়া গিয়া দ্রুতবেগে পদচারণা করিতে করিতে সমস্ত অবস্থাটা একবার ভাবিয়া লয়। কিন্তু তাহার মনে পড়িয়া গেল কমলা আছে, তাহাকে বাসায় একলা ফেলিয়া রাখিয়া যাওয়া যায় না।

রমেশ পাশের ঘরে গিয়া দেখিল, কমলা রাস্তার দিকের জানালার একটা খড়খড়ি খুলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। রমেশের পদশব্দ শুনিয়া সে খড়খড়ি বন্ধ করিয়া মুখ ফিরাইল। রমেশ মেজের উপরে বসিল।

কমলা জিজ্ঞাসা করিল, “উহারা দুজনে কে। আজ সকালে আমাদের ইস্কুলে গিয়াছিল।”

রমেশ সবিস্ময়ে কহিল, "ইস্কুলে গিয়াছিল ?"

কমলা কহিল, "হাঁ। উহারা তোমাকে কী বলিতেছিল।"

রমেশ কহিল, "আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, তুমি আমার কে হও।"

কমলা যদিও শ্বশুরবাড়ির অনুশাসনের অভাবে এখনো লজ্জা করিতে শেখে নাই, তবু আশৈশব-সংস্কারবশে রমেশের এই কথায় তাহার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল।

রমেশ কহিল, "আমি উহাদিগকে উত্তর করিয়াছি, তুমি আমার কেউ হও না।"

কমলা ভাবিল, রমেশ তাহাকে অন্যায় লজ্জা দিয়া উৎপীড়ন করিতেছে। সে মুখ ফিরাইয়া তর্জনস্বরে কহিল, "যাও।"

রমেশ ভাবিতে লাগিল, "কমলার কাছে সকল কথা কেমন করিয়া খুলিয়া বলিব ?"

কমলা হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কহিল, "ওই যা, তোমার ফল কাকে লইয়া যাইতেছে।"— বলিয়া সে তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে গিয়া কাক তাড়াইয়া ফলের থালা লইয়া আসিল।

রমেশের সম্মুখে থালা রাখিয়া কহিল, "তুমি খাইবে না ?"

রমেশের আর আহারের উৎসাহ ছিল না— কিন্তু কমলার এই যত্নটুকু তাহার হৃদয় স্পর্শ করিল। সে কহিল, "কমলা, তুমি খাবে না ?"

কমলা কহিল, "তুমি আগে খাও।"

এইটুকু ব্যাপার, বেশি-কিছু নয়, কিন্তু রমেশের বর্তমান অবস্থায় এই হৃদয়ের কোমল আভাসটুকু তাহার বক্ষের ভিতরকার অশ্রু-উৎসে গিয়া যেন ঘা দিল। রমেশ কোনো কথা না বলিয়া জোর করিয়া ফল খাইতে লাগিল।

খাওয়ার পালা সাঙ্গ হইলে রমেশ কহিল, “কমলা, আজ রাত্রে আমরা দেশে যাইব।”

কমলা চোখ নিচু, মুখ বিষণ্ণ করিয়া কহিল, “সেখানে আমার ভালো লাগে না।”

রমেশ। ইস্কুলে থাকিতে তোমার ভালো লাগে?

কমলা। না, আমাকে ইস্কুলে পাঠাইয়ো না। আমার লজ্জা করে। মেয়েরা আমাকে কেবল তোমার কথা জিজ্ঞাসা করে।

রমেশ। তুমি কী বলো।

কমলা। আমি কিছুই বলিতে পারি না। তাহারা জিজ্ঞাসা করিত, তুমি কেন আমাকে ছুটির সময়ে ইস্কুলে রাখিতে চাহিয়াছ—আমি—

কমলা কথা শেষ করিতে পারিল না। তাহার হৃদয়ের ক্ষতস্থানে আবার ব্যথা বাজিয়া উঠিল।

রমেশ। তুমি কেন বলিলে না, তিনি আমার কেহই হন না।

কমলা রাগ করিয়া রমেশের মুখের দিকে কুটিলকটাক্ষে চাহিল—কহিল, “যাও।”

আবার রমেশ মনে মনে ভাবিতে লাগিল, “কী করা যাইবে?” এদিকে রমেশের বুকের ভিতরে বরাবর একটা চাপা বেদনা কীটের মতো যেন গহ্বর খনন করিয়া বাহির হইয়া আসিবার চেষ্টা করিতেছিল। এতক্ষণে যোগেন্দ্র হেমনলিনীকে কী বলিল, হেমনলিনী কী মনে করিতেছে, প্রকৃত অবস্থা কেমন করিয়া হেমনলিনীকে বুঝাইবে, হেমনলিনীর সহিত চিরকালের জন্য যদি তাহাকে বিচ্ছিন্ন হইতে হয়, তবে জীবন বহন করিবে কী করিয়া— এই সকল জ্বালাময় প্রশ্ন ভিতরে ভিতরে জমা হইয়া উঠিতেছিল, অথচ ভালো করিয়া তাহা আলোচনা করিবার অবসর

রমেশ পাইতেছিল না। রমেশ এটুকু বুঝিয়াছিল যে, কমলার সহিত রমেশের সম্বন্ধ কলিকাতায় তাহার বন্ধু ও শত্রু-মণ্ডলীর মধ্যে তীব্র আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিল। রমেশ যে কমলার স্বামী, এই গোলমালে সেই জনশ্রুতি যথেষ্ট ব্যাপ্ত হইতে থাকিবে। এ-সময়ে রমেশের পক্ষে কমলাকে লইয়া আর একদিনও কলিকাতায় থাকা সংগত হইবে না।

অন্যমনস্ক রমেশের এই চিন্তার মাঝখানে হঠাৎ কমলা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "তুমি কী ভাবিতেছ? তুমি যদি দেশে থাকিতে চাও, আমি সেইখানেই থাকিব।"

বালিকার মুখে এই আত্মসংযমের কথা শুনিয়া রমেশের বুকে আবার ঘা লাগিল— আবার সে ভাবিল, "কী করা যাইবে?" পুনর্বার সে অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতে ভাবিতে নিরুত্তরে কমলার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কমলা মুখ গম্ভীর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, আমি ছুটির সময়ে ইস্কুলে থাকিতে চাহি নাই বলিয়া তুমি রাগ করিয়াছ?—সত্য করিয়া বলো।"

রমেশ কহিল, "সত্য করিয়াই বলিতেছি, তোমার উপরে রাগ করি নাই, আমি নিজের উপরেই রাগ করিয়াছি।"

রমেশ ভাবনার জাল হইতে নিজেকে জোর করিয়া ছাড়াইয়া লইয়া কমলার সহিত আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা কমলা, ইস্কুলে এতদিন কী শিখিলে বলো দেখি।"

কমলা অত্যন্ত উৎসাহের সহিত নিজের শিক্ষার হিসাব দিতে লাগিল। সম্প্রতি পৃথিবীর গোলাকৃতির কথা তাহার অগোচর নাই জানাইয়া যখন সে রমেশকে চমৎকৃত করিয়া দিবার চেষ্টা করিল, রমেশ

গম্ভীরমুখে ভূমণ্ডলের গোলত্বে সন্দেহ প্রকাশ করিল। কহিল, "এ কি কখনো সম্ভব হইতে পারে।"

কমলা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, "বাঃ, আমাদের বইয়ে লেখা আছে—আমরা পড়িয়াছি।"

রমেশ আশ্চর্য জানাইয়া কহিল, "বল কী। বইয়ে লেখা আছে? কতবড়ো বই?"

এই প্রশ্নে কমলা কিছু কুণ্ঠিত হইয়া কহিল, "বেশি বড়ো বই নয়—কিন্তু ছাপার বই। তাহাতে ছবিও দেওয়া আছে।"

এতবড়ো প্রমাণের পর রমেশকে হার মানিতে হইল। তারপরে কমলা শিক্ষার বিবরণ শেষ করিয়া বিদ্যালয়ের ছাত্রী ও শিক্ষকদের কথা, সেখানকার দৈনিক কার্যধারা লইয়া বকিয়া যাইতে লাগিল। রমেশ অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতে ভাবিতে মাঝে মাঝে সাড়া দিয়া গেল। কখনো বা কথার শেষ সূত্র ধরিয়া এক-আধটা প্রশ্নও করিল। একসময়ে কমলা বলিয়া উঠিল, "তুমি আমার কথা কিছুই শুনিতেছ না।"—বলিয়া সে রাগ করিয়া তখনি উঠিয়া পড়িল।

রমেশ ব্যস্ত হইয়া কহিল, "না না কমলা, রাগ করিয়ো না, আমি আজ ভালো নাই।"

ভালো নাই শুনিয়া তখনি কমলা ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "তোমার অসুখ করিয়াছে? কী হইয়াছে?"

রমেশ কহিল, "ঠিক অসুখ নয়— ও কিছুই নয়—আমার মাঝে মাঝে অমন হইয়া থাকে— আবার এখনি চলিয়া যাইবে।"

কমলা রমেশকে শিক্ষার সহিত আমোদ দিবার জন্য কহিল, "আমার ভূগোল-প্রবেশে পৃথিবীর যে ছবি আছে, দেখিবে?"

রমেশ আগ্রহপ্রকাশ করিয়া দেখিতে চাহিল। কমলা তাড়াতাড়ি

তাহার বই আনিয়া রমেশের সম্মুখে খুলিয়া ধরিল। কহিল, "এই যে দুটো গোল দেখিতেছ, ইহা আসলে একটা। গোল জিনিসের দুটো পিঠ কি কখনো একসঙ্গে দেখা যায়।"

রমেশ কিঞ্চিৎ ভাবিবার ভান করিয়া কহিল, "চ্যাপটা জিনিসেরও দেখা যায় না।"

কমলা কহিল, "সেইজন্য এই ছবিতে পৃথিবীর দুই পিঠ আলাদা করিয়া আঁকিয়াছে।

এমনি করিয়া সন্ধ্যাটা কাটিয়া গেল।

২০

অন্নদাবাবু একান্তমনে আশা করিতেছিলেন, যোগেন্দ্র ভালো খবর লইয়া আসিবে, সমস্ত গোলমাল অতি সহজে পরিষ্কার হইয়া যাইবে। যোগেন্দ্র ও অক্ষয় যখন ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল, অন্নদাবাবু ভীতভাবে তাহাদের মুখের দিকে চাহিলেন।

যোগেন্দ্র কহিল, "বাবা, তুমি যে রমেশকে এতদূর পর্যন্ত বাড়াবাড়ি করিতে দিবে, তাহা কে জানিত। এমন জানিলে আমি তোমাদের সঙ্গে তাহার আলাপ করাইয়া দিতাম না।"

অন্নদাবাবু। রমেশের সঙ্গে হেমনলিনীর বিবাহ তোমার অভিপ্রেত, এ-কথা তুমি তো আমাকে অনেকবার বলিয়াছ। বাধা দিবার ইচ্ছা যদি তোমার ছিল, তবে আমাকে—

যোগেন্দ্র। অবশ্য একেবারে বাধা দিবার কথা আমার মনে আসে নাই, কিন্তু তাই বলিয়া—

অন্নদাবাবু। ওই দেখো, ওর মধ্যে "তাই বলিয়া" কোথায় থাকিতে পারে। হয় অগ্রসর হইতে দিবে, নয় বাধা দিবে, এর মাঝখানে আর কী আছে।

যোগেন্দ্র। তাই বলিয়া একেবারে এতটা-দূর অগ্রসর—

অক্ষয় হাসিয়া কহিল, "কতকগুলি জিনিস আছে, যা আপনার ঝোঁকেই অগ্রসর হইয়া পড়ে, তাহাকে আর প্রশ্রয় দিতে হয় না—বাড়িতে বাড়িতে আপনিই বাড়াবাড়িতে গিয়া পৌঁছায়। কিন্তু যা হইয়া গেছে, তা লইয়া তর্ক করিয়া লাভ কী। এখন যা করা কর্তব্য, তাই আলোচনা করো।"

অন্নদাবাবু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রমেশের সঙ্গে তোমাদের দেখা হইয়াছে?"

যোগেন্দ্র। খুব দেখা হইয়াছে—এত দেখা আশা করি নাই। এমন কি, তার স্ত্রীর সঙ্গেও পরিচয় হইয়া গেল।

অন্নদাবাবু নির্বাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় হইল।"

যোগেন্দ্র। রমেশের স্ত্রী।

অন্নদাবাবু। তুমি কী বলিতেছ, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। কোন্ রমেশের স্ত্রী।

যোগেন্দ্র। আমাদের রমেশের। পাঁচ-ছয় মাস আগে যখন সে দেশে গিয়াছিল, তখন সে বিবাহ করিতেই গিয়াছিল।

অন্নদাবাবু। কিন্তু তার পিতার মৃত্যু হইল বলিয়া বিবাহ ঘটিতে পারে নাই।

যোগেন্দ্র। মৃত্যুর পূর্বেই বিবাহ হইয়া গেছে।

অন্নদাবাবু স্তব্ধ হইয়া বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, "তবে তো আমাদের হেমের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইতেই পারে না।"

যোগেন্দ্র। আমরা তো তাই বলিতেছি—

অন্নদাবাবু। তোমরা তো তাই বলিলে এদিকে যে বিবাহের আয়োজন সমস্তই প্রায় ঠিক হইয়া গেছে—এ-রবিবারে হইল না বলিয়া পরের রবিবারে দিন স্থির করিয়া চিঠি বিলি হইয়া গেছে—আবার সেটা বন্ধ করিয়া ফের চিঠি লিখিতে হইবে।

যোগেন্দ্র কহিল, "একেবারে বন্ধ করিবার দরকার কী—কিছু পরিবর্তন করিয়া কাজ চালাইয়া লওয়া যাইতে পারে।"

অন্নদাবাবু আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, "ওর মধ্যে পরিবর্তন কোনখানটায় করিবে।"

যোগেন্দ্র। যেখানে পরিবর্তন করা সম্ভব সেইখানেই করিতে হইবে। রমেশের বদলে আর-কোনো পাত্র স্থির করিয়া আসছে রবিবারেই যেমন করিয়া হউক কর্ম সম্পন্ন করিতে হইবে। নহিলে লোকের কাছে মুখ দেখাইতে পারিব না।

বলিয়া যোগেন্দ্র একবার অক্ষয়ের মুখের দিকে চাহিল। অক্ষয় বিনয়ে মুখ নত করিল।

অন্নদাবাবু। পাত্র এত শীঘ্র পাওয়া যাইবে?

যোগেন্দ্র। সে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

অন্নদাবাবু। কিন্তু হেমকে তো রাজি করাইতে হইবে।

যোগেন্দ্র। রমেশের সমস্ত ব্যাপার শুনিলে সে নিশ্চয় রাজি হইবে।

অন্নদাবাবু। তবে যা তুমি ভালো বিবেচনা হয়, তাই করো। কিন্তু রমেশের বেশ সংগতিও ছিল, আবার উপার্জনের মতো বিদ্যা-বুদ্ধিও

ছিল। এই পরশু আমার সঙ্গে কথা ঠিক হইয়া গেল, সে এটোয়ায় গিয়া প্র্যাকটিস করিবে, এর মধ্যে দেখো দেখি কী কাণ্ড।

যোগেন্দ্র। সেজন্য কেন চিন্তা করিতেছ বাবা, এটোয়াতে রমেশ এখনো প্র্যাকটিস করিতে পারিবে। একবার হেমকে ডাকিয়া আনি, আর তো বেশি সময় নাই।

কিছুক্ষণ পরে যোগেন্দ্র হেমনলিনীকে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। অক্ষয় ঘরের এক কোণে বইয়ের আলমারির আড়ালে বসিয়া রহিল।

যোগেন্দ্র কহিল, "হেম, বসো, তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে।"

হেমনলিনী স্তব্ধ হইয়া চৌকিতে বসিল। সে জানিত, তাহার একটা পরীক্ষা আসিতেছে।

যোগেন্দ্র ভূমিকাচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিল, "রমেশের ব্যবহারে সন্দেহের কারণ তুমি কিছুই দেখিতে পাও না?"

হেমনলিনী কোনো কথা না বলিয়া কেবল ঘাড় নাড়িল।

যোগেন্দ্র। সে যে বিবাহের দিন এক সপ্তাহ পিছাইয়া দিল, তাহার এমন কী কারণ থাকিতে পারে, যাহা আমাদের কারো কাছে বলা চলে না।

হেমনলিনী চোখ নিচু করিয়া কহিল, "কারণ অবশ্যই কিছু আছে।"

যোগেন্দ্র। সে তো ঠিক কথা। কারণ তো আছেই— কিন্তু সে কি সন্দেহজনক না।

হেমনলিনী আবার নীরবে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, "না।"

তাহাদের সকলের চেয়ে রমেশের উপরেই এমন অসন্দিগ্ধ বিশ্বাসে যোগেন্দ্র রাগ করিল। সাবধানে ভূমিকা করিয়া কথা পাড়া আর চলিল না।

যোগেন্দ্র কঠিনভাবে বলিতে লাগিল, "তোমার তো মনে আছে, রমেশ মাস-ছয়েক আগে তাহার বাপের সঙ্গে দেশে চলিয়া গিয়াছিল। তাহার পরে অনেকদিন তাহার কোনো চিঠিপত্র না পাইয়া আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিলাম। ইহাও তুমি জান যে, যে-রমেশ দুইবেলা আমাদের এখানে আসিত, যে বরাবর আমাদের পাশের বাড়িতে বাসা লইয়া ছিল, সে কলিকাতায় আসিয়া আমাদের সঙ্গে একবারও দেখাও করিল না, অন্য বাসায় গিয়া গা-ঢাকা দিয়া রহিল— ইহা সত্ত্বেও তোমরা সকলে পূর্ব্বের মতো বিশ্বাসেই তাহাকে ঘরে ডাকিয়া আনিলে? আমি থাকিলে এমন কি কখনো ঘটিতে পারিত।"

হেমনলিনী চুপ করিয়া রহিল।

যোগেন্দ্র। রমেশের এইরূপ ব্যবহারের কোনো অর্থ তোমরা খুঁজিয়া পাইয়াছ? এ-সম্বন্ধে একটা প্রশ্নও কি তোমাদের মনে উদয় হয় নাই। রমেশের 'পরে এত গভীর বিশ্বাস?

হেমনলিনী নিরুত্তর।

যোগেন্দ্র। আচ্ছা বেশ কথা— তোমরা সরলস্বভাব, কাহাকেও সন্দেহ কর না—আশা করি, আমার উপরেও তোমার কতকটা বিশ্বাস আছে। আমি নিজে ইস্কুলে গিয়া খবর লইয়াছি, রমেশ তাহার স্ত্রী কমলাকে সেখানে বোর্ডার রাখিয়া পড়াইতেছিল। ছুটির সময়েও তাহাকে সেখানে রাখিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিল। হঠাৎ দুই-তিন দিন হইল ইস্কুলের কর্ত্রীর নিকট হইতে রমেশ চিঠি পাইয়াছে যে, ছুটির সময়ে কমলাকে ইস্কুলে রাখা হইবে না। আজ তাহাদের ছুটি হইয়াছে— কমলাকে ইস্কুলের গাড়ি দর্জিপাড়ায় তাহাদের সাবেক বাসায় পৌঁছাইয়া দিয়াছে। সেই বাসায় আমি নিজে গিয়াছি। গিয়া দেখিলাম, কমলা বঁটিতে আপেলের খোসা ছাড়াইয়া কাটিয়া দিতেছে, রমেশ তাহার সুমুখে

মাটিতে বসিয়া এক-এক টুকরা লইয়া মুখে পুরিতেছে। রমেশকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ব্যাপারখানা কী।' রমেশ বলিল, 'সে এখন আমাদের কাছে কিছুই বলিবে না।' যদি রমেশ একটা কথাও বলিত যে, কমলা তাহার স্ত্রী নয়, তাহলেও না হয়, সেই কথাটুকুর উপর নির্ভর করিয়া কোনোমতে সন্দেহকে শান্ত করিয়া রাখিবার চেষ্টা করা যাইত। কিন্তু সে হাঁ-না কিছুই বলিতে চায় না। এখন, ইহার পরেও কি রমেশের উপর বিশ্বাস রাখিতে চাও।

প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষায় যোগেন্দ্র হেমনলিনীর মুখের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল, তাহার মুখ অস্বাভাবিক বিবর্ণ হইয়া গেছে, এবং তাহার যতটা জোর আছে, দুই হাতে চৌকির হাতা চাপিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। মুহূর্তকাল পরেই সম্মুখের দিকে ঝুকিয়া পড়িয়া মূর্ছিত হইয়া চৌকি হইতে সে নিচে পড়িয়া গেল।

অন্নদাবাবু ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি ভূলুণ্ঠিতা হেমনলিনীর মাথা দুই হাতে বুকের কাছে তুলিয়া লইয়া কহিলেন, "মা কী হইল মা! ওদের কথা তুমি কিছুই বিশ্বাস করিয়ো না,— সব মিথ্যা!"

যোগেন্দ্র তাহার পিতাকে সরাইয়া তাড়াতাড়ি হেমনলিনীকে একটা সোফার উপর তুলিল, নিকটে কুঁজায় জল ছিল, সেই জল লইয়া তাহার মুখ-চোখে বারংবার ছিটাইয়া দিল, এবং অক্ষয় একখানা হাতপাখা লইয়া তাহাকে বেগে বাতাস করিতে লাগিল।

হেমনলিনী অনতিকাল পরে চোখ খুলিয়াই চমকিয়া উঠিল— অন্নদা-বাবুর দিকে চাহিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "বাবা, বাবা, অক্ষয়বাবুকে এখান হইতে সরিয়া যাইতে বলো।"

অক্ষয় পাখা রাখিয়া ঘরের বাহিরে দরজার আড়ালে গিয়া দাঁড়াইল। অন্নদাবাবু সোফার উপরে হেমনলিনীর পাশে বসিয়া তাহার মুখে-গায়ে

হাত বুলাইতে লাগিলেন— এবং গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কেবল একবার বলিলেন, “মা !”

দেখিতে দেখিতে হেমনলিনীর দুই চক্ষু দিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, তাহার বুক ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিল, পিতার জানুর উপর বুক চাপিয়া ধরিয়া তাহার অসহ্য রোদনের বেগ সংবরণ করিতে চেষ্টা করিল। অন্নদাবাবু অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, “মা, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো মা। রমেশকে আমি খুব জানি— সে কখনই অবিশ্বাসী নয়, যোগেন নিশ্চয়ই ভুল করিয়াছে।”

যোগেন্দ্র আর থাকিতে পারিল না, কহিল, “বাবা, মিথ্যা আশ্বাস দিয়ো না। এখনকার মতো কষ্ট বাঁচাইতে গিয়া উহাকে দ্বিগুণ কষ্টে ফেলা হইবে। বাবা, হেমকে এখন কিছুক্ষণ ভাবিবার সময় দাও।”

হেমনলিনী তখন পিতার জানু ছাড়িয়া উঠিয়া বসিল, এবং যোগেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, “আমার যাহা ভাবিবার সব ভাবিয়াছি। যতক্ষণ তাঁহার নিজের মুখ হইতে না শুনিব, ততক্ষণ আমি কোনোমতেই বিশ্বাস করিব না, ইহা নিশ্চয় জানিয়ো।”

এই কথা বলিয়া সে উঠিয়া পড়িল। অন্নদাবাবু ব্যস্ত হইয়া তাহাকে ধরিলেন, কহিলেন, “পড়িয়া যাইবে।”

হেমনলিনী অন্নদাবাবুর হাত ধরিয়া তাহার শোবার ঘরে গেল। বিছানায় শুইয়া কহিল, “বাবা, আমাকে একটুখানি একলা রাখিয়া যাও, আমি ঘুমাইব।”

অন্নদাবাবু কহিলেন, “হরির মাকে ডাকিয়া দিব ? বাতাস করিবে ?”

হেমনলিনী কহিল, “বাতাসের দরকার নাই বাবা।”

অন্নদাবাবু পাশের ঘরে গিয়া বসিলেন। এই কন্যাটিকে ছয় মাসের শিশু অবস্থায় রাখিয়া ইহার মা মারা যায়, সেই হেমের মার কথা তিনি

ভাবিতে লাগিলেন। সেই সেবা, সেই ধৈর্য, সে চিরপ্রসন্নতা মনে পড়িল। সেই গৃহলক্ষ্মীরই প্রতিমার মতো যে মেয়েটি এতদিন ধরিয়া তাঁহার কোলের উপর বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার অনিষ্ট-আশঙ্কায় তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। পাশের ঘরে বসিয়া বসিয়া তিনি মনে মনে তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "মা, তোমার সকল বিঘ্ন দূর হউক, চিরদিন তুমি সুখে থাকো,—তোমাকে সুখী দেখিয়া, সুস্থ দেখিয়া, যাহাকে ভালোবাস, তাহার ঘরের মধ্যে লক্ষ্মীর মতো প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া আমি যেন তোমার মার কাছে যাইতে পারি।" এই বলিয়া জামার প্রান্তে আর্দ্র চক্ষু মুছিলেন।

মেয়েদের বুদ্ধির প্রতি যোগেন্দ্রের পূর্ব হইতেই যথেষ্ট অবজ্ঞা ছিল, আজ তাহা আরও দৃঢ় হইল। ইহারা প্রত্যক্ষ প্রমাণও বিশ্বাস করে না, ইহাদিগকে লইয়া কী করা যাইবে। দুইয়ে দুইয়ে যে চার হইবেই, তাহাতে মানুষের সুখই হউক আর দুঃখই হউক, তাহা ইহারা স্থলবিশেষে অনায়াসেই অস্বীকার করিতে পারে। যুক্তি যদি কালোকে কালোই বলে, আর ইহাদের ভালোবাসা তাহাকে বলে সাদা, তবে যুক্তি-বেচারার উপরে ইহারা ভারি খাপা হইয়া উঠিবে। ইহাদিগকে লইয়া যে কী করিয়া সংসার চলে, তাহা যোগেন্দ্র কিছুতেই ভাবিয়া পাইল না।

যোগেন্দ্র ডাকিল, "অক্ষয়।"

অক্ষয় ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করিল। যোগেন্দ্র কহিল, "সব তো শুনিয়াছ, এখন ইহার উপায় কী।"

অক্ষয় কহিল, "আমাকে এ-সব কথার মধ্যে কেন মিছামিছি টান ভাই। আমি এতদিন কোনো কথাই বলি নাই, তুমি আসিয়াই আমাকে এই মুশকিলে ফেলিয়াছ।"

যোগেন্দ্র। আচ্ছা, সে-সব নালিশের কথা পরে হইবে। এখন

হেমনলিনীর কাছে রমেশকে নিজের মুখে সকল কথা কবুল না করাইলে উপায় দেখি না।

অক্ষয়। পাগল হইয়াছ? মানুষ নিজের মুখে—

যোগেন্দ্র। কিংবা যদি একটা চিঠি লেখে, তাহা হইলে আরও ভালো হয়। তোমাকে এই ভার লইতে হইবে। কিন্তু আর দেরি করিলে চলিবে না।

অক্ষয় কহিল, "দেখি, কতদূর কী করিতে পারি।"

২১

রাত্রি নয়টার সময় রমেশ কমলাকে লইয়া শেয়ালদহ-স্টেশনে যাত্রা করিল। যাইবার সময় একটু ঘুরপথ দিয়া গেল। গাড়োয়ানকে অনাবশ্যক গোটাকতক গলি ঘুরাইয়া লইল। কলুটোলায় একটা বাড়ির কাছে আসিয়া আগ্রহসহকারে মুখ বাড়াইয়া দেখিল। পরিচিত বাড়ির তো কোনো পরিবর্তন হয় নাই।

রমেশ এমন একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল যে, নিদ্রাবিষ্ট কমলা চকিত হইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কী হইয়াছে।"

রমেশ উত্তর করিল, "কিছুই না।" আর কিছুই বলিল না—গাড়ির অন্ধকারে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে গাড়ির কোণে মাথা রাখিয়া কমলা আবার ঘুমাইয়া পড়িল। ক্ষণকালের জন্য কমলার অস্তিত্বকে রমেশের যেন অসহ্য বোধ হইল।

গাড়ি যথাসময়ে স্টেশনে পৌঁছিল। একটি সেকেণ্ড-ক্লাস গাড়ি পূর্ব হইতেই রিজার্ভ করা ছিল— রমেশ ও কমলা তাহাতে উঠিল।

একদিকের বেঞ্চিতে কমলার জন্য বিছানা পাতিয়া গাড়ির বাতির নিচে পর্দা টানিয়া অন্ধকার করিয়া দিয়া রমেশ কমলাকে কহিল, "অনেকক্ষণ তোমার শোবার সময় হইয়া গেছে, এইখানে তুমি ঘুমাও।"

কমলা কহিল, "গাড়ি ছাড়িলে আমি ঘুমাইব, ততক্ষণ আমি এই জানালার ধারে বসিয়া একটু দেখিব ?"

রমেশ রাজি হইল। কমলা মাথায় কাপড় টানিয়া প্ল্যাটফর্মের দিকের আসনপ্রান্তে বসিয়া লোকজনের আনাগোনা দেখিতে লাগিল। রমেশ মাঝের আসনে বসিয়া অন্যমনস্কভাবে চাহিয়া রহিল। গাড়ি যখন সবে ছাড়িয়াছে, এমন সময় রমেশ চমকিয়া উঠিল, হঠাৎ মনে হইল, তাহার একজন চেনা লোক গাড়ির অভিমুখে ছুটিয়াছে।

পরক্ষণেই কমলা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। রমেশ জানলা হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিল—রেলওয়ে কর্মচারীর বাধা কাটাইয়া একজন লোক কোনোক্রমে চলন্ত গাড়িতে উঠিয়াছে এবং টানাটানিতে তাহার চাদর কর্মচারীর হাতেই রহিয়া গেছে। চাদর লইবার জন্য সে-ব্যক্তি যখন জানলা হইতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া হাত বাড়াইল, তখন রমেশ স্পষ্ট চিনিতে পারিল, সে আর কেহ নয়, অক্ষয়।

এই চাদর কাড়াকাড়ির দৃশ্যে অনেকক্ষণ পর্যন্ত কমলার হাসি থামিতে চাহিল না।

রমেশ কহিল, "সাড়ে দশটা বাজিয়া গেছে— গাড়ি ছাড়িয়াছে, এইবার তুমি ঘুমাও।"

বালিকা বিছানায় শুইয়া যতক্ষণ না ঘুম আসিল, মাঝে মাঝে খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কিন্তু এই ব্যাপারে রমেশের বিশেষ কৌতুকবোধ হইল না।

রমেশ জানিত, কোনো পল্লীগ্রামের সহিত অক্ষয়ের কোনো সম্বন্ধ

ছিল না—সে পুরুষানুক্রমে কলিকাতাবাসী—আজ রাত্রে এমন উর্ধ্বশ্বাসে সে কলিকাতা ছাড়িয়া কোথায় যাইতেছে? রমেশ নিশ্চয় বুঝিল, অক্ষয় তাহারই অনুসরণে চলিয়াছে।

অক্ষয় যদি তাহাদের গ্রামে গিয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করে এবং সেখানে রমেশের স্বপক্ষবিপক্ষমণ্ডলীর মধ্যে এই কথা লইয়া একটা ঘাঁটাঘাঁটি হইতে থাকে, তবে সমস্ত ব্যাপারটা কিরূপ জঘন্য হইয়া উঠিবে, তাহাই কল্পনা করিয়া রমেশের হৃদয় অশান্ত হইয়া উঠিল। তাঁহাদের পাড়ায় কে কী বলিবে, কিরূপ ঘোঁট চলিবে, তাহা রমেশ যেন প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে লাগিল। কলিকাতার মতো শহরে সকল অবস্থাতেই অন্তরাল খুঁজিয়া পাওয়া যায়—কিন্তু ক্ষুদ্র পল্লীর গভীরতা কম বলিয়াই অল্প আঘাতেই তাহার আন্দোলনের ঢেউ উত্তাল হইয়া উঠে। সেই কথা যতই চিন্তা করিতে লাগিল, রমেশের মন ততই সংকুচিত হইতে লাগিল।

বারাকপুরে যখন গাড়ি থামিল, রমেশ মুখ বাড়াইয়া দেখিতে লাগিল, অক্ষয় নামিল না। নৈহাটিতে অনেক লোক উঠানামা করিতে লাগিল, তাহার মধ্যে অক্ষয়কে দেখা গেল না। একবার বৃথা আশায় বগুলা-স্টেশনেও রমেশ ব্যগ্র হইয়া মুখ বাড়াইল—অবরোহীদের মধ্যে অক্ষয়ের চিহ্ন নাই। তাহার পরের আর কোনো স্টেশনে অক্ষয়ের নামিবার কোনো সম্ভাবনা সে কল্পনা করিতে পারিল না।

অনেক রাত্রে শ্রান্ত হইয়া রমেশ ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন প্রাতে গোয়ালন্দে গাড়ি পৌঁছিলে রমেশ দেখিল, অক্ষয় মাথায় মুখে চাদর জড়াইয়া একটা হাতব্যাগ লইয়া তাড়াতাড়ি স্টীমারের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে।

যে-স্টীমারে রমেশের উঠিবার কথা, সে-স্টীমার ছাড়িবার এখনো বিলম্ব

আছে। কিন্তু অন্য ঘাটে আর-একটা স্টীমার গমনোন্মুখ অবস্থায় ঘনঘন বাঁশি বাজাইতেছে। রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, "এ স্টীমার কোথায় যাইবে।" উত্তর পাইল, "পশ্চিমে।"

"কতদূর পর্যন্ত যাইবে?"

"জল না কমিলে কাশী পর্যন্ত যায়।"

শুনিয়া রমেশ তৎক্ষণাৎ সেই স্টীমারে উঠিয়া কমলাকে একটা কামরায় বসাইয়া আসিল— এবং তাড়াতাড়ি কিছু দুধ, চাল-ডাল এবং এক ছড়া কলা কিনিয়া লইল।

এদিকে অক্ষয় অন্য স্টীমারে সকল আরোহীর আগে উঠিয়া মুড়িসুড়ি দিয়া এমন একটা জায়গায় দাঁড়াইয়া রহিল, যেখান হইতে অন্যান্য যাত্রীদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা যায়। যাত্রিগণের বিশেষ তাড়া ছিল না। জাহাজ ছাড়িবার দেরি আছে— তাহারা এই অবকাশে মুখহাত ধুইয়া, স্নান করিয়া, কেহ কেহ বা তীরে রাঁধাবাড়া করিয়া খাইয়া লইতে লাগিল। অক্ষয়ের কাছে গোয়ালন্দ পরিচিত নহে। সে মনে করিল, নিকটে কোথাও হোটেল বা কিছু আছে, সেইখানে রমেশ কমলাকে খাওয়াইয়া লইতেছে।

অবশেষে স্টীমারে বাঁশি দিতে লাগিল। তখনো রমেশের দেখা নাই। কম্পমান তক্তার উপর দিয়া যাত্রীর দল জাহাজে উঠিতে আরম্ভ করিল। ঘনঘন বাঁশির ফুৎকারে লোকের তাড়া ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু আগত ও আগন্তুকদের মধ্যে রমেশের কোনো চিহ্ন নাই। যখন আরোহীর সংখ্যা শেষ হইয়া আসিল—তক্তা টানিয়া লইল এবং সারেং নোঙর তুলিবার হুকুম করিল, তখন অক্ষয় ব্যস্ত হইয়া কহিল, "আমি নামিয়া যাইব"— কিন্তু খালাসিরা তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না। ডাঙা দূরে ছিল না, অক্ষয় স্টীমার হইতে লাফ দিয়া পড়িল।

তীরে উঠিয়া রমেশের কোনো খবর পাওয়া গেল না। অল্পক্ষণ হইল, গোয়ালন্দ হইতে সকালবেলাকার প্যাসেঞ্জার-ট্রেন কলিকাতা-অভিমুখে চলিয়া গেছে। অক্ষয় মনে মনে ভাবিল, কাল রাত্রে গাড়িতে উঠিবার সময়কার টানাটানিতে নিশ্চয় সে রমেশের দৃষ্টিপথে পড়িয়াছে এবং রমেশ তাহার কোনো বিরুদ্ধ অভিসন্ধি অনুমান করিয়া দেশে না গিয়া আবার সকালের গাড়িতেই কলিকাতায় ফিরিয়া গেছে। কলিকাতায় যদি কোনো লোক লুকাইবার চেষ্টা করে, তবে তো তাহাকে বাহির করাই কঠিন হইবে।

২২

অক্ষয় সমস্ত দিন গোয়ালন্দে ছটফট করিয়া কাটাইয়া সন্ধ্যার ডাক-গাড়িতে উঠিয়া পড়িল। পরদিন ভোরে কলিকাতায় পৌঁছিয়া প্রথমেই সে রমেশের দর্জিপাড়ার বাসায় আসিয়া দেখিল, তাহার দ্বার বন্ধ, খবর লইয়া জানিল, সেখানে কেহই আসে নাই।

কলুটোলায় আসিয়া দেখিল, রমেশের বাসা শূন্য। অন্নদাবাবুর বাসায় আসিয়া যোগেন্দ্রকে কহিল, "পালাইয়াছে— ধরিতে পারিলাম না।"

যোগেন্দ্র কহিল, "সে কী কথা।"

অক্ষয় তাহার ভ্রমণবৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া বলিল।

অক্ষয়কে দেখিতে পাইয়া রমেশ কমলাকে সুদ্ধ লইয়া পালাইয়াছে, এই খবরে রমেশের বিরুদ্ধে যোগেন্দ্রের সমস্ত সন্দেহ নিশ্চিত বিশ্বাসে পরিণত হইল।

যোগেন্দ্র কহিল, "কিন্তু অক্ষয়, এ-সমস্ত যুক্তি কোনো কাজেই লাগিবে না। শুধু হেমনলিনী কেন, বাবাসুদ্ধ ওই এক বুলি ধরিয়াছেন—

তিনি বলেন, রমেশের নিজের মুখে শেষ কথা না শুনিয়া তিনি রমেশকে অবিশ্বাস করিতে পারিবেন না। এমন কি, রমেশ আজও আসিয়া যদি বলে, 'আমি এখন কিছুই বলিব না', তবু নিশ্চয় বাবা তাহার সঙ্গে হেমের বিবাহ দিতে কুণ্ঠিত হন না। ইহাদের লইয়া আমি এমনি মুশকিলে পড়িয়াছি। বাবা হেমনলিনীর কিছুমাত্র কষ্ট সহ্য করিতে পারেন না—হেম যদি আজ আবদার করিয়া বসে, 'রমেশের অন্য স্ত্রী থাক্‌, আমি তাহাকেই বিবাহ করিব', তবে বাবা বোধ হয় তাহাতেই রাজি হন। যেমন করিয়া হউক, এবং যত শীঘ্র হউক, রমেশকে দিয়া কবুল করাইতেই হইবে। তোমার হতাশ হইলে চলিবে না। আমিই এ-কাজে লাগিতে পারিতাম, কিন্তু কোনোপ্রকার ফন্দি আমার মাথায় আসে না—আমি হয়তো রমেশের সঙ্গে একটা মারামারি বাধাইয়া দিব। এখনও বুঝি তোমার মুখ ধোওয়া, চা খাওয়া হয় নাই।"

অক্ষয় মুখ ধুইয়া চা খাইতে খাইতে ভাবিতে লাগিল। এমন সময়ে অন্নদাবাবু হেমনলিনীর হাত ধরিয়া চা খাইবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অক্ষয়কে দেখিবামাত্র হেমনলিনী ফিরিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

যোগেন্দ্র রাগ করিয়া কহিল, "হেমের এ ভারি অন্যায়। বাবা, তুমি উহার এই সকল অভদ্রতায় প্রশ্রয় দিয়ো না। উহাকে জোর করিয়া এখানে আনা উচিত। হেম, হেম!"

হেমনলিনী তখন উপরে চলিয়া গেছে। অক্ষয় কহিল, "যোগেন, তুমি আমার কেস আরও খারাপ করিয়া দিবে দেখিতেছি। উহার কাছে আমার সম্বন্ধে কোনো কথাটি কহিয়ো না। সময়ে ইহার প্রতিকার হইবে, জবরদস্তি করিতে গেল সব মাটি হইয়া যাইবে।"

এই বলিয়া অক্ষয় চা খাইয়া চলিয়া গেল। অক্ষয়ের ধৈর্যের অভাব

ছিল না। যখন সমস্ত লক্ষণ তাহার প্রতিকূলে, তখনো সে লাগিয়া থাকিতে জানে। তাহার ভাবেরও কোনো বিকার হয় না। অভিমান করিয়া সে মুখ গম্ভীর করে না বা দূরে চলিয়া যায় না। অনাদর-অবমাননায় সে অবিচলিত থাকে। লোকটা টেকসই। তাহার প্রতি যাহার ব্যবহার যেমনি হউক, সে টিঁকিয়া থাকে।

অক্ষয় চলিয়া গেলে আবার অন্নদাবাবু হেমনলিনীকে ধরিয়া চায়ের টেবিলে উপস্থিত করিলেন। আজ তাহার কপোল পাণ্ডুবর্ণ— তাহার চোখের নিচে কালি পড়িয়া গেছে। ঘরে ঢুকিয়া সে চোখ নিচু করিল, যোগেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিতে পারিল না। সে জানিত, যোগেন্দ্র তাহার ও রমেশের উপর রাগ করিয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধে কঠিন বিচার করিতেছে। এইজন্য যোগেন্দ্রের সঙ্গে মুখোমুখি-চোখোচোখি হওয়া তাহার পক্ষে দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে।

ভালোবাসায় যদিও হেমনলিনীর বিশ্বাসকে আগলাইয়া রাখিয়াছিল, তবুও যুক্তিকে একেবারেই ঠেকাইয়া রাখা চলে না। যোগেন্দ্রের সম্মুখে হেমনলিনী কাল আপনার বিশ্বাসের দৃঢ়তা দেখাইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু রাত্রের অন্ধকারে শয়নঘরের মধ্যে একলা সেই বল সম্পূর্ণ থাকে না। বস্তুতই প্রথম হইতে রমেশের ব্যবহারের কোনো অর্থ পাওয়া যায় না। সন্দেহের কারণগুলিকে হেমনলিনী যত প্রাণপণ বলে তাহার বিশ্বাসের দুর্গের মধ্যে ঢুকিতে দেয় না—তাহারা বাহিরে দাঁড়াইয়া ততই সবলে আঘাত করিতে থাকে। সাংঘাতিক আঘাত হইতে মা যেমন ছেলেকে বুকের মধ্যে দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া রক্ষা করে, রমেশের প্রতি বিশ্বাসকে হেমনলিনী সমস্ত প্রমাণের বিরুদ্ধে তেমনি জোর করিয়া হৃদয়ে আঁকড়িয়া রাখিল। কিন্তু হায়, জোর কি সকল সময় সমান থাকে।

হেমনলিনীর পাশের ঘরেই রাত্রে অন্নদাবাবু শুইয়াছিলেন। হেম

যে বিছানায় এপাশ-ওপাশ করিতেছিল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন। এক-একবার তাহার ঘরে গিয়া তাহাকে বলিতেছিলেন, "মা, তোমার ঘুম হইতেছে না?" হেমনলিনী উত্তর দিতেছিল, "বাবা, তুমি কেন জাগিয়া আছ। আমার ঘুম আসিতেছে— আমি এখনি ঘুমাইয়া পড়িব।

পরের দিন ভোরে উঠিয়া হেমনলিনী ছাদের উপর বেড়াইতেছিল। রমেশের বাসার একটি দরজা, একটি জানলাও খোলা নাই।

সূর্য ক্রমে পূর্বদিকের সৌধশিখরমালার উপরে উঠিয়া পড়িল। হেমনলিনীর কাছে আজিকার এই নূতন-অভ্যুদিত দিনটি এমনি শুষ্ক শূন্য, এমনি আশাহীন আনন্দহীন ঠেকিল যে, সে সেই ছাদের এক কোণে বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিল। আজ সমস্ত দিন কেহই আসিবে না, চায়ের সময় কাহাকেও আশা করিবার নাই, পাশের বাড়িতে কেহ একজন আছে, এই কল্পনা করিবার সুখটুকু পর্যন্ত ঘুচিয়া গেছে।

"হেম! হেম!"

হেমনলিনী তাড়াতাড়ি উঠিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিয়া সাড়া দিল, "কী বাবা।"

অন্নদাবাবু ছাদে উঠিয়া আসিয়া হেমনলিনীর পিঠে হাত বুলাইয়া কহিলেন, "আমার আজ উঠিতে দেরি হইয়া গেছে।"

অন্নদাবাবু উৎকণ্ঠায় রাত্রে ঘুমাইতে পারেন নাই— ভোরের দিকে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। আলো চোখে লাগিতেই উঠিয়া পড়িয়া তাড়াতাড়ি মুখ ধুইয়া হেমনলিনীর খবর লইতে গেলেন। দেখিলেন, ঘরে কেহ নাই। সকালে তাহাকে একেলা বেড়াইতে দেখিয়া তাঁহার বুকের মধ্যে আঘাত লাগিল। কহিলেন, "চলো মা, চা খাইবে চলো।"

চায়ের টেবিলে যোগেন্দ্রের সম্মুখে বসিয়া চা খাইবার ইচ্ছা হেমনলিনীর ছিল না। কিন্তু সে জানিত, কোনোরূপ নিয়মের অন্যথা তাহার বাপকে পীড়া দেয়। তা ছাড়া, প্রত্যহ সে নিজের হাতে তাহার বাপের পেয়ালায় চা ঢালিয়া দেয়, এই সেবাটুকু হইতে সে নিজেকে বঞ্চিত করিতে চাহিল না।

নিচে গিয়া ঘরে পৌঁছিবার পূর্বে যখন সে বাহির হইতে শুনিল, যোগেন্দ্র কাহার সঙ্গে কথা কহিতেছে— তখন তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল— হঠাৎ মনে হইল, বুঝি রমেশ আসিয়াছে। এত সকালে আর কে আসিবে।

কম্পিতপদে ঘরে ঢুকিয়া যেই দেখিল অক্ষয়, অমনি সে আর কিছুতেই আত্মসংবরণ করিতে পারিল না—তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল।

দ্বিতীয়বার অন্নদাবাবু যখন তাহাকে ঘরের মধ্যে লইয়া আসিলেন, তখন সে তাহার পিতার চৌকির পাশে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া নতমুখে তাঁহার চা প্রস্তুত করিয়া দিতে লাগিল।

যোগেন্দ্র হেমনলিনীর ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিল। হেম যে রমেশের জন্য এমন করিয়া শোক অনুভব করিবে, ইহা তাহার অসহ্য বোধ হইতেছিল। তাহার পরে যখন দেখিল, অন্নদাবাবু তাহার এই শোকের সঙ্গী হইয়াছেন এবং সেও যেন সংসারের আর-সকলের নিকট হইতে অন্নদাবাবুর স্নেহচ্ছায়ায় আপনাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেছে, তখন তাহার অধৈর্য আরও বাড়িয়া উঠিল।—আমরা যেন সবাই অন্যায়কারী—আমরা যে স্নেহের খাতিরেই কর্তব্যপালনে চেষ্টা করিতেছি, আমরাই যে যথার্থভাবে উহার মঙ্গলসাধনে প্রবৃত্ত— তাহার জন্য 'লেশমাত্র' কৃতজ্ঞতা দূরে থাক্‌, মনে মনে আমাদের দোষী করিতেছে। বাবার তো কোনো বিষয়ে কাণ্ডজ্ঞান নাই। এখন

সান্ত্বনা দিবার সময় নহে— এখন আঘাত দিবারই সময়। তাহা না করিয়া তিনি ক্রমাগতই অপ্রিয় সত্যকে উহার নিকট হইতে দূরে খেদাইয়া রাখিতেছেন।

যোগেন্দ্র অন্নদাবাবুকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "জানো বাবা, কী হইয়াছে?"

অন্নদাবাবু ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া কহিলেন, "না— কী হইয়াছে?"

যোগেন্দ্র। রমেশ কাল তাহার স্ত্রীকে লইয়া গোয়ালন্দ-মেলে দেশে যাইতেছিল— অক্ষয়কে সেই গাড়িতে উঠিতে দেখিয়া দেশে না গিয়া আবার সে কলিকাতায় পালাইয়া আসিয়াছে।

হেমনলিনীর হাত কাঁপিয়া উঠিল— চা ঢালিতে চা পড়িয়া গেল। সে চৌকিতে বসিয়া পড়িল।

যোগেন্দ্র তাহার মুখের দিকে একবার কটাক্ষপাত করিয়া বলিতে লাগিল, "পালাইবার কী দরকার ছিল, আমি তো কিছুই বুঝিতে পারি না। অক্ষয়ের কাছে তো পূর্বেই সমস্ত প্রকাশ হইয়া গিয়াছিল। একে তো তাহার পূর্বের ব্যবহার যথেষ্ট হেয়— তাহার পরে এই ভীরুতা, এই চোরের মতো ক্রমাগত পালাইয়া বেড়ানো আমার কাছে অত্যন্ত জঘন্য মনে হয়। জানি না, হেম কী মনে করে— কিন্তু এইরূপ পলায়নেই তাহার অপরাধের যথেষ্ট প্রমাণ হইতেছে।"

হেমনলিনী কাঁপিতে কাঁপিতে চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল— কহিল, "দাদা, আমি প্রমাণের কোনো অপেক্ষা রাখি না। তোমরা তাঁহার বিচার করিতে চাও করো— আমি তাঁহার বিচারক নই।"

যোগেন্দ্র। তোমার সঙ্গে যাহার বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে, সে কি আমাদের নিঃসম্পর্ক।

হেমনলিনী। বিবাহের কথা কে বলিতেছে। তোমরা ভাঙিয়া

দিতে চাও, ভাঙিয়া দাও— সে তোমাদের ইচ্ছা। কিন্তু আমার মন ভাঙাইবার জন্য মিথ্যা চেষ্টা করিতেছ।

বলিতে বলিতে হেমনলিনী স্বরবদ্ধ হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। অন্নদাবাবু তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহার অশ্রুসিক্ত মুখ বুকে চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, "চলো হেম, আমরা উপরে যাই।"

২৩

স্টামার ছাড়িয়া দিল। প্রথম দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় কেহই ছিল না। রমেশ একটি কামরা বাছিয়া লইয়া বিছানা পাতিয়া দিল। সকালবেলায় দুধ খাইয়া সেই কামরার দরজা খুলিয়া কমলা নদী ও নদীতীর দেখিতে লাগিল।

রমেশ কহিল, "জান কমলা, আমরা কোথায় যাইতেছি?"

কমলা কহিল, "দেশে যাইতেছি।"

রমেশ। দেশ তো তোমার ভালো লাগে না—আমরা দেশে যাইব না।

কমলা। আমার জন্যে তুমি দেশে যাওয়া বন্ধ করিয়াছ?

রমেশ। হাঁ, তোমারই জন্যে।

কমলা মুখ ভার করিয়া কহিল, "কেন তা করিলে। আমি একদিন কথায় কথায় কী বলিয়াছিলাম, সেটা বুঝি এমন করিয়া মনে লইতে আছে। তুমি কিন্তু ভারি অল্পতেই রাগ কর।"

রমেশ হাসিয়া কহিল, "আমি কিছুমাত্র রাগ করি নাই। দেশে যাইবার ইচ্ছা আমারও নাই।"

কমলা তখন উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তবে আমরা কোথায় যাইতেছি।"

রমেশ। পশ্চিমে।

'পশ্চিমে' শুনিয়া কমলার চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। পশ্চিম! যে-লোক চিরদিন ঘরের মধ্যে কাটাইয়াছে, এক 'পশ্চিম' বলিতে তাহার কাছে কতখানি বোঝায়! পশ্চিমে তীর্থ, পশ্চিমে স্বাস্থ্য, পশ্চিমে নব নব দেশ, নব নব দৃশ্য, কত রাজা ও সম্রাটের পুরাতন কীর্তি, কত কারুখচিত দেবালয়, কত প্রাচীন কাহিনী, কত বীরত্বের ইতিহাস।

কমলা পুলকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পশ্চিমে আমরা কোথায় যাইতেছি।"

রমেশ কহিল, "কিছুই ঠিক নাই। মুঙ্গের, পাটনা, দানাপুর, বক্সার, গাজিপুর, কাশী, যেখানে হউক এক জায়গায় গিয়া উঠা যাইবে।"

এই সকল কতক-জানা এবং না-জানা শহরের নাম শুনিয়া কমলার কল্পনাবৃত্তি আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সে হাততালি দিয়া কহিল, "ভারি মজা হইবে।"

রমেশ কহিল, "মজা তো পরে হইবে, কিন্তু এ-কয়দিন খাওয়া-দাওয়ার কী করা যাইবে। তুমি খালাসিদের হাতের রান্না খাইতে পারিবে?"

কমলা ঘৃণায় মুখ বিকৃত করিয়া কহিল, "মাগো! সে আমি পারিব না।"

রমেশ। তাহা হইলে কী উপায় করিবে।

কমলা। কেন, আমি নিজে রাঁধিয়া লইব।

রমেশ। তুমি রাঁধিতে পার?

কমলা হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "তুমি আমাকে কী যে ভাব, জানি না। রাঁধিতে পারি না তো কী। আমি কি কচি খুকী। মামার বাড়িতে আমি তো বরাবর রাঁধিয়া আসিয়াছি।"

রমেশ তৎক্ষণাৎ অনুতাপ প্রকাশ করিয়া কহিল, "তাই তো, তোমাকে এই প্রশ্নটা করা ঠিক সংগত হয় নাই। তাহা হইলে এখন হইতে রাঁধিবার জোগাড় করা যাক— কী বল।"

এই বলিয়া রমেশ চলিয়া গেল, এবং সন্ধান করিয়া এক লোহার উনুন সংগ্রহ করিল। শুধু তাই নয়, কাশী পৌঁছাইয়া দিবার খরচ ও বেতনের প্রলোভনে উমেশ বলিয়া এক কায়স্থ বালককে জলতোলা, বাসনমাজা প্রভৃতি কাজের জন্য নিযুক্ত করিল।

রমেশ কহিল, "কমলা, আজ কী রান্না হইবে।"

কমলা কহিল, "তোমার তো ভারি জোগাড় আছে। এক ডাল আর চাল— আজ খিচুড়ি হইবে।"

রমেশ খালাসিদের নিকট হইতে কমলার নির্দেশমতো মসলা সংগ্রহ করিয়া আনিল।

রমেশের অনভিজ্ঞতায় কমলা হাসিয়া উঠিল, কহিল, "শুধু মসলা লইয়া কী করিব। শিল-নোড়া নহিলে বাটিব কী করিয়া। তুমি তো বেশ।"

বালিকার এই অবজ্ঞা বহন করিয়া রমেশ শিল-নোড়ার সন্ধানে ছুটিল। শিল-নোড়া না পাইয়া খালাসিদের কাছ হইতে এক লোহার হামানদিস্তা ধার করিয়া আনিল।

হামানদিস্তায় মসলা কোটা কমলার অভ্যাস ছিল না। অগত্যা তাহাই লইয়া বসিতে হইল। রমেশ কহিল, "মসলা না হয় আর-কাহাকেও দিয়া পিষাইয়া আনিতেছি।"

কমলার তাহা মনঃপূত হইল না। সে নিজেই উৎসাহসহকারে কাজ আরম্ভ করিল। এই অনভ্যস্ত প্রণালীর অসুবিধাতে তাহার কৌতুকবোধ হইল। মসলা লাফাইয়া উঠিয়া চারিদিকে ছিটাইয়া

পড়ে, আর সে হাসি রাখিতে পারে না। তাহার এই হাসি দেখিয়া রমেশেরও হাসি পায়।

এইরূপে মসলা কোটার অধ্যায় শেষ করিয়া কোমরে আঁচল জড়াইয়া একটা দরমা-ঘেরা জায়গায় কমলা রান্না চড়াইয়া দিল। কলিকাতা হইতে একটা হাঁড়িতে করিয়া সন্দেশ আনা হইয়াছিল, সেই হাঁড়িতেই কাজ চালাইয়া লইতে হইল।

রান্না চড়াইয়া দিয়া কমলা রমেশকে কহিল, "তুমি যাও, শীঘ্র স্নান করিয়া লও— আমার রান্না হইতে বেশি দেরি হইবে না।"

রান্নাও হইল, রমেশও স্নান করিয়া আসিল। এখন প্রশ্ন উঠিল, থাল তো নাই, কিসে খাওয়া যায়।

রমেশ অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে কহিল, "খালাসিদের কাছ হইতে সানকি ধার করিয়া আনা যাইতে পারে।"

কমলা কহিল, "ছি।"

রমেশ মৃদুস্বরে জানাইল, এরূপ অনাচার পূর্বেও তাহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

কমলা কহিল, "পূর্বে যা হইয়াছে, তা হইয়াছে, এখন হইতে হইবে না— আমি ও দেখিতে পারিব না।"

এই বলিয়া সে সেই সন্দেশের হাঁড়ির মুখে যে সরা ছিল, তাহাই ভালো করিয়া ধুইয়া আনিয়া উপস্থিত করিল। কহিল, "আজকের মতো তুমি ইহাতেই খাও, পরে দেখা যাইবে।"

জল দিয়া ধুইয়া আহারস্থান প্রস্তুত হইলে রমেশ শুদ্ধভাবে খাইতে বসিয়া গেল। দুই-এক গ্রাস মুখে তুলিয়া কহিল, "বাঃ, চমৎকার হইয়াছে।"

কমলা লজ্জিত হইয়া কহিল, "যাও, ঠাট্টা করিতে হইবে না।"

রমেশ কহিল, "ঠাট্টা নয়, তাহা এখনি দেখিতে পাইবে।" বলিয়া পাতের অন্ন দেখিতে দেখিতে নিঃশেষ করিয়া আবার চাহিল। কমলা এবারে অনেক বেশি করিয়া দিল। রমেশ ব্যস্ত হইয়া কহিল, "ও কী করিতেছ। তোমার নিজের জন্য কিছু আছে তো ?"

"ঢের আছে— সেজন্যে তোমার ভাবিতে হইবে না।"

রমেশের তৃপ্তিপূর্বক আহারে কমলা ভারি খুশি হইল। রমেশ কহিল, "তুমি কিসে খাইবে ?"

কমলা কহিল, "কেন, ওই সরাতেই হইবে।"

রমেশ অস্থির হইয়া উঠিল। কহিল, "না, সে হইতেই পারে না।" কমলা আশ্চর্য হইয়া কহিল, "কেন, হইবে না কেন।"

রমেশ কহিল, "না না, সে কি হয়।"

কমলা কহিল, "খুব হইবে—আমি সব ঠিক করিয়া লইতেছি। উমেশ, তুই কিসে খাইবি ?"

উমেশ কহিল, "মাঠাকরুন, নিচে ময়রা খাবার বেচিতেছে, তাহার কাছ হইতে শালপাতা চাহিয়া আনিতেছি।"

রমেশ কহিল, "তুমি যদি ওই সরাতেই খাইবে তো আমাকে দাও, আমি ভালো করিয়া ধুইয়া আনিতেছি।"

কমলা কেবল সংক্ষেপে কহিল, "পাগল হইয়াছ।" ক্ষণকাল পরে সে বলিয়া উঠিল, "কিন্তু পান তৈরি করিতে পারি নাই, তুমি আমাকে পান আনাইয়া দাও নাই।"

রমেশ কহিল, "নিচে পানওয়ালা পান বেচিতেছে।"

এমনি করিয়া অতি সহজেই ঘরকন্না শুরু হইল। রমেশ মনে মনে উদ্‌বিগ্ন হইয়া উঠিল। সে ভাবিতে লাগিল, "দাম্পত্যের ভাবকে কেমন করিয়া ঠেকাইয়া রাখা যায় ?"

গৃহিণীর পদ অধিকার করিয়া লইবার জন্য কমলা বাহিরের কোনো সহায়তা বা শিক্ষার প্রত্যাশা রাখে না। সে যতদিন তাহার মামার বাড়িতে ছিল, রাঁধিয়াছে-বাড়িয়াছে, ছেলে মানুষ করিয়াছে, ঘরের কাজ চালাইয়াছে। তাহার নৈপুণ্য, তৎপরতা ও কর্মের আনন্দ দেখিয়া রমেশের ভারি সুন্দর লাগিল— কিন্তু সেই সঙ্গে এ-কথাও সে ভাবিতে লাগিল, ভবিষ্যতে ইহাকে লইয়া কী ভাবে চলা যাইবে? ইহাকে কেমন করিয়া কাছে রাখিব, অথচ দূরে রাখিয়া দিব? দুইজনের মাঝখানে গাণ্ডর রেখাটা কোন্খানে টানা উচিত? উভয়ের মধ্যে যদি হেমনলিনী থাকিত, তাহা হইলে সমস্তই সুন্দর হইয়া উঠিত। কিন্তু সে-আশা যদি ত্যাগ করিতেই হয়, তবে একলা কমলাকে লইয়া সমস্ত সমস্যার মীমাংসা যে কী করিয়া হইতে পারে, তাহা ভাবিয়া পাওয়া কঠিন। রমেশ স্থির করিল, আসল কথাটা কমলাকে খুলিয়া বলাই উচিত, ইহার পর আর চাপিয়া রাখা চলে না।

২৪

তখনো বেলা যায় নাই, এমন সময় স্টীমার চরে ঠেকিয়া গেল। সেদিন অনেক ঠেলাঠেলিতেও স্টীমার ভাসিল না। উঁচু পাড়ের নিচে জলচর পাখিদের পদাঙ্কখচিত এক স্তর বালুকাময় নিম্নতট কিছুদূর হইতে বিস্তীর্ণ হইয়া নদীতে আসিয়া নামিয়াছে। সেইখানে গ্রামবধূরা তখন দিনান্তের শেষ জলসঞ্চয় করিয়া লইবার জন্য ঘট লইয়া আসিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কোনো কোনো প্রগল্‌ভা বিনা অবগুণ্ঠনে এবং কোনো কোনো ভীরু ঘোমটার অন্তরাল হইতে স্টীমারের দিকে চাহিয়া কৌতূহল মিটাইতেছিল। উর্ধ্বনাসিক স্পর্ধিত জলযানটার দুর্বিপাকে গ্রামের

ছেলেগুলা পাড়ের উপরে দাঁড়াইয়া চীৎকারস্বরে ব্যঙ্গোক্তি করিতে করিতে নৃত্য করিতেছিল।

ওপারের জনশূন্য চরের মধ্যে সূর্য অস্ত গেল। রমেশ জাহাজের রেলিং ধরিয়া সন্ধ্যার আভায় দীপ্যমান পশ্চিম-দিগন্তের দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া ছিল। কমলা তাহার বেড়া-দেওয়া রাঁধিবার জায়গা হইতে আসিয়া কামরার দরজার পাশে দাঁড়াইল। রমেশ শীঘ্র পশ্চাতে মুখ ফিরাইবে, এমন সম্ভাবনা না দেখিয়া সে মৃদুভাবে একটু-আধটু কাসিল— তাহাতেও কোনো ফল হইল না— অবশেষে তাহার চাবির গোছা দিয়া দরজায় ঠকঠক করিতে লাগিল। শব্দ যখন প্রবলতর হইল, তখন রমেশ মুখ ফিরাইল। কমলাকে দেখিয়া তাহার কাছে আসিয়া কহিল, "এ তোমার কী-রকম ডাকিবার প্রণালী ?"

কমলা কহিল, "তা কী-রকম করিয়া ডাকিব ?"

রমেশ কহিল, "কেন, বাপমায়ে আমার নামকরণ করিয়াছিলেন কিসের জন্য,— যদি কোনো ব্যবহারেই না লাগিবে ? প্রয়োজনের সময় আমাকে রমেশবাবু বলিয়া ডাকিলে ক্ষতি কী।"

আবার সেই একই রকম ঠাট্টা! কমলার কপোলে এবং কর্ণমূলে সন্ধ্যার আভার উপরে আরও একটুখানি রক্তিম আভা যোগ দিল,— সে মাথা বাঁকাইয়া কহিল, "তুমি কী যে বল, তাহার ঠিক নাই। শোনো, তোমার খাবার তৈরি ; একটু সকাল-সকাল খাইয়া লও। আজ ও-বেলায় ভালো করিয়া খাওয়া হয় নাই।"

নদীর বাতাসে রমেশের ক্ষুধাবোধ হইতেছিল। আয়োজনের অভাবে পাছে কমলা ব্যস্ত হইয়া পড়ে, সেইজন্য কিছুই বলে নাই— এমন সময়ে অযাচিত আহারের সংবাদে তাহার মনে যে একটা সুখের আন্দোলন তুলিল, তাহার মধ্যে একটু বৈচিত্র্য ছিল। কেবল

ক্ষুধানিবৃত্তির আসন্ন সম্ভাবনার সুখ নহে— কিন্তু সে যখন জানিতেছে না, তখনো যে তাহার জন্য একটি চিন্তা জাগ্রত আছে,— একটি চেষ্টা ব্যাপৃত রহিয়াছে— তাহার সম্বন্ধে একটি কল্যাণের বিধান স্বতই কাজ করিয়া চলিয়াছে, ইহার গৌরব সে হৃদয়ের মধ্যে অনুভব না করিয়া থাকিতে পারিল না। কিন্তু ইহা তাহার প্রাপ্য নহে, এতবড়ো জিনিসটা কেবল ভ্রমের উপরেই প্রতিষ্ঠিত— এই চিন্তার নিষ্ঠুর আঘাতও সে এড়াইতে পারিল না— সে শির নত করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

কমলা তাহার মুখের ভাব দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া কহিল, "তোমার বুঝি খাইতে ইচ্ছা নাই? ক্ষুধা পায় নাই? আমি কি তোমাকে জোর করিয়া খাইতে বলিতেছি।"

রমেশ তাড়াতাড়ি প্রফুল্লতার ভান করিয়া কহিল, "তোমাকে জোর করিতে হইবে কেন, আমার পেটের মধ্যেই জোর করিতেছে। এখন তো খুব চাবি ঠকঠক করিয়া ডাকিয়া আনিলে, শেষকালে পরিবেষণের সময় যেন দর্পহারী মধুসূদন দেখা না দেন।"

এই বলিয়া রমেশ চারিদিকে চাহিয়া কহিল, "কই, খাদ্যদ্রব্য তো কিছু দেখি না। খুব ক্ষুধার জোর থাকিলেও এই আসবাবগুলা আমার হজম হইবে না—ছেলেবেলা হইতে আমার অন্যরকম অভ্যাস।"—রমেশ কামরার বিছানা প্রভৃতি অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিল।

কমলা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসির বেগ থামিলে কহিল, "এখন বুঝি আর সবুর সহিতেছে না? যখন আকাশের দিকে তাকাইয়া ছিলে, তখন বুঝি ক্ষুধাতৃষ্ণা ছিল না? আর যেমনি আমি ডাকিলাম, অমনি মনে পড়িয়া গেল ভারি ক্ষুধা পাইয়াছে। আচ্ছা, তুমি এক মিনিট বসো, আমি আনিয়া দিতেছি।"

রমেশ কহিল, "কিন্তু দেরি হইলে এই বিছানাপত্র কিছুই দেখিতে পাইবে না—তখন আমার দোষ দিয়ো না।"

রসিকতার এই পুনরুক্তিতে কমলার কম আমোদবোধ হইল না। তাহার আবার ভারি হাসি পাইল। সরল হাস্যোচ্ছ্বাসে ঘরকে সুধাময় করিয়া দিয়া কমলা দ্রুতপদে খাবার আনিতে গেল। রমেশের কাষ্ঠ-প্রফুল্লতার ছদ্মদীপ্তি মুহূর্তের মধ্যে কালিমায় ব্যাপ্ত হইল।

উপরে-শালপাত-ঢাকা একটা চাঙারি লইয়া অনতিকাল পরেই কমলা কামরায় প্রবেশ করিল। বিছানার উপরে চাঙারি রাখিয়া আঁচল দিয়া ঘরের মেঝে মুছিতে লাগিল।

রমেশ ব্যস্ত হইয়া কহিল, "ও কী করিতেছ ?"

কমলা কহিল, "আমি তো এখনি কাপড় ছাড়িয়া ফেলিব।"— এই বলিয়া শালপাতা তুলিয়া পাতিল ও তাহার উপরে লুচি ও তরকারি নিপুণহস্তে সাজাইয়া দিল।

রমেশ কহিল, "কী আশ্চর্য। লুচির জোগাড় করিলে কী করিয়া ?"

কমলা সহজে রহস্য ফাঁস না করিয়া অত্যন্ত নিগূঢ় ভাব ধারণ করিয়া কহিল, "কেমন করিয়া বলো দেখি।"

রমেশ কঠিন চিন্তার ভান করিয়া কহিল, "নিশ্চয়ই খালাসিদের জলখাবার হইতে ভাগ বসাইয়াছ।"

কমলা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া কহিল, "কক্‌খনো না। রাম বলো !"

রমেশ খাইতে খাইতে লুচির আদিকারণ-সম্বন্ধে যত-রাজ্যের অসম্ভব কল্পনা দ্বারা কমলাকে রাগাইয়া তুলিল। যখন বলিল, "আরব্য উপন্যাসের প্রদীপওয়ালা আলাদীন বেলুচিস্থান হইতে গরম-গরম ভাজাইয়া তাহার দৈত্যকে দিয়া সওগাদ পাঠাইয়াছে", তখন কমলার আর ধৈর্য কিছুতেই রহিল না— সে মুখ ফিরাইয়া কহিল, "তবে যাও— আমি বলিব না।"

রমেশ ব্যস্ত হইয়া কহিল, "না না, আমি হার মানিতেছি। মাঝদরিয়ায় লুচি—এ যে কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে, আমি তো ভাবিয়া পাইতেছি না—কিন্তু তবু খাইতে চমৎকার লাগিতেছে।"

এই বলিয়া রমেশ তত্ত্বনির্ণয় অপেক্ষা ক্ষুধানিবৃত্তির শ্রেষ্ঠতা সবেগে সপ্রমাণ করিতে লাগিল।

স্টীমার চরে ঠেকিয়া গেলে, শূন্যভাণ্ডারপূরণের চেষ্টায় কমলা উমেশকে গ্রামে পাঠাইয়াছিল। স্কুলে থাকিতে জলপানিস্বরূপে রমেশ কমলাকে যে কয়টি টাকা দিয়াছিল, তাহারই মধ্য হইতে অল্প কিছু বাঁচিয়াছিল, তাহাই দিয়া কিছু ঘি-ময়দা সংগ্রহ হইল। উমেশকে কমলা জিজ্ঞাসা করিল, "উমেশ, তুই কী খাবি বল্ দেখি।"

উমেশ কহিল, "মাঠাকরুন, দয়া কর যদি, গ্রামে গোয়ালার বাড়িতে বড়ো সরেস দই দেখিয়া আসিলাম—কলা তো ঘরেই আছে, আর পয়সা-দুয়েকের চিঁড়ে-মুড়কি হইলেই পেট ভরিয়া আজ ফলার করিয়া লই।"

লুব্ধ বালকের ফলারের উৎসাহে কমলাও উৎসাহিত হইয়া উঠিল—কহিল, "পয়সা কিছু বাঁচিয়াছে উমেশ ?"

উমেশ কহিল, "কিছু না মা।"

কমলা মুশকিলে পড়িয়া গেল। রমেশের কাছে কেমন করিয়া মুখ ফুটিয়া টাকা চাহিবে, তাই ভাবিতে লাগিল। একটু পরে বলিল, "তোর ভাগ্যে আজ যদি ফলার না-ই জোটে, তবে লুচি আছে—তোর ভাবনা নাই। চল্, ময়দা মাখবি চল্।"

উমেশ কহিল, "কিন্তু মা, দই যা দেখিয়া আসিলাম, সে আর কী বলিব।"

কমলা কহিল, "দেখ্ উমেশ, বাবু যখন খাইতে বসিবেন, তখনই তুই তোর বাজারের পয়সা চাহিতে আসিস।"

রমেশের আহার কতকটা অগ্রসর হইলে, উমেশ আসিয়া দাঁড়াইয়া সসংকোচে মাথা চুলকাইতে লাগিল। রমেশ তাহার মুখের দিকে চাহিল। সে অর্ধোক্তিতে কহিল, "মা, বাজারের পয়সা—"

তখন রমেশের হঠাৎ চেতনা হইল যে, আহারের আয়োজন করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন হয়, আলাদীনের প্রদীপের অপেক্ষা করিলে চলে না। ব্যস্ত হইয়া কহিল, "কমলা, তোমার কাছে তো টাকা কিছুই নাই। আমাকে মনে করাইয়া দাও নাই কেন।"

কমলা নীরবে অপরাধ স্বীকার করিয়া লইল। আহারান্তে রমেশ কমলার হাতে একটি ছোটো ক্যাশবাক্স দিয়া কহিল, "এখনকার মতো তোমার ধনরত্ন সব এইটেতেই রহিল।"

এইরূপে গৃহিণীপনার সমস্ত ভারই আপনা হইতেই কমলার হাতে গিয়া পড়িতেছে, রমেশ তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া আবার একবার জাহাজের রেলিং ধরিয়া পশ্চিম আকাশের দিকে চাহিল। পশ্চিম-আকাশ দেখিতে দেখিতে তাহার চোখের উপরে সম্পূর্ণ অন্ধকার হইয়া আসিল।

উমেশ আজ পেট ভরিয়া চিঁড়ে-দই-কলা মাখিয়া ফলার করিল। কমলা সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার জীবনবৃত্তান্ত সবিস্তারে আয়ত্ত করিয়া লইল।

বিমাতা-শাসিত গৃহের উপেক্ষিত উমেশ কাশীতে তাহার মাতামহীর কাছে পালাইয়া যাইতেছিল— সে কহিল, "মা, যদি তোমাদের কাছেই রাখ, তবে আমি আর কোথাও যাই না।"

মাতৃহীন বালকের মুখে মা-সম্ভাষণ শুনিয়া বালিকার কোমল হৃদয়ের কোন্-এক গভীরদেশ হইতে জননী সাড়া দিল—কমলা স্নিগ্ধস্বরে কহিল, "বেশ তো উমেশ, তুই আমাদের সঙ্গেই চল্।"

২৫

তীরের বনরাজি অবিচ্ছিন্ন মসীলেখায় সন্ধ্যা-বধূর সোনার অঞ্চলে কালো পাড় টানিয়া দিল। গ্রামান্তরের বিলের মধ্যে সমস্ত দিন চরিয়া বন্যহংসের দল আকাশের ম্লানায়মান সূর্যাস্তদীপ্তির মধ্য দিয়া ওপারের তরুশূন্য বালুচরে নিভৃত জলাশয়গুলিতে রাত্রিযাপনের জন্য চলিয়াছে। কাকেদের বাসায় আসিবার কলরব থামিয়া গেছে। নদীতে তখন নৌকা ছিল না;— একটিমাত্র বড়ো ডিঙি গাঢ় সোনালি-সবুজ নিস্তরঙ্গ জলের উপর দিয়া আপন কালিমা বহিয়া নিঃশব্দে গুণ টানিয়া চলিয়াছিল।

রমেশ জাহাজের ছাদের সম্মুখভাগে নবোদিত শুক্লপক্ষের তরুণ চাঁদের আলোকে বেতের কেদারা টানিয়া লইয়া বসিয়া ছিল।

পশ্চিম-আকাশ হইতে সন্ধ্যার শেষ স্বর্ণচ্ছায়া মিলাইয়া গেল; চন্দ্রালোকের ইন্দ্রজালে কঠিন জগৎ যেন বিগলিত হইয়া আসিল। রমেশ আপনা-আপনি মৃদুস্বরে বলিতে লাগিল, "হেম, হেম!" সেই নামের শব্দটিমাত্র যেন সুমধুর-স্পর্শরূপে তাহার সমস্ত হৃদয়কে বারংবার বেষ্টন করিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিল— সেই নামের শব্দটিমাত্র যেন অপরিমেয়-করুণারসার্দ্র দুই ছায়াময় চক্ষুরূপে তাহার মুখের উপরে বেদনা বিকীর্ণ করিয়া চাহিয়া রহিল। রমেশের সর্বশরীর পুলকিত এবং দুই চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া আসিল।

তাহার গত দুই বৎসরের জীবনের সমস্ত ইতিহাস তাহার মনের সম্মুখে প্রসারিত হইয়া গেল;— হেমনলিনীর সহিত তাহার প্রথম পরিচয়ের দিন মনে পড়িয়া গেল। সেদিনকে রমেশ তাহার জীবনের একটি বিশেষ দিন বলিয়া চিনিতে পারে নাই। যোগেন্দ্র যখন তাহাকে

তাহাদের চায়ের টেবিলে লইয়া গেল, সেখানে হেমনলিনীকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া লাজুক রমেশ আপনাকে নিতান্ত বিপন্ন বোধ করিয়াছিল। অল্পে অল্পে লজ্জা ভাঙিয়া গেল, হেমনলিনীর সঙ্গ অভ্যস্ত হইয়া আসিল, ক্রমে সেই অভ্যাসের বন্ধন রমেশকে বন্দী করিয়া তুলিল। কাব্যসাহিত্যে রমেশ প্রেমের কথা যাহা-কিছু পড়িয়াছিল, সমস্তই সে হেমনলিনীর প্রতি আরোপ করিতে আরম্ভ করিল। আমি ভালোবাসিতেছি মনে করিয়া সে মনে মনে একটা অহংকার অনুভব করিল। তাহার সহপাঠীরা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইবার জন্য ভালোবাসার কবিতার অর্থ মুখস্থ করিয়া মরে— আর রমেশ সত্যসত্যই ভালোবাসে, ইহা চিন্তা করিয়া অন্য ছাত্রদিগকে সে কৃপাপাত্র মনে করিত। রমেশ আজ আলোচনা করিয়া দেখিল, সেদিনও সে ভালোবাসার বহির্দ্বারেই ছিল। কিন্তু যখন অকস্মাৎ কমলা আসিয়া তাহার জীবনসমস্যাকে জটিল করিয়া তুলিল, তখনি নানা বিরুদ্ধ ঘাতপ্রতিঘাতে দেখিতে দেখিতে হেমনলিনীর প্রতি তাহার প্রেম আকার ধারণ করিয়া, জীবন গ্রহণ করিয়া জাগ্রত হইয়া উঠিল।

রমেশ তাহার দুই করতলের উপরে শির নত করিয়া ভাবিতে লাগিল, সম্মুখে সমস্ত জীবনই তো পড়িয়া রহিয়াছে— তাহার ক্ষুধিত উপবাসী জীবন—দুশ্ছেদ্য সংকটজালে বিজড়িত। এ-জাল কি সে সবলে দুই হাত দিয়া ছিন্ন করিয়া ফেলিবে না।

এই বলিয়া সে দৃঢ়সংকল্পের আবেগে হঠাৎ মুখ তুলিয়া দেখিল, অদূরে আর-একটা বেতের চৌকির পিঠের উপরে হাত রাখিয়া কমলা দাঁড়াইয়া আছে। কমলা চকিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "তুমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলে, আমি বুঝি তোমাকে জাগাইয়া দিলাম ?"

অনুতপ্ত কমলাকে চলিয়া যাইতে উদ্যত দেখিয়া রমেশ তাড়াতাড়ি

কহিল, "না না কমলা, আমি ঘুমাই নাই— তুমি বসো, তোমাকে একটা গল্প বলি।"

গল্পের কথা শুনিয়া কমলা পুলকিত হইয়া চৌকি টানিয়া লইয়া বসিল। রমেশ স্থির করিয়াছিল, কমলাকে সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া বলা অত্যাবশ্যক হইয়াছে। কিন্তু এতবড়ো একটা আঘাত হঠাৎ সে দিতে পারিল না— তাই বলিল, "বসো, তোমাকে একটা গল্প বলি।"

রমেশ কহিল, "সেকালে এক জাতি ক্ষত্রিয় ছিল, তাহারা—"

কমলা জিজ্ঞাসা করিল, "কবেকার কালে? অনে—ক কাল আগে?"

রমেশ কহিল, "হাঁ, সে অনেককাল আগে। তখন তোমার জন্ম হয় নাই।"

কমলা। তোমারই নাকি জন্ম হইয়াছিল! তুমি নাকি বহুকালের লোক! তারপরে?

রমেশ। সেই ক্ষত্রিয়দের নিয়ম ছিল, তাহারা নিজে বিবাহ করিতে না গিয়া তলোয়ার পাঠাইয়া দিত। সেই তলোয়ারের সহিত বধূর বিবাহ হইয়া গেলে তাহাকে বাড়িতে আনিয়া আবার বিবাহ করিত।

কমলা। না না, ছিঃ। ও কী রকম বিবাহ!

রমেশ। আমিও ও-রকম বিবাহ পছন্দ করি না— কিন্তু কী করিব —যে ক্ষত্রিয়দের কথা বলিতেছি, তাহারা শ্বশুরবাড়ি নিজে গিয়া বিবাহ করিতে অপমান বোধ করিত। আমি যে-রাজার গল্প বলিতেছি, সে ওই জাতের ক্ষত্রিয় ছিল। একদিন সে—

কমলা। তুমি তো বলিলে না, সে কোথাকার রাজা।

রমেশ বলিয়া দিল, "মদ্রদেশের রাজা। একদিন সেই রাজা—"

কমলা। রাজার নাম কী আগে বলো।

কমলা সকল কথা স্পষ্ট করিয়া লইতে চায়— তাহার কাছে কিছুই উহ্য রাখিলে চলিবে না। রমেশ এতটা জানিলে আগে হইতে আরও বেশি প্রস্তুত হইয়া থাকিত— এখন দেখিল, কমলার গল্প শুনিতে যতই আগ্রহ থাক্, গল্পের কোনো জায়গায় তাহার ফাঁকি সহ্য হয় না।

রমেশ হঠাৎ প্রশ্নে একটু থমকিয়া বলিল, "রাজার নাম রণজিৎ সিং।"

কমলা একবার আবৃত্তি করিয়া লইল, "রণজিৎ সিং, মদ্রদেশের রাজা। তারপরে ?"

রমেশ। তারপরে একদিন রাজা ভাটের মুখে শুনিলেন, তাঁহারই জাতের আর-এক রাজার এক পরমাসুন্দরী কন্যা আছে।

কমলা। সে আবার কোথাকার রাজা।

রমেশ। মনে করো, সে কাঞ্চীর রাজা।

কমলা। মনে করিব কী। তবে সত্য কি সে কাঞ্চীর রাজা নয়।

রমেশ। কাঞ্চীরই রাজা বটে। তুমি তার নাম জানিতে চাও ? তার নাম অমর সিং।

কমলা। সেই মেয়ের নাম তো বলিলে না ? সেই পরমাসুন্দরী কন্যা !

রমেশ। হাঁ হাঁ, ভুল হইয়াছে বটে। সেই মেয়ের নাম—তাহার নাম— ওঃ, তাহার নাম চন্দ্রা—

কমলা। আশ্চর্য। তুমি এমন ভুলিয়া যাও ! তুমি তো আমারি নাম ভুলিয়াছিলে।

রমেশ। কোশলের রাজা ভাটের মুখে এই কথা শুনিয়া—

কমলা। কোশলের রাজা কোথা হইতে আসিল। তুমি যে বলিলে মদ্রদেশের রাজা—

রমেশ। সে কি এক জায়গার রাজা ছিল মনে কর। সে কোশলেরও রাজা, মদ্রেরও রাজা।

কমলা। দুই রাজ্য বুঝি পাশাপাশি।

রমেশ। একেবারে গায়ে গায়ে লাগাও।

এইরূপে বারংবার ভুল করিতে করিতে ও সতর্ক কমলার প্রশ্নের সাহায্যে সেই সকল ভুল কোনোমতে সংশোধন করিতে করিতে রমেশ এইরূপ ভাবে গল্পটি বলিয়া গেল—

"মদ্ররাজ রণজিৎ সিং কাঞ্চীরাজের নিকট রাজকন্যাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব জানাইয়া দূত পাঠাইয়া দিলেন। কাঞ্চীর রাজা অমর সিং খুশি হইয়া সম্মত হইলেন।

"তখন রণজিৎ সিংহের ছোটো ভাই ইন্দ্রজিৎ সিং সৈন্যসামন্ত লইয়া নিশান উড়াইয়া কাড়া-নাকাড়া দুন্দুভি-দামামা বাজাইয়া কাঞ্চীর রাজোদ্যানে গিয়া তাঁবু ফেলিলেন। কাঞ্চীনগরে উৎসবের সমারোহ পড়িয়া গেল।

"রাজার দৈবজ্ঞ গণনা করিয়া শুভদিনক্ষণ স্থির করিয়া দিল। কৃষ্ণাদ্বাদশীতিথিতে রাত্রি আড়াই প্রহরের পর লগ্ন। রাত্রে নগরের ঘরে ঘরে ফুলের মালা দুলিল এবং দীপাবলী জলিয়া উঠিল। আজ রাত্রে রাজকুমারী চন্দ্রার বিবাহ।

"কিন্তু কাহার সহিত বিবাহ, রাজকন্যা চন্দ্রা সে-কথা জানেন না। তাঁহার জন্মকালে পরমহংস পরমানন্দস্বামী রাজাকে বলিয়াছিলেন, 'তোমার এই কন্যার প্রতি অশুভ গ্রহের দৃষ্টি আছে, বিবাহকালে পাত্রের নাম যেন এ কন্যা জানিতে না পারে।'

"যথাকালে তরবারির সহিত রাজকন্যার গ্রন্থিবন্ধন হইয়া গেল। ইন্দ্রজিৎ সিং যৌতুক আনিয়া তাঁহার ভ্রাতৃবধূকে প্রণাম

করিলেন। মদ্ররাজ্যের রণজিৎ এবং ইন্দ্রজিৎ যেন দ্বিতীয় রাম-লক্ষণ ছিলেন। ইন্দ্রজিৎ আর্যা চন্দ্রার অবগুণ্ঠিত লজ্জারুণ মুখের দিকে তাকাইলেন না— তিনি কেবল তাঁহার নূপুরবেষ্টিত সুকুমার চরণযুগলের অলক্ত-রেখাটুকুমাত্র দেখিয়াছিলেন।

"যথারীতি বিবাহের পরদিনেই মুক্তামালার ঝালর-দেওয়া পালঙ্কে বধূকে লইয়া ইন্দ্রজিৎ স্বদেশের দিকে যাত্রা করিলেন। অশুভগ্রহের কথা স্মরণ করিয়া শঙ্কিতহৃদয়ে কাঞ্চীরাজ কন্যার মস্তকের উপরে দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া আশীর্বাদ করিলেন, মাতা কন্যার মুখচুম্বন করিয়া অশ্রুজল সংবরণ করিতে পারিলেন না— দেবমন্দিরে সহস্র গ্রহবিপ্র স্বস্ত্যয়নে নিযুক্ত হইল।

"কাঞ্চী হইতে মদ্র বহুদূর— প্রায় এক মাসের পথ। দ্বিতীয় রাত্রে যখন বেতসা-নদীর তীরে শিবির রাখিয়া ইন্দ্রজিতের দলবল বিশ্রামের আয়োজন করিতেছে, এমন সময় বনের মধ্যে মশালের আলো দেখা গেল। ব্যাপারখানা কী, জানিবার জন্য ইন্দ্রজিৎ সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন।

"সৈনিক আসিয়া কহিল, 'কুমার, ইহারাও আর-একটি বিবাহের যাত্রিদল। ইহারাও আমাদের স্বশ্রেণীয় ক্ষত্রিয়— অস্ত্রোদ্বাহ সমাধা করিয়া বধূকে পতিগৃহে লইয়া চলিয়াছে। পথে নানা বিঘ্নভয় আছে, তাই ইহারা কুমারের শরণ প্রার্থনা করিতেছে— আদেশ পাইলে কিছুদূর পথ ইহারা আমাদের আশ্রয়ে যাত্রা করে।'

"কুমার ইন্দ্রজিৎ কহিলেন, 'শরণাপন্নকে আশ্রয় দেওয়া আমাদের ধর্ম। যত্ন করিয়া ইহাদিগকে রক্ষা করিবে।'

"এইরূপে দুই শিবির একত্র মিলিত হইল।

"তৃতীয় রাত্রি অমাবস্যা। সম্মুখে ছোটো ছোটো পাহাড়, পশ্চাতে অরণ্য। শ্রান্ত সৈনিকেরা ঝিল্লীর শব্দে ও অদূরবর্তী ঝরনার কলধ্বনিতে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন।

"এমন সময়ে হঠাৎ কলরবে সকলে জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, মদ্র-শিবিরের ঘোড়াগুলি উন্মত্তের ন্যায় ছুটাছুটি করিতেছে— কে তাহাদের রজ্জু কাটিয়া দিয়াছে— এবং মাঝে মাঝে এক-একটা তাঁবুতে আগুন লাগিয়াছে ও তাহার দীপ্তিতে অমারাত্রি রক্তিমবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

"বুঝা গেল, দস্যু আক্রমণ করিয়াছে। মারামারি কাটাকাটি বাধিয়া গেল— অন্ধকারে শত্রু-মিত্র ভেদ করা কঠিন। সমস্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল, দস্যুরা সেই সুযোগে লুটপাট করিয়া অরণ্যে-পর্বতে অন্তর্ধান করিল।

"যুদ্ধ-অন্তে রাজকুমারীকে আর দেখা গেল না। তিনি ভয়ে শিবির হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং একদল পলায়নপর লোককে স্বপক্ষ মনে করিয়া তাহাদের সহিত মিশিয়া গিয়াছিলেন।

"তাহারা অন্য বিবাহের দল। গোলেমালে তাহাদের বধূকে দস্যুরা হরণ করিয়া লইয়া গেছে। রাজকন্যা চন্দ্রাকেই তাহারা নিজেদের বধূ জ্ঞান করিয়া দ্রুতবেগে স্বদেশে যাত্রা করিল।

"তাহারা দরিদ্র ক্ষত্রিয়; কলিঙ্গে সমুদ্রতীরে তাহাদের বাস। সেখানে রাজকন্যার সহিত অন্যপক্ষের বরের মিলন হইল। বরের নাম চেৎ সিং।

"চেৎ সিংহের মা আসিয়া বরণ করিয়া বধূকে ঘরে তুলিয়া

লইলেন। আত্মীয়স্বজন সকলে আসিয়া কহিল, 'আহা, এমন রূপ তো দেখা যায় না।'

"মুগ্ধ চেৎ সিংহ নববধূকে ঘরের কল্যাণলক্ষ্মী বলিয়া মনে মনে পূজা করিতে লাগিল। রাজকন্যাও সতীধর্মের মর্যাদা বুঝিতেন—তিনি চেৎ সিংকে আপন পতি বলিয়া জানিয়া তাহার নিকট মনে মনে আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়া দিলেন।

"নবপরিণয়ের লজ্জা ভাঙিতে কিছুদিন গেল। যখন লজ্জা ভাঙিল, তখন কথায় কথায় চেৎ সিং জানিতে পারিল যে, যাহাকে সে বধূ বলিয়া ঘরে লইয়াছে, সে রাজকন্যা চন্দ্রা।"

২৬

কমলা রুদ্ধনিশ্বাসে একান্ত আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "তারপরে ?"

রমেশ কহিল, "এই পর্যন্তই জানি, তারপরে আর জানি না। তুমিই বলো দেখি, তারপরে কী!"

কমলা। না না, সে হইবে না, তারপরে কী আমাকে বলো।

রমেশ। সত্য বলিতেছি, যে-গ্রন্থ হইতে এই গল্প পাইয়াছি, তাহা এখনো সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় নাই— শেষের অধ্যায়গুলি কবে বাহির হইবে, কে জানে।

কমলা অত্যন্ত রাগ করিয়া কহিল, "যাও, তুমি ভারি দুষ্ট। তোমার ভারি অন্যায়।"

রমেশ। যিনি বই লিখিতেছেন, তাঁর সঙ্গে রাগারাগি করো। তোমাকে আমি কেবল এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি, "চন্দ্রাকে লইয়া চেৎ সিং কী করিবে।"

কমলা তখন নদীর দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল—অনেকক্ষণ পরে কহিল, "আমি জানি না, সে কী করিবে—আমি তো ভাবিয়া উঠিতে পারি না।"

রমেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল—কহিল, "চেৎ সিং কি সকল কথা চন্দ্রাকে প্রকাশ করিয়া বলিবে।"

কমলা কহিল, "তুমি বেশ যা হোক, না বলিয়া বুঝি সমস্ত গোলমাল করিয়া রাখিবে। সে যে বড়ো বিশ্রী। সমস্ত স্পষ্ট হওয়া চাই তো!"

রমেশ যন্ত্রের মতো কহিল, "তা তো চাই।"

রমেশ কিছুক্ষণ পরে কহিল, "আচ্ছা কমল, যদি—"

কমলা। যদি কী?

রমেশ। মনে করো, আমিই যদি সত্য চেৎ সিং হই, আর তুমি যদি চন্দ্রা হও—

কমলা বলিয়া উঠিল, "তুমি অমন কথা আমাকে বলিয়ো না; সত্য বলিতেছি, আমার ভালো লাগে না।"

রমেশ। না, তোমাকে বলিতেই হইবে।—তাহা হইলে আমারই বা কী কর্তব্য আর তোমারই বা কর্তব্য কী।

কমলা এ-কথার কোনো উত্তর না করিয়া চৌকি ছাড়িয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল। দেখিল, উমেশ তাহাদের কামরার বাহিরে চুপ করিয়া বসিয়া নদীর দিকে চাহিয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিল, "উমেশ, তুই কখনো ভূত দেখিয়াছিস।"

উমেশ কহিল, "দেখিয়াছি মা!"

শুনিয়া কমলা অনতিদূর হইতে একটা বেতের মোড়া টানিয়া আনিয়া বসিল—কহিল, "কী-রকম ভূত দেখিয়াছিলি বল্।"

কমলা বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেলে রমেশ তাহাকে ফিরিয়া ডাকিল

না। চন্দ্রখণ্ড তাহার চোখের সম্মুখে ঘন বাঁশবনের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল। ডেকের উপরকার আলো নিবাইয়া দিয়া তখন সারেং-খালাসিরা জাহাজের নিচের তলায় আহার ও বিশ্রামের চেষ্টায় গেছে। প্রথম-দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাত্রী কেহই ছিল না। তৃতীয় শ্রেণীর অধিকাংশ যাত্রী রন্ধনাদির ব্যবস্থা করিতে জল ভাঙিয়া ডাঙায় নামিয়া গেছে। তীরে তিমিরাচ্ছন্ন ঝোপঝাপ-গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে অদূরবর্তী বাজারের আলো দেখা যাইতেছে। পরিপূর্ণ নদীর খরস্রোত নোঙরের লোহার শিকলে ঝংকার দিয়া চলিয়াছে এবং থাকিয়া থাকিয়া জাহ্নবীর স্ফীত-নাড়ীর কম্পবেগ স্টীমারকে স্পন্দিত করিয়া তুলিতেছে।

এই অপরিস্ফুট বিপুলতা, এই অন্ধকারের নিবিড়তা, এই অপরিচিত দৃশ্যের প্রকাণ্ড অপূর্বতার মধ্যে নিমগ্ন হইয়া রমেশ তাহার কর্তব্যসমস্যা উদ্ভেদ করিতে চেষ্টা করিল। রমেশ বুঝিল যে, হেমনলিনী কিংবা কমলা, উভয়ের মধ্যে একজনকে বিসর্জন দিতেই হইবে। উভয়কেই রক্ষা করিয়া চলিবার কোনো মধ্যপথ নাই। তবু হেমনলিনীর আশ্রয় আছে— এখনো হেমনলিনী রমেশকে ভুলিতে পারে, সে আর-কাহাকেও বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু কমলাকে ত্যাগ করিলে এ-জীবনে তাহার আর-কোনো উপায় নাই।

মানুষের স্বার্থপরতার অন্ত নাই। হেমনলিনীর যে রমেশকে ভুলিবার সম্ভাবনা আছে, তাহার রক্ষার উপায় আছে— রমেশের সম্বন্ধে সে যে অনন্যগতি নহে, ইহাতে রমেশ কোনো সান্ত্বনা পাইল না, তাহার আগ্রহের অধীরতা দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। মনে হইল, এখনি হেমনলিনী তাহার সম্মুখ দিয়া যেন স্খলিত হইয়া, চিরদিনের মতো অনায়ত্ত হইয়া চলিয়া যাইতেছে, এখনো যেন বাহু বাড়াইয়া তাহাকে ধরিতে পারা যায়। দুই করতলের উপরে সে মুখ রাখিয়া ভাবিতে লাগিল। দূরে শৃগাল

ডাকিল, গ্রামে দুই-একটা অসহিষ্ণু কুকুর খেউ খেউ করিয়া উঠিল। রমেশ তখন করতল হইতে মুখ তুলিয়া দেখিল, কমলা জনশূন্য অন্ধকার ডেকের রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। রমেশ চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া গিয়া কহিল, "কমল, তুমি এখনো শুইতে যাও নাই? রাত তো কম হয় নাই।"

কমলা কহিল, "তুমি শুইতে যাইবে না?"

রমেশ কহিল, "আমি এখনি যাইব, পুবদিকের কামরায় আমার বিছানা হইয়াছে। তুমি আর দেরি করিয়ো না।"

কমলা আর-কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে তাহার নির্দিষ্ট কামরায় প্রবেশ করিল। সে আর রমেশকে বলিতে পারিল না যে, কিছুক্ষণ আগেই সে ভূতের গল্প শুনিয়াছে এবং তাহার কামরা নির্জন।

রমেশ কমলার অনিচ্ছুক মন্দপদবিক্ষেপে অন্তঃকরণে আঘাত পাইল— কহিল, "ভয় করিয়ো না কমল— তোমার কামরার পাশেই আমার কামরা— মাঝের দরজা খুলিয়া রাখিব।"

কমলা স্পর্ধাভরে তাহার শির একটুখানি উৎক্ষিপ্ত করিয়া কহিল, "আমি ভয় করিব কিসের।"

রমেশ তাহার কামরায় প্রবেশ করিয়া বাতি নিবাইয়া দিয়া শুইয়া পড়িল— মনে মনে কহিল, "কমলাকে পরিত্যাগ করিবার কোনো পথ নাই, অতএব হেমনলিনীকে বিদায়। আজ ইহাই স্থির হইল, আর দ্বিধা করা চলে না।"

হেমনলিনীকে বিদায় বলিতে যে জীবন হইতে কতখানি বিদায়, তাহা অন্ধকারের মধ্যে শুইয়া রমেশ অনুভব করিতে লাগিল। রমেশ আর বিছানায় চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না—উঠিয়া বাহিরে আসিল— নিশীথিনীর অন্ধকারে একবার অনুভব করিয়া লইল যে তাহারই লজ্জা,

তাহারই বেদনা অনন্ত দেশ ও অনন্ত কালকে আবৃত করিয়া নাই। আকাশ পূর্ণ করিয়া চিরকালের জ্যোতির্লোকসকল স্তব্ধ হইয়া আছে—রমেশ ও হেমনলিনীর ক্ষুদ্র ইতিহাসটুকু তাহাদিগকে স্পর্শও করিতেছে না— এই আশ্বিনের নদী তাহার নির্জন বালুতটে প্রফুল্ল কাশবনের তলদেশ দিয়া এমন কত নক্ষত্রালোকিত রজনীতে নিষুপ্ত গ্রামগুলির বনপ্রান্তচ্ছায়ায় প্রবাহিত হইয়া চলিবে,—যখন রমেশের জীবনের সমস্ত ধিক্‌কার শ্মশানের ভস্মমুষ্টির মধ্যে চিরধৈর্যময়ী ধরণীতে মিশাইয়া চিরদিনের মতো নীরব হইয়া গেছে।

২৭

পরদিন কমলা যখন ঘুম হইতে জাগিল, তখন ভোর-রাত্রি। চারি-দিকে চাহিয়া দেখিল, ঘরে কেহ নাই। মনে পড়িয়া গেল, সে জাহাজে আছে। আস্তে আস্তে উঠিয়া দরজা ফাঁক করিয়া দেখিল, নিস্তব্ধ জলের উপর সূক্ষ্ম একটুখানি শুভ্র কুয়াশার আচ্ছাদন পড়িয়াছে— অন্ধকার পাণ্ডুবর্ণ হইয়া আসিয়াছে এবং পূর্বদিকে তরুশ্রেণীর পশ্চাতের আকাশে স্বর্ণচ্ছটা ফুটিয়া উঠিতেছে। দেখিতে দেখিতে নদীর পাণ্ডুর নীলধারা জেলে-ডিঙির সাদা-সাদা পালগুলিতে খচিত হইয়া উঠিল।

কমলা কোনোমতেই ভাবিয়া পাইল না, তাহার মনের মধ্যে কী-একটা গূঢ় বেদনা পীড়ন করিতেছে। শরৎকালের এই শিশিরবাষ্পাম্বরা উষা কেন আজ তাহার আনন্দমূর্তি উদ্‌ঘাটন করিতেছে না। কেন একটা অশ্রুজলের আবেগ বালিকার বুকের ভিতর হইতে কণ্ঠ বাহিয়া চোখের কাছে বার বার আকুল হইয়া উঠিতেছে। তাহার শ্বশুর নাই, শাশুড়ী নাই, সঙ্গিনী নাই, স্বজন-পরিজন কেহই নাই, এ-কথা কাল তো

তাহার মনে ছিল না— ইতিমধ্যে কী ঘটিয়াছে, যাহাতে আজ তাহার মনে হইতেছে, একলা রমেশমাত্র তাহার সম্পূর্ণ নির্ভরস্থল নহে। কেন মনে হইতেছে, এই বিশ্বভুবন অত্যন্ত বৃহৎ এবং সে বালিকা অত্যন্ত ক্ষুদ্র।

কমলা অনেকক্ষণ দরজা ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নদীর জলপ্রবাহ তরল স্বর্ণস্রোতের মতো জ্বলিতে লাগিল। খালাসিরা তখন কাজে লাগিয়াছে, এঞ্জিন ধক ধক করিতে আরম্ভ করিয়াছে—নোঙর-তোলা ও জাহাজ-ঠেলাঠেলির শব্দে অকালজাগ্রত শিশুর দল নদীর তীরে ছুটিয়া আসিয়াছে।

এমন সময় রমেশ এই গোলমালে জাগিয়া উঠিয়া কমলার খবর লইবার জন্য তাহার দ্বারের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। কমলা চকিত হইয়া, আঁচল যথাস্থানে থাকা-সত্ত্বেও তাহা আর-একটু টানিয়া আপনাকে যেন বিশেষভাবে আচ্ছাদনের চেষ্টা করিল।

রমেশ কহিল, "কমলা, তোমার মুখ-হাত ধোওয়া হইয়াছে ?"

এই প্রশ্নে কেন যে কমলার রাগ হইতে পারে, তাহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে কিছুতেই বলিতে পারিত না। কিন্তু হঠাৎ রাগ হইল। সে অন্যদিকে মুখ করিয়া কেবল মাথা নাড়িল মাত্র।

রমেশ কহিল, "বেলা হইলে লোকজন উঠিয়া পড়িবে— এইবেলা তৈরি হইয়া লও না।"

কমলা তাহার কোনো উত্তর না করিয়া একখানি কোঁচানো শাড়ি গামছা ও একটি জামা চৌকির উপর হইতে তুলিয়া লইয়া দ্রুতপদে রমেশের পাশ দিয়া স্নানের ঘরে চলিয়া গেল।

রমেশ যে প্রাতঃকালে উঠিয়া কমলাকে এই যত্নটুকু করিতে আসিল, ইহা কমলার কাছে কেবল যে অত্যন্ত অনাবশ্যক বোধ হইল, তাহা

নহে, ইহা যেন তাহাকে অপমান করিল। রমেশের আত্মীয়তার সীমা যে কেবল খানিকটা দূর পর্যন্ত, এক জায়গায় আসিয়া তাহা যে বাধিয়া যায়, ইহা সহসা কমলা অনুভব করিতে পারিয়াছে। শ্বশুরবাড়ি কোনো গুরুজন তাহাকে লজ্জা করিতে শেখায় নাই— মাথায় কোনো অবস্থায় ঘোমটার পরিমাণ কতখানি হওয়া উচিত, তাহাও তাহার অভ্যস্ত হয় নাই, কিন্তু রমেশ সম্মুখে আসিতেই আজ কেন অকারণে তাহার বুকের ভিতরটা লজ্জায় কুণ্ঠিত হইতে লাগিল।

স্নান সারিয়া কমলা যখন তাহার কামরায় আসিয়া বসিল, তখন তাহার দিনের কর্ম তাহার সম্মুখবর্তী হইল। কাঁধের উপর হইতে আঁচলে-বাঁধা চাবির গোছা লইয়া কাপড়ের পোর্টম্যাণ্টো খুলিতেই তাহার মধ্যে ছোটো ক্যাশবাক্সটি নজরে পড়িল। এই ক্যাশবাক্সটি পাইয়া কাল কমলা একটি নূতন গৌরব লাভ করিয়াছিল। তাহার হাতে একটি স্বাধীন শক্তি আসিয়াছিল। তাই সে বহু যত্ন করিয়া বাক্সটি তাহার কাপড়ের তোরঙ্গের মধ্যে চাবি-বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। আজ কমলা সে-বাক্স হাতে তুলিয়া লইয়া উল্লাসবোধ করিল না। আজ এ-বাক্সকে ঠিক নিজের বাক্স মনে হইল না— ইহা রমেশেরই বাক্স। এ-বাক্সের মধ্যে কমলার পূর্ণস্বাধীনতা নাই। সুতরাং এ টাকার বাক্স কমলার পক্ষে একটা ভারমাত্র।

রমেশ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল, "খোলা বাক্সের মধ্যে কী হেঁয়ালির সন্ধান পাইয়াছ? চুপচাপ বসিয়া যে?"

কমলা ক্যাশবাক্স তুলিয়া ধরিয়া কহিল, "এই তোমার বাক্স।"

রমেশ কহিল, "ও আমি লইয়া কী করিব।"

কমলা কহিল, "তোমার যেমন দরকার, সেই বুঝিয়া আমাকে জিনিসপত্র আনাইয়া দাও।"

রমেশ। তোমার বুঝি কিছুই দরকার নাই ?

কমলা ঘাড় ঈষৎ বাঁকাইয়া কহিল, "টাকায় আমার কিসের দরকার !"

রমেশ হাসিয়া কহিল, "এতবড়ো কথাটা কয়জন লোক বলিতে পারে। যা হোক, যেটা তোমার এত অনাদরের জিনিস, সেইটেই কি পরকে দিতে হয়। আমি ও লইব কেন।"

কমলা কোনো উত্তর না করিয়া মেজের উপর ক্যাশবাক্স রাখিয়া দিল।

রমেশ কহিল, "আচ্ছা কমলা, সত্য করিয়া বলো, আমি আমার গল্প শেষ করি নাই বলিয়া তুমি আমার উপর রাগ করিয়াছ ?"

কমলা মুখ নিচু করিয়া কহিল, "রাগ কে করিয়াছে ?"

রমেশ। রাগ যে না করিয়াছে, সে ওই ক্যাশবাক্সটি রাখুক— তাহা হইলেই বুঝিব, তাহার কথা সত্য।

কমলা। রাগ না করিলেই বুঝি ক্যাশবাক্স রাখিতে হইবে ? তোমার জিনিস তুমি রাখো না কেন।

রমেশ। আমার জিনিস তো নয়— দিয়া কাড়িয়া লইলে যে মরিয়া ব্রহ্মদৈত্য হইতে হইবে। আমার বুঝি সে ভয় নাই।

রমেশের ব্রহ্মদৈত্য হইবার আশঙ্কায় কমলার হঠাৎ হাসি পাইয়া গেল। সে হাসিতে হাসিতে কহিল, "কক্‌খনো না। দিয়া কাড়িয়া লইলে বুঝি ব্রহ্মদৈত্য হইতে হয় ? আমি তো কখনো শুনি নাই।"

এই অকস্মাৎ হাসি হইতে সন্ধির সূত্রপাত হইল। রমেশ কহিল, "অন্যের কাছে কেমন করিয়া শুনিবে ? যদি কখনো কোনো ব্রহ্মদৈত্যের দেখা পাও, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই সত্যমিথ্যা জানিতে পারিবে।"

কমলা হঠাৎ কুতূহলী হইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, ঠাট্টা নয়—তুমি কখনো সত্যকার ব্রহ্মদৈত্য দেখিয়াছ?"

রমেশ কহিল, "সত্যকার নয়, এমন অনেক ব্রহ্মদৈত্য দেখিয়াছি। ঠিক খাটি জিনিসটি সংসারে দুর্লভ।"

কমলা। কেন, উমেশ যে বলে—

রমেশ। উমেশ? উমেশ ব্যক্তিটি কে।

কমলা। আঃ, ওই যে ছেলেটি আমাদের সঙ্গে যাইতেছে, ও নিজে ব্রহ্মদৈত্য দেখিয়াছে।

রমেশ। এ-সমস্ত বিষয়ে আমি উমেশের সমকক্ষ নহি, এ-কথা আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে।

ইতিমধ্যে বহুচেষ্টায় খালাসির দল জাহাজ ভাসাইয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। অল্প দূর গেছে, এমন সময়ে মাথায় একটা চাঙারি লইয়া একটা লোক তীর দিয়া ছুটিতে ছুটিতে হাত তুলিয়া জাহাজ থামাইবার জন্য অনুনয় করিতে লাগিল। সারেং তাহার ব্যাকুলতায় দৃক্‌পাত করিল না। তখন সে-লোকটা রমেশের প্রতি লক্ষ্য করিয়া "বাবু বাবু" করিয়া চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিল। রমেশ কহিল, "আমাকে লোকটা স্টীমারের টিকিটবাবু বলিয়া মনে করিয়াছে।" রমেশ তাহাকে দুই হাত ঘুরাইয়া জানাইয়া দিল, স্টীমার থামাইবার ক্ষমতা তাহার নাই।

হঠাৎ কমলা বলিয়া উঠিল, "ওই তো উমেশ। না না, ওকে ফেলিয়া যাইয়ো না—ওকে তুলিয়া লও।"

রমেশ কহিল, "আমার কথায় স্টীমার থামাইবে কেন।"

কমলা কাতর হইয়া কহিল, "না, তুমি থামাইতে বলো— বলো না তুমি— ডাঙা তো বেশি দূর নয়।"

রমেশ তখন সারেংকে গিয়া স্টীমার থামাইতে অনুরোধ করিল—সারেং কহিল, "বাবু, কোম্পানির নিয়ম নাই।"

কমলা বাহির হইয়া গিয়া কহিল, "উহাকে ফেলিয়া যাইতে পারিবে না—একটু থামাও। ও আমাদের উমেশ।"

রমেশ তখন নিয়মলঙ্ঘন ও আপত্তিভঞ্জনের সহজ উপায় অবলম্বন করিল। পুরস্কারের আশ্বাসে সারেং জাহাজ থামাইয়া উমেশকে তুলিয়া লইয়া তাহার প্রতি বহুতর ভর্ৎসনা প্রয়োগ করিতে লাগিল। সে তাহাতে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া কমলার পায়ের কাছে ঝুড়িটা নামাইয়া যেন কিছুই হয় নাই, এমনি ভাবে হাসিতে লাগিল।

কমলার তখনো বক্ষের ক্ষোভ দূর হয় নাই। সে কহিল, "হাসছিস যে। জাহাজ যদি না থামিত, তবে তোর কী হইত?"

উমেশ তাহার স্পষ্ট উত্তর না করিয়া ঝুড়িটা উজাড় করিয়া দিল। এক কাঁদি কাঁচকলা, কয়েক রকম শাক, কুমড়ার ফুল ও বেগুন বাহির হইয়া পড়িল।

কমলা জিজ্ঞাসা করিল, "এ-সমস্ত কোথা হইতে আনিলি।"

উমেশ সংগ্রহের যাহা ইতিহাস দিল, তাহা কিছুমাত্র সন্তোষজনক নহে। গতকল্য বাজার হইতে দধি প্রভৃতি কিনিতে যাইবার সময় সে গ্রামস্থ কাহারও বা চালে, কাহারও বা খেতে, এই সমস্ত ভোজ্যপদার্থ লক্ষ্য করিয়াছিল। আজ ভোরে জাহাজ ছাড়িবার পূর্বে তীরে নামিয়া এইগুলি যথাস্থান হইতে চয়ন-নির্বাচনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, কাহারও সম্মতির অপেক্ষা রাখে নাই।

রমেশ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "পরের খেত হইতে তুই এই সমস্ত চুরি করিয়া আনিয়াছিস?"

উমেশ কহিল, "চুরি করিব কেন। খেতে কত ছিল, আমি অল্প এই কটি আনিয়াছি বই তো নয়, ইহাতে ক্ষতি কী হইয়াছে।"

রমেশ। অল্প আনিলে চুরি হয় না? লক্ষ্মীছাড়া। যা, এ-সমস্ত এখান থেকে লইয়া যা।

উমেশ করুণনেত্রে একবার কমলার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "মা, এইগুলিকে আমাদের দেশে পিড়িং শাক বলে, ইহার চচ্চড়ি বড়ো সরেস হয়। আর এইগুলো বেতো শাক—"

রমেশ দ্বিগুণ বিরক্ত হইয়া কহিল, "নিয়ে যা তোর পিড়িং শাক। নহিলে আমি সমস্ত নদীর জলে ফেলিয়া দিব।"

এ-সম্বন্ধে কর্তব্যনিরূপণের জন্য সে কমলার মুখের দিকে চাহিল। কমলা লইয়া যাইবার জন্য সংকেত করিল। সেই সংকেতের মধ্যে করুণামিশ্রিত গোপন প্রসন্নতা দেখিয়া উমেশ শাকসবজিগুলি কুড়াইয়া চুপড়ির মধ্যে লইয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

রমেশ কহিল, "এ ভারি অন্যায়। ছেলেটাকে তুমি প্রশ্রয় দিয়ো না।"

রমেশ চিঠিপত্র লিখিবার জন্য তাহার কামরায় চলিয়া গেল। কমলা মুখ বাড়াইয়া দেখিল, সেকেণ্ড ক্লাসে ডেক পারাইয়া জাহাজের হালের দিকে যেখানে তাহাদের দরমা-ঢাকা রান্নার স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে, সেইখানে উমেশ চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

সেকেণ্ড ক্লাসে যাত্রী কেহ ছিল না। কমলা মাথায় গায়ে একটা র‍্যাপার জড়াইয়া উমেশের কাছে গিয়া কহিল, "সেগুলো সব ফেলিয়া দিয়াছিস নাকি।"

উমেশ কহিল, "ফেলিতে যাইব কেন। এই ঘরের মধ্যেই সব রাখিয়াছি।"

কমলা রাগিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "কিন্তু তুই ভারি অন্যায় করিয়াছিস। আর কখনো এমন কাজ করিসনে। দেখ্ দেখি, স্টীমার যদি চলিয়া যাইত।"

এই বলিয়া ঘরের মধ্যে গিয়া কমলা উদ্ধতস্বরে কহিল, "আন্, বঁটি আন্।"

উমেশ বঁটি আনিয়া দিল। কমলা সবেগে উমেশের আহৃত তরকারি কুটিতে প্রবৃত্ত হইল।

উমেশ। মা, এই শাকগুলার সঙ্গে সরষেবাটা খুব চমৎকার হয়।

কমলা ক্রুদ্ধস্বরে কহিল, "আচ্ছা, তবে সরষে বাট্।"

এমনি করিয়া উমেশ যাহাতে প্রশ্রয় না পায়, কমলা সেই সতর্কতা অবলম্বন করিল। বিশেষ গম্ভীরমুখে তাহার শাক, তাহার তরকারি, তাহার বেগুন কুটিয়া রান্না চড়াইয়া দিল।

হায়, এই গৃহচ্যুত ছেলেটাকে প্রশ্রয় না দিয়াই বা কমলা থাকে কী করিয়া। শাকচুরির গুরুত্ব যে কতখানি, তাহা কমলা ঠিক বোঝে না—কিন্তু নিরাশ্রয় ছেলের নির্ভর-লালসা যে কত একান্ত, তাহা তো সে বোঝে। ওই যে কমলাকে একটুখানি খুশি করিবার জন্য এই লক্ষ্মীছাড়া বালক, কাল হইতে এই কয়েকটা শাক সংগ্রহের অবসর খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল, আর-একটু হইলেই স্টীমার হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিল, ইহার করুণা কি কমলাকে স্পর্শ না করিয়া থাকিতে পারে।

কমলা কহিল, "উমেশ, তোর জন্যে কালকের সেই দই কিছু বাকি আছে, তোকে আজ আবার দই খাওয়াইব, কিন্তু খবরদার, এমন কাজ আর কখনো করিসনে।"

উমেশ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কহিল, "মা, তবে সে-দই তুমি কাল খাও নাই?"

কমলা কহিল, "তোর মতো দইয়ের উপর আমার অত লোভ নাই। কিন্তু উমেশ, সব তো হইল, মাছের জোগাড় কী হইবে। মাছ না পাইলে বাবুকে খাইতে দিব কী।"

উমেশ। মাছের জোগাড় করিতে পারি মা, কিন্তু সেটা তো মিনি পয়সায় হইবার জো নাই।

কমলা পুনরায় শাসনকার্যে প্রবৃত্ত হইল। তাহার সুন্দর দুটি ভ্রূ কুঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "উমেশ, তোর মতো নির্বোধ আমি তো দেখি নাই। আমি কি তোকে মিনি পয়সায় জিনিস সংগ্রহ করিতে বলিয়াছি।"

গতকল্য উমেশের মনে কী করিয়া একটা ধারণা হইয়া গেছে যে, কমলা রমেশের কাছ হইতে টাকা আদায় করাটা সহজ মনে করে না। তা ছাড়া, সবসুদ্ধ জড়াইয়া রমেশকে তাহার ভালো লাগে নাই। এই-জন্য রমেশের অপেক্ষা না রাখিয়া, কেবল সে এবং কমলা, এই দুই নিরুপায়ে মিলিয়া কী উপায়ে সংসার চালাইতে পারে, তাহার গুটিকতক সহজ কৌশল সে মনে মনে উদ্ভাবন করিতেছিল। শাক-বেগুন-কাঁচকলা সম্বন্ধে সে একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইয়াছিল, কিন্তু মাছটার বিষয়ে এখনো সে যুক্তি স্থির করিতে পারে নাই। পৃথিবীতে নিঃস্বার্থ ভক্তির জোরে সামান্য দই মাছ পর্যন্ত জোটানো যায় না, পয়সা চাই— সুতরাং কমলার এই অকিঞ্চন ভক্তবালকটার পক্ষে পৃথিবী সহজ জায়গা নহে।

উমেশ কিছু কাতর হইয়া কহিল, "মা, যদি বাবুকে বলিয়া কোনো-মতে গণ্ডা পাঁচেক পয়সা জোগাড় করিতে পার, তবে একটা বড়ো রুই আনিতে পারি।"

কমলা উদ্‌বিগ্ন হইয়া কহিল, "না না, তোকে আর স্টীমার হইতে

নামিতে দিব না, এবার তুই ডাঙায় পড়িয়া থাকিলে তোকে কেহ আর তুলিয়া লইবে না।"

উমেশ কহিল, "ডাঙায় নামিব কেন। আজ ভোরে খালাসিদের জালে খুব বড়ো মাছ পড়িয়াছে— এক-আধটা বেচিতেও পারে।"

শুনিয়া দ্রুতবেগে কমলা একটা টাকা আনিয়া উমেশের হাতে দিল— কহিল, "যাহা লাগে দিয়া বাকি ফিরাইয়া আনিস।"

উমেশ মাছ আনিল, কিন্তু কিছু ফিরাইয়া আনিল না, বলিল, "এক টাকার কমে কিছুতেই দিল না।"

কথাটা যে খাঁটি সত্য নহে, তাহা কমলা বুঝিল—একটু হাসিয়া কহিল, "এবার স্টীমার থামিলে টাকা ভাঙাইয়া রাখিতে হইবে।"

উমেশ গম্ভীরমুখে কহিল, "সেটা খুব দরকার। আস্ত টাকা একবার বাহির হইলে ফেরানো শক্ত।"

আহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া রমেশ কহিল, "বড়ো চমৎকার হইয়াছে। কিন্তু এ-সমস্ত জোটাইলে কোথা হইতে? এ যে রুইমাছের মুড়ো।"— বলিয়া মুড়োটা সযত্নে তুলিয়া ধরিয়া কহিল, "এ তো স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, মতিভ্রম নয়— এ যে সত্যই মুড়ো— যাহাকে বলে রোহিত মৎস্য, তাহারই উত্তমাঙ্গ।"

এইরূপে সেদিনকার মধ্যাহ্নভোজন বেশ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইল। রমেশ ডেকে আরাম-কেদারায় গিয়া পরিপাক-ক্রিয়ায় মনোযোগ দিল। কমলা তখন উমেশকে খাওয়াইতে বসিল। মাছের চচ্চড়িটা উমেশের এত ভালো লাগিল যে, ভোজনের উৎসাহটা কৌতুকাবহ না হইয়া ক্রমে আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিল। উৎকণ্ঠিত কমলা কহিল, "উমেশ, আর খাসনে। তোর জন্য চচ্চড়িটা রাখিয়া দিলাম, আবার রাত্রে খাইবি।"

এইরূপে দিবসের কর্মে ও হাস্যকৌতুকে প্রাতঃকালের হৃদয়ভারটা কখন্ যে দূর হইয়া গেল, তাহা কমলা জানিতে পারিল না।

ক্রমে দিন শেষ হইয়া আসিল। সূর্যের আলো বাঁকা হইয়া দীর্ঘতরচ্ছটায় পশ্চিমদিক হইতে জাহাজের ছাদ অধিকার করিয়া লইল। স্পন্দমান জলের উপর বৈকালের মন্দীভূত রৌদ্র ঝিকমিক করিতেছে। নদীর দুই তীরে নবীনশ্যাম শারদশস্যক্ষেত্রের মাঝখানকার সংকীর্ণ পথ দিয়া গ্রামরমণীরা গা ধুইবার জন্য ঘট কক্ষে করিয়া চলিয়া আসিতেছে।

কমলা পানসাজা শেষ করিয়া, চুল বাঁধিয়া, মুখ-হাত ধুইয়া, কাপড় ছাড়িয়া সন্ধ্যার জন্য যখন প্রস্তুত হইয়া লইল, সূর্য তখন গ্রামের বাঁশবন-গুলির পশ্চাতে অস্ত গিয়াছে। জাহাজ সেদিনকার মতো স্টেশন-ঘাটে নোঙর ফেলিয়াছে।

আজ কমলার রাত্রের রন্ধনব্যাপার তেমন বেশি নহে। সকালের অনেক তরকারি এ-বেলা কাজে লাগিবে। এমন সময় রমেশ আসিয়া কহিল, "মধ্যাহ্নে আজ গুরুভোজন হইয়াছে, এ-বেলা সে আহার করিবে না।"

কমলা বিমর্ষ হইয়া কহিল, "কিছু খাইবে না? শুধু কেবল মাছভাজা দিয়া—"

রমেশ সংক্ষেপে কহিল, "না, মাছভাজা থাক্।" বলিয়া চলিয়া গেল।

কমলা তখন উমেশের পাতে সমস্ত মাছভাজা ও চচ্চড়ি উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিল। উমেশ কহিল, "তোমার জন্য কিছু রাখিলে না?"

কমলা কহিল, "আমার খাওয়া হইয়া গেছে।"

এইরূপে কমলার এই ভাসমান ক্ষুদ্র সংসারের একদিনের সমস্ত কর্তব্য সম্পন্ন হইয়া গেল।

জ্যোৎস্না তখন জলে-স্থলে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তীরে গ্রাম নাই— ধানের খেতের ঘন-কোমল সুবিস্তীর্ণ সবুজ জনশূন্যতার উপরে নিঃশব্দ শুভ্ররাত্রি বিরহিণীর মতো জাগিয়া রহিয়াছে।

তীরে টিনের ছাদ-দেওয়া যে ক্ষুদ্র কুটিরে স্টীমার-আপিস, সেইখানে একটি শীর্ণদেহ কেরানি টুলের উপরে বসিয়া ডেস্কের উপর ছোটো কেরোসিনের বাতি লইয়া খাতা লিখিতেছিল। খোলা দরজার ভিতর দিয়া রমেশ সেই কেরানিটিকে দেখিতে পাইতেছিল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রমেশ ভাবিতেছিল, 'আমার ভাগ্য যদি আমাকে ওই কেরানিটির মতো একটি সংকীর্ণ অথচ সুস্পষ্ট জীবনযাত্রার মধ্যে বাঁধিয়া দিত— হিসাব লিখিতাম, কাজ করিতাম, কাজের ত্রুটি হইলে প্রভুর বকুনি খাইতাম, কাজ সারিয়া রাত্রে বাসায় যাইতাম— তবে আমি বাঁচিতাম— আমি বাঁচিতাম।'

ক্রমে আপিসঘরের আলো নিবিয়া গেল। কেরানি ঘরে তালা বন্ধ করিয়া হিমের ভয়ে মাথায় র‍্যাপার মুড়ি দিয়া নির্জন শস্যক্ষেত্রের মাঝখান দিয়া ধীরে ধীরে কোন্ দিকে চলিয়া গেল, আর দেখা গেল না।

কমলা যে অনেকক্ষণ ধরিয়া চুপ করিয়া জাহাজের রেল ধরিয়া পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ছিল, রমেশ তাহা জানিতে পারে নাই। কমলা মনে করিয়াছিল, সন্ধ্যাবেলায় রমেশ তাহাকে ডাকিয়া লইবে। এইজন্য কাজকর্ম সারিয়া যখন দেখিল, রমেশ তাহার খোঁজ লইতে আসিল না, তখন সে আপনি ধীরপদে জাহাজের ছাদে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু তাহাকে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইতে হইল, সে রমেশের কাছে যাইতে পারিল না। চাঁদের আলো রমেশের মুখের উপরে পড়িয়াছিল— সে মুখ

যেন দূরে,— বহুদূরে ; কমলার সহিত তাহার সংস্রব নাই। ধ্যানমগ্ন রমেশ এবং এই সঙ্গিবিহীনা বালিকার মাঝখানে যেন জ্যোৎস্না-উত্তরীয়ের দ্বারা আপাদমস্তক আচ্ছন্ন একটি বিরাট রাত্রি ওষ্ঠাধরের উপর তর্জনী রাখিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছে।

রমেশ যখন দুই হাতের মধ্যে মুখ ঢাকিয়া টেবিলের উপরে মুখ রাখিল, তখন কমলা ধীরে ধীরে তাহার কামরার দিকে গেল। পায়ের শব্দ করিল না, পাছে রমেশ টের পায় যে, কমলা তাহার সন্ধান লইতে আসিয়াছিল।

কিন্তু তাহার শুইবার কামরা নির্জন, অন্ধকার— প্রবেশ করিয়া তাহার বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল, নিজেকে একান্তই পরিত্যক্ত এবং একাকিনী বলিয়া মনে হইল— সেই ক্ষুদ্র কাঠের ঘরটা একটা-কোনো নিষ্ঠুর অপরিচিত জন্তুর হাঁ-করা মুখের মতো তাহার কাছে আপনার অন্ধকার মেলিয়া দিল। কোথায় সে যাইবে? কোন্‌খানে আপনার ক্ষুদ্র শরীরটি পাতিয়া দিয়া সে চোখ বুজিয়া বলিতে পারিবে, এই আমার আপনার স্থান?

ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়াই কমলা আবার বাহিরে আসিল। বাহিরে আসিবার সময় রমেশের ছাতাটা টিনের তোরঙ্গের উপর পড়িয়া গিয়া একটা শব্দ হইল। সেই শব্দে চকিত হইয়া রমেশ মুখ তুলিল এবং চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দেখিল, কমলা তাহার শুইবার কামরার সামনে দাঁড়াইয়া আছে। কহিল, "এ কী কমলা। আমি মনে করিয়াছিলাম, তুমি এতক্ষণে শুইয়াছ। তোমার কি ভয় করিতেছে নাকি। আচ্ছা, আমি আর বাহিরে বসিব না,— আমি এই পাশের ঘরেই শুইতে গেলাম— মাঝের দরজাটি বরঞ্চ খুলিয়া রাখিতেছি।"

কমলা উদ্ধতস্বরে কহিল, "ভয় আমি করি না।"—বলিয়া সবেগে

অন্ধকার ঘরের মধ্যে ঢুকিল এবং যে-দরজা রমেশ খোলা রাখিয়াছিল, তাহা সে বন্ধ করিয়া দিল। বিছানার উপরে আপনাকে নিক্ষেপ করিয়া মুখের উপরে একটা চাদর ঢাকিল— সে যেন জগতে আর-কাহাকেও না পাইয়া কেবল আপনাকে দিয়া আপনাকে নিবিড়ভাবে বেষ্টন করিল। তাহার সমস্ত হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। যেখানে নির্ভরতাও নাই, স্বাধীনতাও নাই, সেখানে প্রাণ বাঁচে কী করিয়া।

রাত্রি আর কাটে না। পাশের ঘরে রমেশ এতক্ষণে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বিছানার মধ্যে কমলা আর থাকিতে পারিল না। আস্তে আস্তে বাহিরে চলিয়া আসিল। জাহাজের রেলিং ধরিয়া তীরের দিকে চাহিয়া রহিল। কোথাও জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নাই— চাঁদ পশ্চিমের দিকে নামিয়া পড়িতেছে। দুই ধারের শস্যক্ষেত্রের মাঝখান দিয়া যে সংকীর্ণ পথ অদৃশ্য হইয়া গেছে, সেই দিকে চাহিয়া কমলা ভাবিতে লাগিল, এই পথ দিয়া কত মেয়ে জল লইয়া প্রত্যহ আপন ঘরে যায়। ঘর! ঘর বলিতেই তাহার প্রাণ যেন বুকের বাহিরে ছুটিয়া আসিতে চাহিল। একটুখানি মাত্র ঘর— কিন্তু সে-ঘর কোথায়! শূন্য তীর ধুধু করিতেছে— প্রকাণ্ড আকাশ দিগন্ত হইতে দিগন্ত পর্যন্ত স্তব্ধ। অনাবশ্যক আকাশ— অনাবশ্যক পৃথিবী— ক্ষুদ্র বালিকার পক্ষে এই অন্তহীন বিশালতা অপরিসীম অনাবশ্যক— কেবল তাহার একটিমাত্র ঘরের প্রয়োজন ছিল।

এমন সময় হঠাৎ কমলা চমকিয়া উঠিল— কে একজন তাহার অনতিদূরে দাঁড়াইয়া আছে।

"ভয় নাই মা, আমি উমেশ। রাত যে অনেক হইয়াছে, ঘুম নাই কেন।"

এতক্ষণ যে-অশ্রু পড়ে নাই, দেখিতে দেখিতে দুই চক্ষু দিয়া সেই অশ্রু উছলিয়া পড়িল। বড়ো বড়ো ফোঁটা কিছুতেই বাধা মানিল না,

কেবলই ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। ঘাড় বাঁকাইয়া কমলা উমেশের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া রহিল। জলভার বহিয়া মেঘ ভাসিয়া যাইতেছে,— যেমনি তাহারি মতো আর-একটা গৃহহারা হাওয়ার স্পর্শ লাগে, অমনি সমস্ত জলের বোঝা ঝরিয়া পড়ে;— এই গৃহহীন দরিদ্র বালকটার কাছ হইতে একটা যত্নের কথা শুনিবামাত্র কমলা আপনার বুকভরা অশ্রুর ভার আর রাখিতে পারিল না। একটা-কোনো কথা বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু রুদ্ধকণ্ঠ দিয়া কথা বাহির হইল না।

পীড়িতচিত্ত উমেশ কেমন করিয়া সান্ত্বনা দিতে হয়, ভাবিয়া পাইল না। অবশেষে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ এক সময়ে বলিয়া উঠিল, "মা, তুমি যে সেই টাকাটা দিয়াছিলে, তার থেকে সাত আনা বাঁচিয়াছে।"

তখন কমলার অশ্রুর ভার লঘু হইয়াছে। উমেশের এই খাপছাঁড়া সংবাদে সে একটুখানি স্নেহমিশ্রিত হাসি হাসিয়া কহিল, "আচ্ছা বেশ, সে তোর কাছে রাখিয়া দে। যা, এখন শুতে যা।"

চাঁদ গাছের আড়ালে নামিয়া পড়িল। এবার কমলা বিছানায় আসিয়া যেমন শুইল, অমনি তাহার দুই শ্রান্ত চক্ষু ঘুমে বুজিয়া আসিল— প্রভাতের রৌদ্র যখন তাহার ঘরের দ্বারে করাঘাত করিল, তখনো সে নিদ্রায় মগ্ন।

২৮

শ্রান্তির মধ্যে পরের দিন কমলার দিবসারম্ভ হইল। সেদিন তাহার চক্ষে সূর্যের আলোক ক্লান্ত, নদীর ধারা ক্লান্ত, তীরের তরুগুলি বহুদূর-পথের পথিকের মতো ক্লান্ত।

উমেশ যখন তাহার কাজে সহায়তা করিতে আসিল, কমলা শ্রান্ত-কণ্ঠে কহিল, "যা উমেশ, আমাকে আজ আর বিরক্ত করিসনে।"

উমেশ অল্পে ক্ষান্ত হইবার ছেলে নহে। সে কহিল, "বিরক্ত করিব কেন মা, বাটনা বাটিতে আসিয়াছি।"

সকালবেলা রমেশ কমলার চোখমুখের ভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "কমলা, তোমার কি অসুখ করিয়াছে।"

এরূপ প্রশ্ন যে কতখানি অনাবশ্যক ও অসংগত, কমলা কেবল তাহা একবার প্রবল গ্রীবা-আন্দোলনের দ্বারা নিরুত্তরে প্রকাশ করিয়া রান্না-ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

রমেশ বুঝিল, সমস্যা ক্রমশ প্রতিদিনই কঠিন হইয়া আসিতেছে। অতিশীঘ্রই ইহার একটা শেষ মীমাংসা হওয়া আবশ্যক। হেমনলিনীর সঙ্গে একবার স্পষ্ট বোঝাপড়া হইয়া গেলে কর্তব্যনির্ধারণ সহজ হইবে, ইহা রমেশ মনে মনে আলোচনা করিয়া দেখিল।

অনেক চিন্তার পর হেমকে চিঠি লিখিতে বসিল। একবার লিখিতেছে, একবার কাটিতেছে, এমন সময়, "মহাশয়, আপনার নাম ?" শুনিয়া চমকিয়া মুখ তুলিল। দেখিল, একটি প্রৌঢ়বয়স্ক ভদ্রলোক, পাকা গোঁফ ও মাথার সামনের দিকটায় পাতলা চুলে টাকের আভাস লইয়া সম্মুখে উপস্থিত। রমেশের একান্ত নিবিষ্ট চিত্তের মনোযোগ চিঠির চিন্তা হইতে অকস্মাৎ উৎপাটিত হইয়া ক্ষণকালের জন্য বিভ্রান্ত হইয়া রহিল।

"আপনি ব্রাহ্মণ ? নমস্কার। আপনার নাম রমেশবাবু— সে আমি পূর্বেই খবর লইয়াছি— তবু দেখুন, আমাদের দেশে নাম-জিজ্ঞাসাটা পরিচয়ের একটা প্রণালী। ওটা ভদ্রতা। আজকাল কেহ কেহ ইহাতে রাগ করেন। আপনি যদি রাগ করিয়া থাকেন তো শোধ তুলুন।

আমাকে জিজ্ঞাসা করুন, আমি নিজের নাম বলিব, বাপের নাম বলিব, পিতামহের নাম বলিতে আপত্তি করিব না।”

রমেশ হাসিয়া কহিল, “আমার রাগ এত বেশি ভয়ংকর নয়, আপনার একলার নাম পাইলেই আমি খুশি হইব।”

“আমার নাম ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী। পশ্চিমে সকলেই আমাকে ‘খুড়ো’ বলিয়া জানে। আপনি তো হিস্ট্রি পড়িয়াছেন? ভারতবর্ষে ভরত ছিলেন চক্রবর্তী রাজা— আমি তেমনি সমস্ত পশ্চিম মুল্লুকের চক্রবর্তী-খুড়ো। যখন পশ্চিমে যাইতেছেন, তখন আমার পরিচয় আপনার অগোচর থাকিবে না। কিন্তু মহাশয়ের কোথায় যাওয়া হইতেছে?”

রমেশ কহিল, “এখনো ঠিক করিয়া উঠিতে পারি নাই।”

ত্রৈলোক্য। আপনার ঠিক করিয়া উঠিতে বিলম্ব হয়, কিন্তু জাহাজে উঠিতে তো দেরি সহে নাই।

রমেশ কহিল, “একদিন গোয়ালন্দে নামিয়া দেখিলাম, জাহাজে বাঁশি দিয়াছে। তখন এটা বেশ বোঝা গেল, আমার মন স্থির করিতে যদি বা দেরি থাকে, কিন্তু জাহাজ ছাড়িতে দেরি নাই। সুতরাং যেটা তাড়াতাড়ির কাজ, সেইটেই তাড়াতাড়ি সারিয়া ফেলিলাম।”

ত্রৈলোক্য। নমস্কার মহাশয়। আপনার প্রতি আমার ভক্তি হইতেছে। আমাদের সঙ্গে আপনার অনেক প্রভেদ। আমরা আগে মতি স্থির করি, তাহার পরে জাহাজে চড়ি— কারণ আমরা অত্যন্ত ভীরুস্বভাব। আপনি যাইবেন এটা স্থির করিয়াছেন, অথচ কোথায় যাইবেন, কিছুই স্থির করেন নাই, এ কি কম কথা। পরিবার সঙ্গেই আছেন?”

‘হাঁ’ বলিয়া এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে রমেশের মুহূর্তকালের জন্য খটকা

বাধিল। তাহাকে নীরব দেখিয়া চক্রবর্তী কহিলেন, "আমাকে মাপ করিবেন— পরিবার সঙ্গে আছেন, সে-খবরটা আমি বিশ্বস্তসূত্রে পূর্বেই জানিয়াছি। বউমা ওই ঘরটাতে রাঁধিতেছেন, আমিও পেটের দায়ে রান্নাঘরের সন্ধানে সেইখানে গিয়া উপস্থিত। বউমাকে বলিলাম, 'মা, আমাকে দেখিয়া সংকোচ করিয়ো না— আমি পশ্চিম-মুল্লুকের একমাত্র চক্রবর্তী-খুড়ো।' আহা, মা যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। আমি আবার কহিলাম, 'মা, রান্নাঘরটি যখন দখল করিয়াছ, তখন অন্ন হইতে বঞ্চিত করিলে চলিবে না, আমি নিরুপায়।' মা একটুখানি মধুর হাসিলেন, বুঝিলাম প্রসন্ন হইয়াছেন, আজ আর আমার ভাবনা নাই। পাঁজিতে শুভক্ষণ দেখিয়া প্রতিবারই তো বাহির হই, কিন্তু এমন সৌভাগ্য ফি বারে ঘটে না। আপনি কাজে আছেন, আপনাকে আর বিরক্ত করিব না— যদি অনুমতি করেন তো বউমাকে একটু সাহায্য করি। আমরা উপস্থিত থাকিতে তিনি পদ্মহস্তে বেড়ি ধরিবেন কেন। না না, আপনি লিখুন— আপনাকে উঠিতে হইবে না— আমি পরিচয় করিয়া লইতে জানি।"

এই বলিয়া চক্রবর্তী-খুড়া বিদায় হইয়া রান্নাঘরের দিকে গেলেন। গিয়াই কহিলেন, "চমৎকার গন্ধ বাহির হইয়াছে— ঘণ্টটা যা হইবে, তা মুখে তুলিবার পূর্বেই বুঝা যাইতেছে। কিন্তু অম্বলটা আমি রাধিব মা— পশ্চিমের গরমে যাহারা বাস না করে, অম্বলটা তাহারা ঠিক দরদ দিয়া রাঁধিতে পারে না। তুমি ভাবিতেছ— বুড়াটা বলে কী— তেঁতুল নাই, অম্বল রাঁধিব কী দিয়া? কিন্তু আমি উপস্থিত থাকিতে তেঁতুলের ভাবনা তোমাকে ভাবিতে হইবে না। একটু সবুর করো, আমি সমস্ত যোগাড় করিয়া আনিতেছি।"

বলিয়া চক্রবর্তী কাগজে মোড়া একটা ভাঁড়ে কাসুন্দি আনিয়া

উপস্থিত করিলেন। কহিলেন, "আমি অম্বল যা রাঁধিব, তা আজকের মতো খাইয়া বাকিটা তুলিয়া রাখিতে হইবে, মজিতে ঠিক চার দিন লাগিবে। তারপরে একটুখানি মুখে তুলিয়া দিলেই বুঝিতে পারিবে, চক্রবর্তী-খুড়ো দেমাকও করে বটে, কিন্তু অম্বলও রাঁধে। যাও মা, এবার যাও, মুখ-হাত ধুইয়া লও গে। বেলা অনেক হইয়াছে। রান্না বাকি যা আছে, আমি শেষ করিয়া দিতেছি। কিছু সংকোচ করিয়ো না— আমার এ-সমস্ত অভ্যাস আছে মা— আমার পরিবারের শরীর বরাবর কাহিল— তাঁহারই অরুচি সারাইবার জন্য অম্বল রাঁধিয়া আমার হাত পাকিয়া গেছে। বুড়ার কথা শুনিয়া হাসিতেছ— কিন্তু ঠাট্টা নয়, মা, এ সত্য কথা।"

কমলা হাসিমুখে কহিল, "আমি আপনার কাছ থেকে অম্বল-রাঁধা শিখিব।"

চক্রবর্তী। ওরে বাসরে। বিদ্যা কি এত সহজে দেওয়া যায়। একদিনেই শিখাইয়া বিদ্যার গুমর যদি নষ্ট করি, তবে বীণাপাণি অপ্রসন্ন হইবেন। দু-চার দিন এ-বৃদ্ধকে খোশামোদ করিতে হইবে। আমাকে কী করিয়া খুশি করিতে হয়, সে তোমাকে ভাবিয়া বাহির করিতে হইবে না— আমি নিজে সমস্ত বিস্তারিত বলিয়া দিব। প্রথম দফায়— আমি পানটা কিছু বেশি খাই, কিন্তু সুপারি গোটা-গোটা থাকিলে চলিবে না। আমাকে বশীভূত করা সহজ ব্যাপার না— কিন্তু মার ওই হাসি-মুখখানিতে কাজ অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। ওরে, তোর নাম কী রে।"

উমেশ উত্তর দিল না। সে রাগিয়াছিল— তাহার মনে হইতেছিল, কমলার স্নেহ-রাজ্যে বৃদ্ধ তাহার শরিক হইয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কমলা তাহাকে মৌন দেখিয়া কহিল, "ওর নাম উমেশ।"

বৃদ্ধ কহিলেন, "এ-ছোকরাটি বেশ ভালো। একদমে ইহার মন পাওয়া যায় না, তাহা স্পষ্ট দেখিতেছি, কিন্তু দেখো মা, এর সঙ্গে আমার বনিবে। কিন্তু আর বেলা করিয়ো না, আমার রান্না হইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইবে না।"

কমলা যে একটা শূন্যতা অনুভব করিতেছিল, এই বৃদ্ধকে পাইয়া তাহা ভুলিয়া গেল।

রমেশও এই বৃদ্ধের আগমনে এখনকার মতো কতকটা নিশ্চিন্ত হইল। প্রথম কয়মাস যখন রমেশ কমলাকে আপন স্ত্রী বলিয়াই জানিত, তখন তাহার আচরণ, তখন পরস্পরের বাধাবিহীন নিকটবর্তিতা এখনকার হইতে এতই তফাত যে, এই হঠাৎ প্রভেদ বালিকার মনকে আঘাত না করিয়া থাকিতে পারে না। এমন সময়ে এই চক্রবর্তী আসিয়া রমেশের দিক হইতে কমলার চিন্তাকে যদি খানিকটা বিক্ষিপ্ত করিতে পারে, তবে রমেশ আপনার হৃদয়ের ক্ষতবেদনায় অখণ্ড মনোযোগ দিয়া বাঁচে।

অদূরে তাহার কামরার দ্বারের কাছে আসিয়া কমলা দাঁড়াইল। তাহার মনের ইচ্ছা কর্মহীন দীর্ঘমধ্যাহ্নটা সে চক্রবর্তীকে একাকী দখল করিয়া বসে। চক্রবর্তী তাহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "না না মা, এটা ভালো হইল না। এটা কিছুতেই চলিবে না।"

কমলা কী ভালো হইল না, কিছু বুঝিতে না পারিয়া আশ্চর্য ও কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল। বৃদ্ধ কহিলেন, "ওই যে ওই জুতোটা। রমেশবাবু, এটা আপনা কর্তৃকই হইয়াছে। যা বলেন, এটা আপনারা অধর্ম করিতেছেন—দেশের মাটিকে এই সকল চরণস্পর্শ হইতে বঞ্চিত করিবেন না, তা হইলে দেশ মাটি হইবে। রামচন্দ্র যদি সীতাকে ডসনের বুট পরাইতেন, তবে লক্ষ্মণ কি চোদ্দ বৎসর বনে ফিরিয়া বেড়াইতে

পারিতেন মনে করেন। কখনই না। আমার কথা শুনিয়া রমেশবাবু হাসিতেছেন— মনে মনে ঠিক পছন্দ করিতেন না! না করিবারই কথা। আপনারা জাহাজের বাঁশি শুনিলেই আর থাকিতে পারেন না, একেবারেই চড়িয়া বসেন, কিন্তু কোথায় যে যাইতেছেন, তাহা একবারও ভাবেন না।"

রমেশ কহিল, "খুড়ো, আপনিই না হয় আমাদের গম্যস্থানটা ঠিক করিয়া দিন না। জাহাজের বাঁশিটার চেয়ে আপনার পরামর্শ পাকা হইবে।"

চক্রবর্তী কহিলেন, "এই দেখুন, আপনার বিবেচনাশক্তি এরই মধ্যে উন্নতি লাভ করিয়াছে— অথচ অল্পক্ষণের পরিচয়। তবে আসুন, গাজিপুরে আসুন।—যাবে মা গাজিপুরে? সেখানে গোলাপের খেত আছে, আর সেখানে তোমার এই বৃদ্ধ ভক্তটাও থাকে।"

রমেশও কমলার মুখের দিকে চাহিল। কমলা তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

ইহার পরে উমেশ এবং চক্রবর্তীতে মিলিয়া লজ্জিত কমলার কামরায় সভাস্থাপন করিল। রমেশ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বাহিরেই রহিয়া গেল। মধ্যাহ্নে জাহাজ ধক ধক করিয়া চলিয়াছে। শারদরৌদ্ররঞ্জিত দুই তীরের শান্তিময় বৈচিত্র্য স্বপ্নের মতো চোখের উপর দিয়া পরিবর্তিত হইয়া চলিয়াছে। কোথাও বা ধানের খেত, কোথাও বা নৌকা-লাগানো ঘাট, কোথাও বা বালুর তীর, কোথাও বা গ্রামের গোয়াল, কোথাও বা গঞ্জের টিনের ছাদ, কোথাও বা প্রাচীন ছায়াবটের তলে খেয়াতরীর অপেক্ষী দুটি-চারটি পারের যাত্রী। এই শরৎমধ্যাহ্নের সুমধুর স্তব্ধতার মধ্যে অদূরে কামরার ভিতর হইতে যখন ক্ষণে ক্ষণে কমলার স্নিগ্ধকৌতুকহাস্য রমেশের কানে আসিয়া প্রবেশ করিল,

তখন তাহার বুকে বাজিতে লাগিল। সমস্তই কী সুন্দর, অথচ কী সুদূর। রমেশের আর্ত জীবনের সহিত কী নিদারুণ আঘাতে বিচ্ছিন্ন।

২৯

কমলার এখনো অল্প বয়স—কোনো সংশয়, আশঙ্কা বা বেদনা স্থায়ী হইয়া তাহার মনের মধ্যে টিঁকিয়া থাকিতে পারে না।

রমেশের ব্যবহারসম্বন্ধে এ-কয়দিন সে আর-কোনো চিন্তা করিবার অবকাশ পায় নাই। স্রোত যেখানে বাধা পায়, সেইখানে যত আবর্জনা আসিয়া জমে— কমলার চিত্তস্রোতের সহজ প্রবাহ রমেশের আচরণে হঠাৎ একটা জায়গায় বাধা পাইয়াছিল, সেইখানে আবর্ত রচিত হইয়া নানা কথা বার বার একই জায়গায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বৃদ্ধ চক্রবর্তীকে লইয়া হাসিয়া, বকিয়া, রাঁধিয়া, খাওয়াইয়া কমলার হৃদয়স্রোত আবার সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল— আবর্ত কাটিয়া গেল, যাহা-কিছু জমিতেছিল এবং ঘুরিতেছিল, তাহা সমস্ত ভাসিয়া গেল। সে আপনার কথা আর কিছুই ভাবিল না।

আশ্বিনের সুন্দর দিনগুলি নদীপথের বিচিত্র দৃশ্যগুলিকে রমণীয় করিয়া তাহারই মাঝখানে কমলার এই প্রতিদিনের আনন্দিত গৃহিণীপনাকে যেন সোনার জলের ছবির মাঝখানে এক-একটি সরল কবিতার পৃষ্ঠার মতো উল্‌টাইয়া যাইতে লাগিল।

কর্মের উৎসাহে দিন আরম্ভ হইত। উমেশ আজকাল আর স্টীমার ফেল করে না—কিন্তু তাহার ঝুড়ি ভর্তি হইয়া আসে। ক্ষুদ্র ঘরকন্নার মধ্যে উমেশের এই সকালবেলাকার ঝুড়িটা পরম কৌতূহলের বিষয়। "এ কী রে, এ যে লাউডগা। ওমা, শজনের খাড়া তুই কোথা হইতে

যোগাড় করিয়া অনিলি ? এই দেখো দেখো, খুড়োমশায়, টক-পালং যে এই খোট্টার দেশে পাওয়া যায়, তাহা তো আমি জানিতাম না।" ঝুড়ি লইয়া রোজ সকালে এইরূপ একটা কলরব উঠে। যেদিন রমেশ উপস্থিত থাকে, সেদিন ইহার মধ্যে একটু বেসুর লাগে—সে চৌর্য সন্দেহ না করিয়া থাকিতে পারে না। কমলা উত্তেজিত হইয়া বলে, "বাঃ, আমি নিজের হাতে উহাকে পয়সা গনিয়া দিয়াছি।"

রমেশ বলে, "তাহাতে উহার চুরির সুবিধা ঠিক দ্বিগুণ বাড়িয়া যায়। পয়সাটাও চুরি করে, শাকও চুরি করে।"

এই বলিয়া রমেশ উমেশকে ডাকিয়া বলে, "আচ্ছা, হিসাব দে দেখি।"

তাহাতে তাহার একবারের হিসাবের সঙ্গে আর-একবারের হিসাব মেলে না। ঠিক দিতে গেলে জমার চেয়ে খরচের অঙ্ক বেশি হইয়া উঠে ইহাতে উমেশ লেশমাত্র কুষ্ঠিত হয় না। সে বলে, "আমি যদি হিসাব ঠিক রাখিতে পারিব, তবে আমার এমন দশা হইবে কেন। আমি তো গোমস্তা হইতে পারিতাম, কী বলেন দাদাঠাকুর।"

চক্রবর্তী বলেন, "রমেশবাবু, আহারের পর আপনি উহার বিচার করিবেন, তাহা হইলে সুবিচার করিতে পারিবেন—আপাতত আমি এই ছোঁড়াটাকে উৎসাহ না দিয়া থাকিতে পারিতেছি না। উমেশ, বাবা, সংগ্রহ করার বিদ্যা কম বিদ্যা নয়—অল্প লোকেই পারে। চেষ্টা সকলেই করে— কৃতকার্য কয়জনে হয় ? রমেশবাবু, গুণীর মর্যাদা আমি বুঝি। শজনে-খাড়ার সময় এ নয়, তবু এত ভোরে বিদেশে শজনের খাড়া কয়জন ছেলে যোগাড় করিয়া আনিতে পারে বলুন দেখি। মশায়, সন্দেহ করিতে অনেকেই পারে— কিন্তু সংগ্রহ করিতে হাজারে একজন পারে।"

রমেশ। খুড়ো, এটা ভালো হইতেছে না, উৎসাহ দিয়া অন্যায় করিতেছেন।

চক্রবর্তী। ছেলেটার বিদ্যে বেশি নেই, যেটাও আছে, সেটাও যদি উৎসাহের অভাবে নষ্ট হইয়া যায় তো বড়ো আক্ষেপের বিষয় হইবে— অন্তত যে-কয়দিন আমরা স্টীমারে আছি। ওরে উমেশ, কাল কিছু নিমপাতা যোগাড় করিয়া আনিস—যদি উচ্ছে পাস, আরও ভালো হয়— মা, সুক্তুনিটা নিতান্তই চাই— আমাদের আয়ুর্বেদে বলে— থাক্‌, আয়ুর্বেদের কথা থাক্‌, এদিকে বিলম্ব হইয়া যাইতেছে। উমেশ, শাকগুলো বেশ করে ধুয়ে নিয়ে আয়।

রমেশ এইরূপে উমেশকে লইয়া যতই সন্দেহ করে, খিটখিট করে, উমেশ ততই যেন কমলার বেশি করিয়া আপনার হইয়া উঠে। ইতিমধ্যে চক্রবর্তী তাহার পক্ষ লওয়াতে রমেশের সহিত কমলার দলটি যেন বেশ একটু স্বতন্ত্র হইয়া আসিল। রমেশ তাহার সূক্ষ্ম বিচারশক্তি লইয়া এক দিকে একা, অন্য দিকে কমলা, উমেশ এবং চক্রবর্তী তাহাদের কর্মসূত্রে, স্নেহসূত্রে, আমোদ-আহ্লাদের সূত্রে ঘনিষ্ঠভাবে এক। চক্রবর্তী আসিয়া অবধি তাঁহার উৎসাহের সংক্রামক উত্তাপে রমেশ কমলাকে পূর্বাপেক্ষা বিশেষ ঔৎসুক্যের সহিত দেখিতেছে, কিন্তু তবু দলে মিশিতে পারিতেছে না। বড়ো জাহাজ যেমন ডাঙায় ভিড়িতে চায়, কিন্তু জল কম বলিয়া তাহাকে তফাতে নোঙর ফেলিয়া দূর হইতে তাকাইয়া থাকিতে হয়, এদিকে ছোটো ছোটো ডিঙি-পানসিগুলো অনায়াসেই তীরে গিয়া ভিড়ে, রমেশের সেই দশা হইয়াছে।

পূর্ণিমার কাছাকাছি একদিন সকালে উঠিয়া দেখা গেল, রাশি রাশি কালো মেঘ দলে দলে আকাশ পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। বাতাস এলোমেলো বহিতেছে। বৃষ্টি এক-একবার আসিতেছে, আবার

এক-একবার ধরিয়া গিয়া রৌদ্রের আভাসও দেখা যাইতেছে। মাঝগঙ্গায় আজ আর নৌকা নাই, দু-একখানা যা দেখা যাইতেছে, তাহাদের উৎকণ্ঠিত ভাব স্পষ্টই বুঝা যায়। জলার্থিনী মেয়েরা আজ ঘাটে অধিক বিলম্ব করিতেছে না। জলের উপরে মেঘবিচ্ছুরিত একটা রুদ্র আলোক পড়িয়াছে এবং ক্ষণে ক্ষণে নদী-নীর এক তীর হইতে আর-এক তীর পর্যন্ত শিহরিয়া উঠিতেছে।

স্টীমার যথানিয়মে চলিয়াছে। দুর্যোগের নানা অসুবিধার মধ্যে কোনোমতে কমলার রাঁধাবাড়া চলিতে লাগিল। চক্রবর্তী আকাশের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "মা, ও-বেলা যাহাতে রাঁধিতে না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তুমি খিচুড়ি চড়াইয়া দাও, আমি ইতিমধ্যে রুটি গড়িয়া রাখি।"

খাওয়াদাওয়া শেষ হইতে আজ অনেক বেলা হইল। দমকা হাওয়ার জোর ক্রমে বাড়িয়া উঠিল। নদী ফেনাইয়া ফেনাইয়া ফুলিতে লাগিল। সূর্য অস্ত গেছে কি না, বুঝা গেল না। সকাল-সকাল স্টীমার নোঙর ফেলিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। ছিন্নবিচ্ছিন্ন মেঘের মধ্য হইতে বিকারের পাংশুবর্ণ হাসির মতো একবার জ্যোৎস্নার আলো বাহির হইতে লাগিল। তুমুলবেগে বাতাস এবং মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

কমলা একবার জলে ডুবিয়াছে—ঝড়ের ঝাপটাকে সে অগ্রাহ্য করিতে পারে না। রমেশ আসিয়া তাহাকে আশ্বাস দিল, "স্টীমারে কোনো ভয় নাই কমলা। তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতে পার, আমি পাশের ঘরেই জাগিয়া আছি।"

দ্বারের কাছে আসিয়া চক্রবর্তী কহিলেন, "মা লক্ষ্মী, ভয় নাই, ঝড়ের বাপের সাধ্য কী, তোমাকে স্পর্শ করে।"

ঝড়ের বাপের সাধ্য কতদূর, তাহা নিশ্চয় বলা কঠিন, কিন্তু ঝড়ের সাধ্য যে কী, তাহা কমলার অগোচর নাই—সে তাড়াতাড়ি দ্বারের কাছে গিয়া ব্যগ্রস্বরে কহিল, "খুড়োমশায়, তুমি ঘরে আসিয়া বসো।"

চক্রবর্তী সসংকোচে কহিলেন, "তোমাদের যে এখন শোবার সময় হইল মা, আমি এখন—"

ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, রমেশ সেখানে নাই—আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, "রমেশবাবু এই ঝড়ে গেলেন কোথায়? শাকচুরি তো তাঁহার অভ্যাস নাই।"

"কে ও, খুড়ো নাকি। এই যে আমি পাশের ঘরেই আছি।"

পাশের ঘরে চক্রবর্তী উঁকি মারিয়া দেখিলেন, রমেশ বিছানায় অর্ধশয়ান অবস্থায় আলো জ্বালিয়া বই পড়িতেছে।

চক্রবর্তী কহিলেন, "বউমা যে একলা ভয়ে সারা হইলেন। আপনার বই তো ঝড়কে ডরায় না, ওটা এখন রাখিয়া দিলেও অন্যায় হয় না। আসুন এ-ঘরে।"

কমলা একটা দুর্নিবার আবেগবশে আত্মবিস্মৃত হইয়া তাড়াতাড়ি চক্রবর্তীর হাত দৃঢ়ভাবে চাপিয়া রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "না, না খুড়োমশায়! না, না।" ঝড়ের কল্লোলে কমলার এ-কথা রমেশের কানে গেল না, কিন্তু চক্রবর্তী বিস্মিত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

রমেশ বই রাখিয়া এ-ঘরে উঠিয়া আসিল। জিজ্ঞাসা করিল, "কী চক্রবর্তী-খুড়ো, ব্যাপার কী। কমলা বুঝি আপনাকে—"

কমলা রমেশের মুখের দিকে না চাহিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "না, না, আমি উঁহাকে কেবল গল্প বলিবার জন্য ডাকিয়াছিলাম।"

কিসের প্রতিবাদে যে কমলা "না না" বলিল তাহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিতে পারিত না। এই "না"র অর্থ এই যে,

যদি মনে কর আমার ভয় ভাঙাইবার দরকার আছে— না, দরকার নাই! যদি মনে কর আমাকে সঙ্গ দিবার প্রয়োজন— না, প্রয়োজন নাই।

পরক্ষণেই কমলা কহিল, "খুড়োমশায়, রাত হইয়া যাইতেছে, আপনি শুইতে যান, একবার উমেশের খবর লইবেন, সে হয়তো ভয় পাইতেছে।"

দরজার কাছ হইতে একটা আওয়াজ আসিল, "মা, আমি কাহাকেও ভয় করি না।"

উমেশ মুড়িসুড়ি দিয়া কমলার দ্বারের কাছে বসিয়া আছে। কমলার হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল— সে তাড়াতাড়ি বাহিরে গিয়া কহিল, "হ্যাঁ রে উমেশ, তুই ঝড়-জলে ভিজিতেছিস কেন। লক্ষ্মীছাড়া কোথাকার, যা, খুড়োমশায়ের সঙ্গে শুইতে যা।"

কমলার মুখে লক্ষ্মীছাড়া-সম্বোধনে উমেশ বিশেষ পরিতৃপ্ত হইয়া চক্রবর্তী-খুড়ার সঙ্গে শুইতে গেল।

রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, "যতক্ষণ না ঘুম আসে, আমি বসিয়া গল্প করিব কি।"

কমলা কহিল, "না, আমার ভারি ঘুম পাইয়াছে!"

রমেশ কমলার মনের ভাব যে না বুঝিল, তাহা নয়, কিন্তু সে আর দ্বিরুক্তি করিল না— কমলার অভিমানক্ষুণ্ণ মুখের দিকে তাকাইয়া সে ধীরে ধীরে আপন কক্ষে চলিয়া গেল।

বিছানার মধ্যে স্থির হইয়া ঘুমের অপেক্ষায় পড়িয়া থাকিতে পারে, এমন শান্তি কমলার মনে ছিল না। তবু সে জোর করিয়া শুইল। ঝড়ের বেগের সঙ্গে জলের কল্লোল ক্রমে বাড়িয়া উঠিল। খালাসিদের গোলমাল শোনা যাইতে লাগিল। মাঝে মাঝে এঞ্জিন-ঘরে সারেঙের

আদেশসূচক ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। প্রবল বায়ুবেগের বিরুদ্ধে জাহাজকে স্থির রাখিবার জন্য নোঙর-বাঁধা অবস্থাতেও এঞ্জিন ধীরে ধীরে চলিতে থাকিল।

কমলা বিছানা ছাড়িয়া কামরার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ক্ষণকালের জন্য বৃষ্টির বিশ্রাম হইয়াছে, কিন্তু ঝড়ের বাতাস শরবিদ্ধ জন্তুর মতো চীৎকার করিয়া দিগ্‌বিদিকে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। মেঘসত্ত্বেও শুক্লচতুর্দশীর আকাশ ক্ষীণ আলোকে অশান্ত সংহারমূর্তি অপরিস্ফুটভাবে প্রকাশ করিতেছে। তীর স্পষ্ট লক্ষ্য হইতেছে না, নদী ঝাপসা দেখা যাইতেছে, কিন্তু উর্ধ্বে নিম্নে, দূরে নিকটে, দৃশ্যে অদৃশ্যে একটা মূঢ় উন্মত্ততা, একটা অন্ধ আন্দোলন যেন অদ্ভুত মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া যমরাজের উদ্যতশৃঙ্গ কালো মহিষটার মতো মাথা-ঝাঁকা দিয়া দিয়া উঠিতেছে।

এই পাগল রাত্রি, এই আকুল আকাশের দিকে চাহিয়া কমলার বুকের ভিতরটা যে দুলিতে লাগিল, তাহা ভয়ে কি আনন্দে, নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। এই প্রলয়ের মধ্যে যে একটা বাধাহীন শক্তি, একটা বন্ধনহীন স্বাধীনতা আছে, তাহা যেন কমলার হৃদয়ের মধ্যে একটা সুপ্ত সঙ্গিনীকে জাগাইয়া তুলিল। এই বিশ্বব্যাপী বিদ্রোহের বেগ কমলার চিত্তকে বিচলিত করিল। কিসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, তাহার উত্তর কি এই ঝড়ের গর্জনের মধ্যে পাওয়া যায়। না, তাহা কমলার হৃদয়াবেগেরই মতো অব্যক্ত। একটা কোন্ অনির্দিষ্ট, অমূর্ত মিথ্যার স্বপ্নের, অন্ধকারের জাল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া বাহির হইয়া আসিবার জন্য আকাশ-পাতালে এই মাতামাতি, এই রোষগর্জিত ক্রন্দন। পথহীন প্রান্তরের প্রান্ত হইতে বাতাস কেবল "না না" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে নিশীথরাত্রে ছুটিয়া আসিতেছে—একটা কেবল প্রচণ্ড অস্বীকার।

—কিসের অস্বীকার ?—তাহা নিশ্চয় বলা যায় না— কিন্তু না, কিছুতেই না, না, না, না।

৩০

পরদিন প্রাতে ঝড়ের বেগ কিছু কমিয়াছে, কিন্তু একেবারে থামে নাই—নোঙর তুলিবে কি না, এখনো তাহা সারেং ঠিক করিতে পারে নাই, উদ্‌বিগ্নমুখে আকাশের দিকে তাকাইতেছে।

সকালেই চক্রবর্তী রমেশের সন্ধানে কমলার পাশের কামরায় প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, রমেশ তখনো বিছানায় পড়িয়া আছে, চক্রবর্তীকে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। এই ঘরে রমেশের শয়নাবস্থা দেখিয়া চক্রবর্তী গতরাত্রির ঘটনার সঙ্গে মনে মনে সমস্তটা মিলাইয়া লইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল রাত্রে বুঝি এই ঘরেই শোওয়া হইয়াছিল।"

রমেশ এই প্রশ্নের উত্তর এড়াইয়া কহিল, "এ কী দুর্যোগ আরম্ভ হইয়াছে। কাল রাত্রে খুড়োর ঘুম কেমন হইল।"

চক্রবর্তী কহিলেন, "রমেশবাবু, আমাকে নির্বোধের মতো দেখিতে, আমার কথাবার্তাও সেই প্রকারের, তবু এই বয়সে আমাকে অনেক দুরূহ বিষয়ের চিন্তা করিতে হইয়াছে এবং তাহার অনেকগুলার মীমাংসাও পাইয়াছি— কিন্তু আপনাকে সবচেয়ে দুরূহ বলিয়া ঠেকিতেছে।"

মুহূর্তের জন্য রমেশের মুখ ঈষৎ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, পরক্ষণেই আত্মসংবরণ করিয়া একটুখানি হাসিয়া কহিল, "দুরূহ হওয়াটাই যে সব সময়ে অপরাধের, তা নয় খুড়ো। তেলেগু ভাষার শিশুপাঠও দুরূহ, কিন্তু তৈলঙ্গের বালকের কাছে তাহা জলের মতো সহজ—যাহাকে না বুঝিবেন তাহাকে তাড়াতাড়ি দোষ দিবেন না এবং যে-অক্ষর না বোঝেন,

কেবলমাত্র তাহার উপরে অনিমেষ চক্ষু রাখিলেই যে তাহা কোনোকালে বুঝিতে পারিবেন, এমন আশা করিবেন না।”

বৃদ্ধ কহিলেন, “আমাকে মাপ করিবেন রমেশবাবু। আমার সঙ্গে যাহার বোঝাপড়ার কোনো সম্পর্ক নাই, তাহাকে বুঝিতে চেষ্টা করাই ধৃষ্টতা। কিন্তু পৃথিবীতে দৈবাৎ এমন এক-একটি মানুষ মেলে, দৃষ্টিপাত-মাত্রই যাহার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির হইয়া যায়—তার সাক্ষী, আপনি ওই দেড়ে সারেংটাকে জিজ্ঞাসা করুন,— বউমার সঙ্গে ওর আত্মীয়সম্বন্ধ ওকে এখনি স্বীকার করিতে হইবে— ওর ঘাড় করিবে— না করে তো ওকে আমি মুসলমান বলিব না। এমন অবস্থায় হঠাৎ মাঝখানে তেলেগু ভাষা আসিয়া পড়িলে ভারি মুশকিলে পড়িতে হয়। শুধু শুধু রাগ করিলে চলিবে না রমেশবাবু, কথাটা ভাবিয়া দেখিবেন।

রমেশ কহিল, “ভাবিয়া দেখিতেছি বলিয়াই তো রাগ করিতে পারিতেছি না— কিন্তু আমি রাগ করি আর না করি, আপনি দুঃখ পান আর না পান, তেলেগু ভাষা তেলেগুই থাকিয়া যাইবে— প্রকৃতির এইরূপ নিষ্ঠুর নিয়ম।” এই বলিয়া রমেশ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

ইতিমধ্যে রমেশ চিন্তা করিতে লাগিল, গাজিপুরে যাওয়া উচিত কি না। প্রথমে সে ভাবিয়াছিল, অপরিচিত স্থানে বাস স্থাপন করার পক্ষে বৃদ্ধের সহিত পরিচয় তাহার কাজে লাগিবে। কিন্তু এখন মনে হইল, পরিচয়ের অসুবিধাও আছে। কমলার সহিত তাহার সম্বন্ধ আলোচনা ও অনুসন্ধানের বিষয় হইয়া উঠিলে একদিন তাহা কমলার পক্ষে নিদারুণ হইয়া দাঁড়াইবে। তার চেয়ে যেখানে সকলেই অপরিচিত, যেখানে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার কেহ নাই, সেইখানে আশ্রয় লওয়াই ভালো।

গাজিপুরে পৌঁছিবার আগের দিনে রমেশ চক্রবর্তীকে কহিল,

"খুড়ো, গাজিপুর আমার প্র্যাকটিসের পক্ষে অনুকূল বলিয়া বুঝিতেছি না, আপাতত কাশীতে যাওয়াই আমি স্থির করিয়াছি।"

রমেশের কথার মধ্যে নিঃসংশয়ের সুর শুনিয়া বৃদ্ধ হাসিয়া কহিলেন, "বার বার ভিন্ন ভিন্ন রকম স্থির করাকে স্থির করা বলে না— সে তো অস্থির করা। যা হউক, এই কাশী যাওয়াটা এখনকার মতো আপনার শেষ স্থির?"

রমেশ সংক্ষেপে কহিল, "হাঁ।"

বৃদ্ধ কোনো উত্তর না করিয়া চলিয়া গেলেন এবং জিনিসপত্র বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কমলা আসিয়া কহিল, "খুড়ো মশায়, আজ কি আমার সঙ্গে আড়ি।"

বৃদ্ধ কহিলেন, "ঝগড়া তো দুই বেলাই হয়, কিন্তু একদিনও তো জিতিতে পারিলাম না।"

কমলা। আজ যে সকাল হইতে তুমি পালাইয়া বেড়াইতেছ?

চক্রবর্তী। তোমরা যে মা আমার চেয়ে বড়ো-রকমের পলায়নের চেষ্টায় আছ, আর আমাকে পলাতক বলিয়া অপবাদ দিতেছ?

কমলা কথাটা না বুঝিয়া চাহিয়া রহিল। বৃদ্ধ কহিলেন, "রমেশবাবু তবে কি এখনো বলেন নাই। তোমাদের যে কাশী যাওয়া স্থির হইয়াছে।"

শুনিয়া কমলা হাঁ-না কিছুই বলিল না। কিছুক্ষণ পরে কহিল, "খুড়োমশায়, তুমি পারিবে না, দাও, তোমার বাক্স আমি সাজাইয়া দিই।"

কাশী যাওয়া সম্বন্ধে কমলার এই ঔদাসীন্যে চক্রবর্তী হৃদয়ের মধ্যে একটা গভীর আঘাত পাইলেন। মনে মনে ভাবিলেন, "ভালোই হইতেছে, আমার মতো বয়সে আবার নূতন জাল জড়ানো কেন।"

ইতিমধ্যে কাশী যাওয়ার কথা কমলাকে জানাইবার জন্য রমেশ আসিয়া উপস্থিত হইল। কহিল, "আমি তোমাকে খুঁজিতেছিলাম।"

কমলা চক্রবর্তীর কাপড়চোপড় ভাঁজ করিয়া গুছাইতে লাগিল। রমেশ কহিল, "কমলা, এবার আমাদের গাজিপুরে যাওয়া হইল না—আমি স্থির করিয়াছি, কাশীতে গিয়া প্র্যাকটিস করিব। তুমি কী বল?"

কমলা চক্রবর্তীর বাক্স হইতে চোখ না তুলিয়া কহিল, "না, আমি গাজিপুরেই যাইব। আমি সমস্ত জিনিসপত্র গুছাইয়া লইয়াছি।"

কমলার এই দ্বিধাহীন উত্তরে রমেশ কিছু আশ্চর্য হইয়া গেল—কহিল, "তুমি কি একলাই যাইবে নাকি।"

কমলা চক্রবর্তীর মুখের দিকে তাহার স্নিগ্ধ চক্ষু তুলিয়া কহিল, "কেন, সেখানে তো খুড়োমশায় আছেন।"

কমলার এই কথায় চক্রবর্তী কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন—কহিলেন, "মা, তুমি যদি সন্তানের প্রতি এতদূর পক্ষপাত দেখাও, তাহা হইলে রমেশবাবু আমাকে দু-চক্ষে দেখিতে পারিবেন না।"

ইহার উত্তরে কমলা কেবল কহিল, "আমি গাজিপুরে যাইব।"

এ-সম্বন্ধে যে কাহারও কোনো সম্মতির অপেক্ষা আছে, কমলার কণ্ঠস্বরে এরূপ প্রকাশ পাইল না।

রমেশ কহিল, "খুড়ো, তবে গাজিপুরই স্থির।"

ঝড়জলের পর সেদিন রাত্রে জ্যোৎস্না পরিষ্কার হইয়া ফুটিয়াছে। রমেশ ডেকের কেদারায় বসিয়া ভাবিতে লাগিল, "এমন করিয়া আর চলিবে না। ক্রমেই বিদ্রোহী কমলাকে লইয়া জীবনের সমস্যা অত্যন্ত দুরূহ হইয়া উঠিবে। এমন করিয়া কাছে থাকিয়া দূরত্বরক্ষা করা দুরূহ। এবারে হাল ছাড়িয়া দিব। কমলাই আমার স্ত্রী— আমি তো উহাকে

স্ত্রী বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলাম। মন্ত্র পড়া হয় নাই বলিয়াই কোনো সংকোচ করা অন্যায়। যমরাজ সেদিন কমলাকে বধূরূপে আমার পার্শ্বে আনিয়া দিয়া সেই নির্জন সৈকতদ্বীপে স্বয়ং গ্রন্থিবন্ধন করিয়া দিয়াছেন—তাঁহার মতো এমন পুরোহিত জগতে কোথায় আছে।"

হেমনলিনী এবং রমেশের মাঝখানে একটা যুদ্ধক্ষেত্র পড়িয়া আছে। বাধা-অপমান-অবিশ্বাস কাটিয়া যদি রমেশ জয়ী হইতে পারে, তবেই সে মাথা তুলিয়া হেমনলিনীর পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইতে পারিবে। সেই যুদ্ধের কথা মনে হইলে তাহার ভয় হয়— জিতিবার কোনো আশা থাকে না। কেমন করিয়া প্রমাণ করিবে? এবং প্রমাণ করিতে হইলে সমস্ত ব্যাপারটা লোকসাধারণের কাছে এমন কদর্য এবং কমলার পক্ষে এমন সাংঘাতিক আঘাতকর হইয়া উঠিবে যে, সে-সংকল্প মনে স্থান দেওয়া কঠিন।

অতএব দুর্বলের মতো আর দ্বিধা না করিয়া কমলাকে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিলেই সকল দিকে শ্রেয় হইবে। হেমনলিনী তো রমেশকে ঘৃণা করিতেছে— এই ঘৃণাই তাহাকে উপযুক্ত সৎপাত্রে চিত্তসমর্পণ করিতে আনুকূল্য করিবে। এই ভাবিয়া রমেশ একটা দীর্ঘনিশ্বাসের দ্বারা সেইদিককার আশাটাকে ভূমিসাৎ করিয়া দিল।

৩১

রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, "কী রে, তুই কোথায় চলিয়াছিস।"

উমেশ কহিল, "আমি মাঠাকরুনের সঙ্গে যাইতেছি।"

রমেশ। আমি যে তোর কাশী পর্যন্ত টিকিট করিয়া দিয়াছি। এ যে গাজিপুরের ঘাট। আমরা তো কাশী যাইব না।

উমেশ। আমিও যাইব না।

উমেশ যে তাহাদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে পড়িবে, এরূপ আশঙ্কা রমেশের মনে ছিল না— কিন্তু ছোঁড়াটার অবিচলিত দৃঢ়তা দেখিয়া রমেশ স্তম্ভিত হইল। কমলাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কমলা, উমেশকেও লইতে হইবে নাকি।"

কমলা কহিল, "না, লইলে ও কোথায় যাইবে।"

রমেশ। কেন, কাশীতে ওর আত্মীয় আছে।

কমলা। না, ও আমাদেরই সঙ্গে যাইবে বলিয়াছে। উমেশ, দেখিস, তুই খুড়োমশায়ের সঙ্গে সঙ্গে থাকিস, নহিলে বিদেশে ভিড়ের মধ্যে কোথায় হারাইয়া যাইবি।

কোন্ দেশে যাইতে হইবে, কাহাকে সঙ্গে লইতে হইবে, এ-সমস্ত মীমাংসার ভার কমলা একলাই লইয়াছে। রমেশের ইচ্ছা-অনিচ্ছার বন্ধন পূর্বে কমলা নম্রভাবে স্বীকার করিত, হঠাৎ এই শেষ কয়দিনের মধ্যে তাহা যেন সে কাটাইয়া উঠিয়াছে।

অতএব উমেশও তাহার ক্ষুদ্র একটি কাপড়ের পুঁটুলি কক্ষে লইয়া চলিল, এ সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা হইল না।

শহর এবং সাহেবপাড়ার মাঝামাঝি একটা জায়গায় খুড়োমশায়ের একটি ছোটো বাংলা। তাহার পশ্চাতে আমবাগান, সম্মুখে বাঁধানো কূপ— সামনের দিকে অনুচ্চ প্রাচীরের বেষ্টন— কূপের সিঞ্চিত জলে কপি-কড়াইশুঁটির খেত শ্রীবৃদ্ধিলাভ করিয়াছে।

প্রথম দিনে কমলা ও রমেশ এই বাংলাতে গিয়াই উঠিল।

চক্রবর্তী-খুড়ার স্ত্রী হরিভাবিনীর শরীর কাহিল বলিয়া খুড়া লোক-সমাজে প্রচার করেন, কিন্তু তাঁহার দৌর্বল্যের বাহ্লক্ষণ কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার বয়স নিতান্ত অল্প নহে, কিন্তু শক্তসমর্থ

চেহারা। সামনের কিছু-কিছু চুল পাকিয়াছে, কিন্তু কাঁচার অংশই বেশি। তাঁহার সম্বন্ধে জরা যেন কেবলমাত্র ডিক্রী পাইয়াছে, কিন্তু দখল পাইতেছে না।

আসল কথা, এই দম্পতিটি যখন তরুণ ছিলেন, তখন হরিভাবিনীকে ম্যালেরিয়ায় খুব শক্ত করিয়া ধরে। বায়ু পরিবর্তন ছাড়া আর-কোনো উপায় না দেখিয়া চক্রবর্তী গাজিপুর ইস্কুলের মাস্টারি যোগাড় করিয়া এখানে আসিয়া বাস করেন। স্ত্রী সম্পূর্ণ সুস্থ হইলেও তাঁহার স্বাস্থের প্রতি চক্রবর্তীর কিছুমাত্র আস্থা জন্মে নাই।

অতিথিদিগকে বাহিরের ঘরে বসাইয়া চক্রবর্তী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন, "সেজবউ।"

সেজবউ তখন প্রাচীরবেষ্টিত প্রাঙ্গণে রামকৌলিকে দিয়া গম ভাঙাইতেছিলেন এবং ছোটোবড়ো নানাপ্রকার ভাঁড়ে ও হাঁড়িতে নানাজাতীয় চাটনি রৌদ্রে সাজাইতেছিলেন।

চক্রবর্তী আসিয়াই কহিলেন, "এই বুঝি! ঠাণ্ডা পড়িয়াছে— গায়ে একখানা র‍্যাপার দিতে নাই?"

হরিভাবিনী। তোমার সকল অনাসৃষ্টি। ঠাণ্ডা আবার কোথায় —রৌদ্রে পিঠ পুড়িতেছে।

চক্রবর্তী। সেটাই কি ভালো। ছায়া জিনিসটা তো দুর্মূল্য নয়।

হরিভাবিনী। আচ্ছা সে হবে— তুমি আসিতে এত দেরি করিলে কেন।

চক্রবর্তী। সে অনেক কথা। আপাতত ঘরে অতিথি উপস্থিত। সেবার আয়োজন করিতে হইবে।

এই বলিয়া চক্রবর্তী অভ্যাগতদের পরিচয় দিলেন। চক্রবর্তীর

ঘরে হঠাৎ এরূপ বিদেশী অতিথির সমাগম প্রায়ই ঘটিয়া থাকে, কিন্তু সস্ত্রীক অতিথির জন্য হরিভাবিনী প্রস্তুত ছিলেন না—তিনি কহিলেন, "ও মা, তোমার এখানে ঘর কোথায় ?"

চক্রবর্তী কহিলেন, "আগে তো পরিচয় হউক, তারপরে ঘরের কথা পরে হইবে। আমাদের শৈল কোথায় ?"

হরিভাবিনী। সে তাহার ছেলেকে স্নান করাইতেছে।

চক্রবর্তী তাড়াতাড়ি কমলাকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া আনিলেন। কমলা হরিভাবিনীকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই তিনি দক্ষিণ করপুটে কমলার চিবুক স্পর্শ করিয়া নিজের অঙ্গুলি চুম্বন করিলেন এবং স্বামীকে কহিলেন, "দেখিয়াছ, মুখখানি অনেকটা আমাদের বিধুর মতো।"

বিধু ইঁহাদের বড়ো মেয়ে—কানপুরে স্বামীগৃহে থাকে। চক্রবর্তী মনে মনে হাসিলেন, তিনি জানিতেন, কমলার সহিত বিধুর কোনো সাদৃশ্য নাই, কিন্তু হরিভাবিনী রূপগুণে বাহিরের মেয়ের জয় স্বীকার করিতে পারেন না। শৈলজা তাঁহার ঘরেই থাকে, পাছে তাহার সহিত প্রত্যক্ষ তুলনায় বিচারে হার হয়, এইজন্য অনুপস্থিতকে উপমাস্থলে রাখিয়া জয়পতাকা গৃহিণী আপন গৃহের মধ্যেই অচল করিলেন।

হরিভাবিনী। ইঁহারা আসিয়াছেন, তা বেশ হইয়াছে, কিন্তু আমাদের নূতন বাড়ির তো মেরামত শেষ হয় নাই—এখানে আমরা কোনোমতে মাথা গুঁজিয়া আছি— ইঁহাদের যে কষ্ট হইবে।

বাজারে চক্রবর্তীর একটা ছোটো বাড়ি মেরামত হইতেছে বটে, কিন্তু সেটা একটা দোকান— সেখানে বাস করিবার কোনো সুবিধাও নাই, সংকল্পও নাই।

চক্রবর্তী এই মিথ্যার কোনো প্রতিবাদ না করিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, "মা যদি কষ্টকে কষ্ট জ্ঞান করিবেন, তবে কি উঁহাকে এ-ঘরে

আনি। (স্ত্রীর প্রতি) যাই হউক, তুমি আর বাহিরে দাঁড়াইয়ো না—শরৎকালের রৌদ্রটা বড়ো খারাপ।"

এই বলিয়া চক্রবর্তী রমেশের নিকট বাহিরে চলিয়া গেলেন।

হরিভাবিনী কমলার বিস্তারিত পরিচয় লইতে লাগিলেন। "তোমার স্বামী বুঝি উকিল? তিনি কতদিন কাজ করিতেছেন? তিনি কত রোজগার করেন? এখনো বুঝি ব্যবসা আরম্ভ করেন নাই? তবে চলে কী করিয়া। তোমার শ্বশুরের বুঝি সম্পত্তি আছে? জান না? ও মা, কেমন মেয়ে গো? শ্বশুরবাড়ির খবর রাখো না। সংসার-খরচের জন্য স্বামী তোমাকে মাসে কত করিয়া দেন? শাশুড়ী যখন নাই, তখন তো সংসারের ভার নিজের হাতেই লইতে হইবে। তুমি তো নেহাত কচি মেয়েটি নও—আমার বড়ো জামাই যা-কিছু রোজগার করে, সমস্তই বিধুর হাতে গনিয়া দেয়" ইত্যাদি প্রশ্ন ও মন্তব্যের দ্বারা অতি অল্পকালের মধ্যেই কমলাকে অর্বাচীন প্রতিপন্ন করিয়া দিলেন। কমলাও যে রমেশের অবস্থা ও ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে কত অল্প জানে এবং তাহাদের সম্বন্ধ বিচার করিলে এই অল্পজ্ঞান যে কত অসংগত ও লোকসমাজে লজ্জাকর, হরিভাবিনীর প্রশ্নমালায় তাহা তাহার মনে স্পষ্ট উদয় হইল। সে ভাবিয়া দেখিল, আজ পর্যন্ত রমেশের সঙ্গে ভালো করিয়া কোনো কথা আলোচনা করিবার অবকাশমাত্র সে পায় নাই— সে রমেশের স্ত্রী হইয়া রমেশের সম্বন্ধে কিছুই জানে না। আজ ইহা তাহার নিজের কাছে অদ্ভুত বোধ হইল এবং নিজের এই অকিঞ্চিৎকরত্বের লজ্জা তাহাকে পীড়িত করিয়া তুলিল।

হরিভাবিনী আবার শুরু করিলেন, "বউমা, দেখি তোমার বালা? এ সোনা তো তেমন ভালো নয়? বাপের বাড়ি হইতে কিছু গহনা আন নাই? বাপ নাই? তাই বলিয়া কি এমন করিয়া গা খালি

রাখে। তোমার স্বামী বুঝি কিছু দেন নাই? আমার বড়ো জামাই দুই মাস অন্তর আমার বিধুকে একখানা করিয়া গহনা গড়াইয়া দেয়।”

এই সমস্ত সওয়াল-জবাবের মধ্যে শৈলজা তাহার দুই বৎসর বয়সের কন্যার হাত ধরিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। শৈলজা শ্যামবর্ণ, তাহার মুখখানি ছোটোখাটো, মুষ্টিমেয়, চোখ-দুটি উজ্জ্বল, ললাট প্রশস্ত— মুখ দেখিলেই স্থির বুদ্ধি এবং একটি শান্ত পরিতৃপ্তির ভাব চোখে পড়ে।

শৈলজার ছোটো মেয়েটি কমলার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মুহূর্তকাল পর্যবেক্ষণের পর বলিয়া উঠিল— “মাসী”— বিধুর সঙ্গে সাদৃশ্য বিচার করিয়া যে বলিল, তাহা নহে—একটা বিশেষ বয়সের যে-কোনো মেয়েকে তাহার অপ্রিয় বোধ না হইলেই তাহাকেই সে নির্বিচারে মাসী নামে অভিহিত করে। কমলা তৎক্ষণাৎ তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল।

হরিভাবিনী শৈলজার নিকট কমলার পরিচয় দিয়া কহিলেন, “ইঁহার স্বামী উকিল, নূতন রোজগার করিতে বাহির হইয়াছেন। পথে কর্তার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল, তিনি ইঁহাদের গাজিপুরে আনিয়াছেন।”

শৈলজা কমলার মুখের দিকে চাহিল, কমলাও শৈলজার মুখের দিকে চাহিল এবং সেই দৃষ্টিপাতেই এক মুহূর্তে উভয়ের সখ্যবন্ধন বাঁধিয়া গেল। হরিভাবিনী আতিথ্যের আয়োজনে চলিয়া গেলেন— শৈলজা কমলার হাত ধরিয়া কহিল, “এসো ভাই, আমার ঘরে এসো।”

অল্পক্ষণের মধ্যেই দুজনে ঘনিষ্ঠভাবে কথা আরম্ভ হইল। শৈলজার সঙ্গে কমলার বয়সের যে প্রভেদ ছিল, তাহা চোখে দেখিয়া সহসা বোঝা যায় না। শৈলজার সবসুদ্ধ একটু ছোটোখাটো সংক্ষিপ্ত রকমের ভাব— কমলার ঠিক তাহার উলটা— আয়তনে ও ভাবে ভঙ্গিতে সে আপনার বয়সকে অনেকটা ছাড়াইয়া গেছে। বিবাহের পর হইতে তাহার মাথার

উপরে শ্বশুরবাড়ির কোনো রকমের চাপ না থাকাতেই হউক বা যে কারণেই হউক, দেখিতে দেখিতে সে অসংকোচে বাড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহার মুখের ভাবের মধ্যে একটা স্বাধীনতার তেজ ছিল। তাহার সম্মুখে যাহা-কিছু উপস্থিত হয়, তাহাকে অন্তত মনে মনেও সে প্রশ্ন না করিয়া ক্ষান্ত হয় না। "চুপ করো", "যাহা বলি তাহাই করিয়া যাও", "বউমানুষের অত 'নেই' করা শোভা পায় না"— এ-সব কথা তাহাকে আজ পর্যন্ত শুনিতে হয় নাই। তাই সে যেন মাথা তুলিয়া সোজা হইয়া উঠিয়াছে— তাহার সরলতার মধ্যে সবলতা আছে।

শৈলজার মেয়ে উমি উভয়ের মনোযোগ নিজের প্রতি সম্পূর্ণ একচেটে করিয়া লইবার বিধিমতো চেষ্টা করিলেও, দুই নূতন সখীর মধ্যে কথাবার্তা জমিয়া উঠিল। এই কথোপকথন-ব্যাপারে কমলা নিজের তরফের দৈন্য সহজেই বুঝিতে পারিল। শৈলজার বলিবার ঢের কথা আছে, কিন্তু কমলার বলিবার কিছুই নাই। কমলার জীবনের চিত্রপটে তাহার দাম্পত্যের যে একটা ছবি উঠিয়াছে, তাহা একটি পেনসিলের ক্ষীণ রেখা-মাত্র— তাহার সকল জায়গা পরিস্ফুট সুসংলগ্ন নহে, তাহাতে আজও একটুও রং ফলানো হয় নাই। কমলা এতদিন এই শূন্যতা স্পষ্ট করিয়া বুঝিবার অবকাশ পায় নাই— হৃদয়ের মধ্যে অভাব অনুভব করিয়াছে, মাঝে মাঝে বিদ্রোহভাবও উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার চেহারাটা তাহার চোখে ফুটিয়া ওঠে নাই। বন্ধুত্বের প্রথম আরম্ভেই শৈলজা যখন তাহার স্বামীর কথা বলিতে আরম্ভ করিল— যে-সুরে শৈলজার হৃদয়ের সব তারগুলি বাঁধা রহিয়াছে, আঙুল পড়িবামাত্র যখন সেই সুর বাজিয়া উঠিল, তখন কমলা দেখিল, কমলার হৃদয় হইতে এ-সুরের কোনো ঝংকার দিবার নাই— স্বামীর কথা সে কী বলিবে, বলিবার বিষয়ই বা কী আছে। বলিবার আগ্রহই বা কোথায়। সুখের বোঝাই লইয়া

শৈলজার ইতিহাস যেথা হু হু করিয়া স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে, কমলার শূন্য নৌকাটা সেখানে মাটিতে ঠেকিয়া অচল হইয়া আছে।

শৈলজার স্বামী বিপিন গাজিপুরে অহিফেন-বিভাগে কাজ করে। চক্রবর্তীর দুটিমাত্র মেয়ে। বড়ো মেয়ে তো শ্বশুরবাড়ি গেছে। ছোটোটিকে প্রাণ ধরিয়া বিদায় দিতে না পারিয়া চক্রবর্তী একটি নিঃস্ব জামাই বাছিয়া আনিলেন এবং সাহেবসুবাকে ধরিয়া এইখানেই তাহার একটা কাজ জুটাইয়া দিলেন। বিপিন ইঁহাদের বাড়িতেই থাকে।

কথা কহিতে কহিতে হঠাৎ একসময় শৈল বলিল, "তুমি একটু বসো ভাই, আমি এখনি আসিতেছি।" পরক্ষণেই একটু হাসিয়া কারণ দর্শাইয়া কহিল, "উনি স্নান করিয়া ভিতরে আসিয়াছেন— খাইয়া আপিসে যাইবেন।"

কমলা সরল বিস্ময়ের সহিত প্রশ্ন করিল, "তিনি আসিয়াছেন, তুমি কেমন করিয়া জানিতে পারিলে।"

শৈলজা। আর ঠাট্টা করিতে হইবে না। সকলেই যেমন করিয়া জানিতে পারে, আমিও তেমনি করিয়া জানি। তুমি নাকি তোমার কর্তাটির পায়ের শব্দ চেন না!

এই বলিয়া হাসিয়া কমলার চিবুক ধরিয়া একটু নাড়া দিয়া আঁচলে-বদ্ধ চাবির গোছা ঝনাৎ করিয়া পিঠের উপর ফেলিয়া মেয়ে কোলে লইয়া শৈলজা চলিয়া গেল। পদশব্দের ভাষা যে এতই সহজ, তাহা কমলা আজও জানিতে পারে নাই। সে চুপ করিয়া বসিয়া জানলার বাহিরে চোখ রাখিয়া তাই ভাবিতে লাগিল। জানলার বাহিরে একটা পেয়ারা-গাছে ডাল ছাইয়া পেয়ারার ফুল ধরিয়াছে, সেই সমস্ত ফুলের কেশরের মধ্যে মৌমাছির দল তখন লুটোপুটি করিতেছিল।

৩২

একটু ফাঁকা জায়গায় গঙ্গার ধারে একটা আলাদা বাড়ি লইবার চেষ্টা হইতেছে। রমেশ গাজিপুর-আদালতে বিধি-অনুসারে প্রবেশলাভ করিবার জন্য ও জিনিসপত্র আনিতে একবার কলিকাতায় যাইতে হইবে স্থির করিয়াছে, কিন্তু কলিকাতায় যাইতে তাহার সাহস হইতেছে না। কলিকাতার একটা বিশেষ গলির চিত্র মনে উঠিলেই রমেশের বুকের ভিতরটা এখনো যেন কিসে চাপিয়া ধরে। এখনো জাল ছেঁড়ে নাই— অথচ কমলার সহিত স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করিয়া লইতে বিলম্ব করিলে আর চলে না। এই সমস্ত দ্বিধায় কলিকাতায় যাত্রার দিন পিছাইয়া যাইতে লাগিল।

কমলা চক্রবর্তীর অন্তঃপুরেই থাকে। এ-বাংলায় ঘর নিতান্ত কম বলিয়া রমেশকে বাহিরের ঘরেই থাকিতে হয়— কমলার সহিত তাহার সাক্ষাতের সুযোগ হয় না।

এই অনিবার্য বিচ্ছেদব্যাপার লইয়া শৈলজা কেবলই কমলার কাছে দুঃখপ্রকাশ করিতে লাগিল। কমলা কহিল, "কেন ভাই, তুমি এত হাহুতাশ করিতেছ। এমন কী ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।"

শৈলজা হাসিয়া কহিল, "ইস, তাই তো। একেবারে যে পাষাণের মতো কঠিন মন। ও-সব ছলনায় আমাকে ভুলাইতে পারিবে না। তোমার মনের মধ্যে যে কী হইতেছে, সে কি আর আমি জানি না।"

কমলা জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা ভাই, সত্যি করিয়া বলো, দুই দিন যদি বিপিনবাবু তোমাকে দেখা না দেন, তা হইলে কি অমনি—"

শৈলজা সগর্বে কহিল, "ইস, দুই দিন দেখা না দিয়া তাঁর নাকি থাকিবার জো আছে।"

এই বলিয়া বিপিনবাবুর অধৈর্যসম্বন্ধে শৈলজা গল্প করিতে লাগিল। প্রথম-প্রথম বিবাহের পর বালক বিপিন গুরুজনের ব্যূহভেদ করিয়া তাহার বালিকা-বধূর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কবে কত প্রকার কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছিল, কবে ব্যর্থ হইয়াছিল, কবে ধরা পড়িয়াছিল, দিবাসাক্ষাৎকারের নিষেধদুঃখলাঘবের জন্য বিপিনের মধ্যাহ্নভোজনকালে একটা আয়নার মধ্যে গুরুজনদের অজ্ঞাতে উভয়ের কিরূপ দৃষ্টিবিনিময় চলিত, তাহা বলিতে বলিতে পুরাতন স্মৃতির আনন্দ-কৌতুকে শৈলজার মুখখানি হাস্যে উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিল। তাহার পরে যখন আপিসে যাইবার পালা আরম্ভ হইল, তখন উভয়ের বেদনা এবং বিপিনের যখন তখন আপিস-পলায়ন, সেও অনেক কথা। তাহার পরে একবার শ্বশুরের ব্যবসায়ের খাতিরে কিছুদিনের জন্য বিপিনের পাটনায় যাইবার কথা হয়, তখন শৈলজা তাহার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, “তুমি পাটনায় গিয়া থাকিতে পারিবে।” বিপিন স্পর্ধা করিয়া বলিয়াছিল, “কেন পারিব না, খুব পারিব।” সেই স্পর্ধাবাক্যে শৈলরাজ মনে খুব অভিমান হইয়াছিল— সে প্রাণপণে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, বিদায়ের পূর্বরাত্রে সে কোনোমতে লেশমাত্র শোকপ্রকাশ করিবে না; কেমন করিয়া সে প্রতিজ্ঞা হঠাৎ চোখের জলের প্লাবনে ভাসিয়া গেল এবং পরদিনে যখন যাত্রার আয়োজন সমস্তই স্থির, তখন বিপিনের অকস্মাৎ এমনি মাথা ধরিয়া কী-এক-রকমের অসুখ করিতে লাগিল যে, যাত্রা বন্ধ করিতে হইল, তাহার পরে ডাক্তার যখন ওষুধ দিয়া গেল, তখন সে ওষুধের শিশি গোপনে নর্দামার মধ্যে শূন্য করিয়া অপূর্ব উপায়ে কী করিয়া ব্যাধির অবসান হইল—এ-সমস্ত কাহিনী বলিতে বলিতে কখন যে বেলা অবসান হইয়া আসে, শৈলজার তাহাতে হুঁশ থাকে না—অথচ এমন সময় হঠাৎ দূরে বাহির-দরজায় একটা কিসের শব্দ হয়-কি-না-হয়, অমনি

শৈল ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়ে। বিপিনবাবু আপিস হইতে ফিরিয়াছেন। সমস্ত গল্পহাসির অন্তরালে একটি উৎকণ্ঠিত হৃদয় সেই পথের ধারের বাহির-দরজার দিকেই কান পাতিয়া বসিয়া ছিল।

কমলার কাছে এ-সমস্ত কথা যে একেবারেই আকাশকুসুমের মতো, তাহা নয়—ইহার আভাস সে কিছু-কিছু পাইয়াছে। প্রথম কয়েক মাস রমেশের সহিত প্রথম পরিচয়ের রহস্যের মধ্যে যেন এইরকমেরই একটা রাগিণী বাজিয়া উঠিতেছিল। তাহার পরেও ইস্কুল হইতে উদ্ধারলাভ করিয়া কমলা যখন রমেশের কাছে ফিরিয়া আসিল, তখনো মাঝে মাঝে এমন-সকল ঢেউ অপূর্ব সংগীতে ও অপরূপ নৃত্যে তাহার হৃদয়কে আঘাত করিয়াছে—যাহার ঠিক অর্থটি সে আজ শৈলজার এই সমস্ত গল্পের মধ্য হইতে বুঝিতে পারিতেছে। কিন্তু তাহার এ-সমস্তই ভাঙাচোরা, ইহার ধারাবাহিকতা কিছুই নাই। তাহাকে যেন কোনো-একটা পরিণাম পর্যন্ত পৌঁছিতে দেওয়া হয় নাই। শৈলজা ও বিপিনের মধ্যে যে একটা আগ্রহের টান, সেটা রমেশও তাহার মধ্যে কোথায়। এই যে কয়েক দিন তাহাদের দেখাশোনা বন্ধ হইয়া আছে, তাহাতে তাহার মনের মধ্যে এমনি কী অস্থিরতা উপস্থিত হইয়াছে—এবং রমেশও তাহাকে দেখিবার জন্য বাহিরে বসিয়া বসিয়া কোনোপ্রকার কৌশল উদ্ভাবন করিতেছে, তাহা কোনোমতেই বিশ্বাসযোগ্য নহে।

ইতিমধ্যে যেদিন রবিবার আসিল, সেদিন শৈলজা কিছু মুশকিলে পড়িল। তাহার নূতন সখীকে দীর্ঘকাল একেবারে একলা পরিত্যাগ করিতে তাহার লজ্জা করিতে লাগিল—অথচ আজ ছুটির দিন একেবারে ব্যর্থ করিবে, এতবড়ো ত্যাগশীলতাও তাহার নাই। এদিকে রমেশবাবু নিকটে থাকিতেও কমলা যখন মিলনে বঞ্চিত হইয়া আছে, তখন ছুটির উৎসবে নিজের বরাদ্দ পুরা ভোগ করিতে তাহার ব্যথাও

বোধ হইল। আহা, যদি কোনোমতে রমেশের সহিত কমলার সাক্ষাৎ ঘটাইয়া দেওয়া যায়।

এ-সকল বিষয় লইয়া গুরুজনদের সহিত পরামর্শ চলে না—কিন্তু চক্রবর্তী পরামর্শের জন্য অপেক্ষা করিবার লোক নহেন। তিনি বাড়িতে প্রচার করিয়া দিলেন, আজ তিনি বিশেষ কাজে শহরের বাহিরে যাইতেছেন। রমেশকে বুঝাইয়া গেলেন যে, বাহিরের লোক আজ কেহ তাঁহার বাড়িতে আসিতেছে না— সদর-দরজা বন্ধ করিয়া তিনি চলিয়া যাইতেছেন। এ-খবর তাঁহার কন্যাকেও বিশেষ করিয়া শোনাইয়া দিলেন—নিশ্চয় জানিতেন, কোন্ ইঙ্গিতের কী অর্থ, তাহা বুঝিতে শৈলজার বিলম্ব হয় না।

স্নানের পর শৈলজা কমলাকে বলিল, "এসো ভাই, তোমার চুল শুকাইয়া দিই।"

কমলা কহিল, "কেন, আজ এত তাড়াতাড়ি কিসের।"

শৈলজা। সে-কথা পরে হইবে— তোমার চুলটা আগে বাঁধিয়া দিই।—বলিয়া কমলার মাথা লইয়া পড়িল। আজ বিনানির সংখ্যা অনেক বেশি— খোঁপা একটা বৃহৎ ব্যাপার হইয়া উঠিল।

তাহার পরে কাপড় লইয়া উভয়ের মধ্যে একটা বিষম তর্ক বাধিয়া গেল। শৈলজা তাহাকে যে রঙিন কাপড় পড়াইতে চায়, কমলা তাহা পরিবার কোনো কারণ খুঁজিয়া পাইল না। অবশেষে শৈলজাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য পরিতে হইল।

মধ্যাহ্নে আহারের পর শৈলজা তাহার স্বামীকে কানে-কানে কী-একটা বলিয়া ক্ষণকালের জন্য ছুটি লইয়া আসিল। তাহার পরে কমলাকে বাহিরের ঘরে পাঠাইবার জন্য পীড়াপীড়ি পড়িয়া গেল।

রমেশের কাছে কমলা ইতিপূর্বে অনেকবার অসংকোচে গিয়াছে।

এ-সম্বন্ধে সমাজে লজ্জাপ্রকাশের যে কোনো বিধান আছে, তাহা জানিবার সে কোনো অবসর পায় নাই। পরিচয়ের আরম্ভেই রমেশ সংকোচ ভাঙিয়া দিয়াছিল। নির্লজ্জতার অপবাদ দিয়া ধিক্‌কার দিবার সঙ্গিনীও তাহার কাছে কেহ ছিল না।

কিন্তু আজ শৈলজার অনুরোধ পালন করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। স্বামীর কাছে শৈলজা যে-অধিকারে যায়, তাহা সে জানিয়াছে— কমলা সেই অধিকারের গৌরব যখন অনুভব করিতেছে না, তখন দীনভাবে সে আজ কেমন করিয়া যাইবে।

কমলাকে যখন কিছুতেই রাজি করা গেল না, তখন শৈল মনে করিল, রমেশের 'পরে সে অভিমান করিয়াছে। অভিমান করিবার কথাই বটে। কয়টা দিন কাটিয়া গেল, অথচ রমেশবাবু কোনো ছুতা করিয়া একবার দেখাসাক্ষাতের চেষ্টাও করিলেন না।

বাড়ির গৃহিণী তখন আহারান্তে ঘরে দুয়ার দিয়া ঘুমাইতেছিলেন। শৈলজা বিপিনকে আসিয়া কহিল, "রমেশবাবুকে তুমি আজ কমলার নাম করিয়া বাড়ির মধ্যেই ডাকিয়া আনো। বাবা কিছু মনে করিবেন না, মা কিছু জানিতেই পারিবেন না।" বিপিনের মতো চুপচাপ মুখচোরা লোকের পক্ষে এরূপ দৌত্য কোনোমতেই রুচিকর নহে, তথাপি ছুটির দিনে এই অনুরোধ লঙ্ঘন করিতে সে সাহস করিল না।

রমেশ তখন বাহিরের ঘরের জাজিম-পাতা মেজের উপর চিত হইয়া শুইয়া এক পায়ের উচ্ছ্রিত হাঁটুর উপরে আর-এক পা তুলিয়া দিয়া পায়োনিয়র পড়িতেছিল। পাঠ্য অংশ শেষ করিয়া যখন কাজের অভাবে তাহার বিজ্ঞাপনের প্রতি মনোযোগ দিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় বিপিনকে ঘরে আসিতে দেখিয়া সে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সঙ্গী হিসাবে বিপিন যে খুব প্রথমশ্রেণীর পদার্থ, তাহা না হইলেও বিদেশে

মধ্যাহ্নযাপনের পক্ষে রমেশ তাহাকে পরমলাভ বলিয়া গণ্য করিল এবং বলিয়া উঠিল, "আসুন বিপিনবাবু, আসুন, বসুন।"

বিপিন না বসিয়াই একটুখানি মাথা চুলকাইয়া বলিল, "আপনাকে একবার ইনি ভিতরে ডাকিতেছেন।"

রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, "কে, কমলা।"

বিপিন কহিল, "হাঁ।"

রমেশ কিছু আশ্চর্য হইল। রমেশ পূর্বেই স্থির করিয়াছে, কমলাকে সে স্ত্রী বলিয়াই গ্রহণ করিবে, কিন্তু তাহার স্বাভাবিক-দ্বিধাগ্রস্ত মন তৎপূর্বে এই কয়দিন অবকাশ পাইয়া বিশ্রাম করিতেছে। কল্পনায় কমলাকে গৃহিণীপদে অভিষিক্ত করিয়া সে মনকে নানাপ্রকার ভাবী সুখের আশ্বাসে উত্তেজিত করিয়াও তুলিয়াছে— কিন্তু প্রথম আরম্ভটাই দুরূহ। কিছুদিন হইতে কমলার প্রতি যেটুকু দূরত্ব রক্ষা করা তাহার অভ্যস্ত হইয়া গেছে, হঠাৎ একদিন কেমন করিয়া সেটা ভাঙিয়া ফেলিবে, তাহা সে ভাবিয়া পাইতেছিল না, এইজন্যই বাড়িভাড়া করিবার দিকে তাহার তেমন সত্বরতা ছিল না।

কমলা ডাকিয়াছে শুনিয়া রমেশের মনে হইল, নিশ্চয় বিশেষ কোনো একটা প্রয়োজন পড়িয়াছে। তবু প্রয়োজনের ডাক হইলেও তাহার মনের মধ্যে একটা হিল্লোল উঠিল। বিপিনের অনুবর্তী হইয়া পায়োনিয়রটা ফেলিয়া রাখিয়া যখন সে অন্তঃপুরে যাত্রা করিল, তখন এই মধুকরগুঞ্জরিত কার্তিকের আলস্যদীর্ঘ জনহীন মধ্যাহ্নে একটা অভিসারের আভাস তাহার চিত্তকে একটুখানি চঞ্চল করিল।

বিপিন কিছু দূর হইতে ঘর দেখাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। কমলা মনে করিয়াছিল, শৈলজা তাহার সম্বন্ধে হাল ছাড়িয়া দিয়া বিপিনের কাছে চলিয়া গেছে। তাই সে খোলা দরজার চৌকাঠের উপর বসিয়া

সামনের বাগানের দিকে চাহিয়া ছিল শৈল কেমন করিয়া কমলার অন্তরে-বাহিরে একটা ভালোবাসার সুর বাঁধিয়া দিয়াছিল। ঈষত্তপ্ত বাতাসে বাহিরে গাছের পল্লবগুলি যেমন মর্মরশব্দে কাঁপিয়া উঠিতেছিল, কমলার বুকের ভিতরেও মাঝে মাঝে তেমনি একটা দীর্ঘনিশ্বাসের হাওয়া উঠিয়া অব্যক্ত বেদনায় একটি অপরূপ স্পন্দনের সঞ্চার করিতেছিল।

এমন সময়ে রমেশ ঘরে প্রবেশ করিয়া যখন তাহার পশ্চাৎ হইতে ডাকিল—"কমলা", তখন সে চকিত হইয়া উঠিয়া পড়িল—তাহার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে রক্ত তরঙ্গিত হইতে লাগিল; যে-কমলা ইতিপূর্বে কখনো রমেশের কাছে বিশেষ লজ্জা অনুভব করে নাই, সে আজ ভালো করিয়া মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না। তাহার কর্ণমূল আরক্তিম হইয়া উঠিল।

আজিকার সাজসজ্জায় ও ভাবে-আভাসে রমেশ কমলাকে নূতন মূর্তিতে দেখিল। হঠাৎ কমলার এই বিকাশ তাহাকে আশ্চর্য এবং অভিভূত করিল। সে আস্তে আস্তে কমলার কাছে আসিয়া ক্ষণকালের জন্য চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে কহিল, "কমলা, তুমি আমাকে ডাকিয়াছ?"

কমলা চমকিয়া উঠিয়া অনাবশ্যক উত্তেজনার সহিত বলিয়া উঠিল, "না না না, আমি ডাকি নাই— আমি কেন ডাকিতে যাইব।"

রমেশ কহিল, "ডাকিলেই বা দোষ কী কমলা।"

কমলা দ্বিগুণ প্রবলতার সহিত বলিল, "না, আমি ডাকি নাই।"

রমেশ কহিল, "তা বেশ কথা। তুমি না ডাকিতেই আমি আসিয়াছি। তাই বলিয়াই কি অনাদরে ফিরিয়া যাইতে হইবে।"

কমলা। তুমি এখানে আসিয়াছ সকলে জানিতে পারিলে রাগ করিবেন— তুমি যাও! আমি তোমাকে ডাকি নাই।

রমেশ কমলার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "আচ্ছা, তুমি আমার ঘরে এসো—সেখানে বাহিরের লোক কেহ নাই।"

কমলা কম্পিত কলেবরে তাড়াতাড়ি রমেশের হাত ছাড়াইয়া লইয়া পাশের ঘরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল।

রমেশ বুঝিল এ-সমস্তই বাড়ির কোনো মেয়ের ষড়যন্ত্র— এই বুঝিয়া পুলকিতদেহে বাহিরের ঘরে গেল। চিত হইয়া পড়িয়া আর-একবার পায়োনিয়রটা টানিয়া লইয়া তাহার বিজ্ঞাপনশ্রেণীর উপরে চোখ বুলাইতে লাগিল, কিন্তু কিছুই অর্থগ্রহ হইল না। তাহার হৃদয়াকাশে নানারঙের ভাবের মেঘ উড়ো-বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল।

শৈল রুদ্ধঘরে ঘা দিল— কেহ দরজা খুলিল না। তখন সে দরজার খড়খড়ি খুলিয়া বাহির হইতে হাত গলাইয়া দিয়া ছিটকিনি খুলিয়া ফেলিল। ঘরে ঢুকিয়া দেখে, কমলা মেজের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া দুই হাতের ভিতর মুখ লুকাইয়া কাঁদিতেছে।

শৈল আশ্চর্য হইয়া গেল। এমনি কী ঘটনা ঘটিতে পারে, যাহার জন্য কমলা এত আঘাত পায়। তাড়াতাড়ি তাহার পাশে বসিয়া তাহার কানের কাছে মুখ রাখিয়া স্নিগ্ধস্বরে বলিতে লাগিল, "কেন ভাই, তোমার কী হইয়াছে—তুমি কেন কাঁদিতেছ।"

কমলা কহিল, "তুমি কেন উঁহাকে ডাকিয়া আনিলে। তোমার ভারি অন্যায়।"

কমলার এই সকল আকস্মিক আবেগের প্রবলতা তাহার নিজের পক্ষে এবং অন্যের পক্ষের বোঝা ভারি শক্ত। ইহার মধ্যে যে তাহার কতদিনের গুপ্তবেদনার সঞ্চয় আছে, তাহা কেহই জানে না।

কমলা আজ একটা কল্পনালোক অধিকার করিয়া বেশ গুছাইয়া বসিয়া ছিল। রমেশ যদি বেশ সহজে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিত, তবে সুখেরই হইত। কিন্তু তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া সমস্ত ছারখার করিয়া ফেলা হইল। কমলাকে ছুটির সময়ে ইস্কুলে বন্দী করিয়া রাখিবার চেষ্টা, স্টীমারে রমেশের ঔদাসীন্য, এ-সমস্তই মনের তলদেশে আলোড়িত হইয়া উঠিল। কাছে পাইলেই যে পাওয়া হইল, ডাকিয়া আনিলেই যে আসা হইল, তাহা নহে— আসল জিনিসটি যে কী, তাহা গাজিপুরে আসার পরে কমলা অতি অল্পদিনেই যেন স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছে।

কিন্তু শৈলর পক্ষে এ-সব কথা বোঝা শক্ত। কমলা এবং রমেশের মাঝখানে যে কোনোপ্রকারের সত্যকার ব্যবধান থাকিতে পারে, তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে না। সে বহুযত্নে কমলার মাথা নিজের কোলের উপর তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা ভাই, রমেশবাবু কি তোমাকে কোনো কঠিন কথা বলিয়াছেন। হয়তো ইনি তাঁহাকে ডাকিতে গিয়াছিলেন বলিয়া তিনি রাগ করিয়াছেন। তুমি বলিলে না কেন যে, এ-সমস্ত আমার কাজ।"

কমলা কহিল, "না না, তিনি কিছুই বলেন নাই। কিন্তু কেন তুমি তাঁহাকে ডাকিয়া আনিলে।"

শৈল ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, "আচ্ছা ভাই, দোষ হইয়াছে, মাপ করো।"

কমলা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া শৈলর গলা জড়াইয়া ধরিল— কহিল, "যাও ভাই, যাও তুমি, বিপিনবাবু রাগ করিতেছেন।"

বাহিরে নির্জন ঘরে রমেশ পায়োনিয়রের উপর অনেকক্ষণ বৃথা চোখ বুলাইয়া একসময় সবলে সেটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। তারপর উঠিয়া বসিয়া কহিল, "না, আর না। কালই কলিকাতায় গিয়া প্রস্তুত হইয়া

আসিব। কমলাকে আমার স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিতে যতদিন বিলম্ব হইতেছে, ততই আমার অন্যায় বাড়িতেছে।”

রমেশের কর্তব্যবুদ্ধি হঠাৎ আজ পূর্ণভাবে জাগ্রত হইয়া সমস্ত দ্বিধা-সংশয় একলক্ষে অতিক্রম করিল।

৩৩

রমেশ ঠিক করিয়াছিল কলিকাতায় সে কেবল কাজ সারিয়া চলিয়া আসিবে, কলুটোলার সে-গলির ধার দিয়াও যাইবে না।

রমেশ দর্জিপাড়ার বাসায় আসিয়া উঠিল। দিনের মধ্যে অতি অল্প সময়ই কাজকর্মে কাটে, বাকি সময়টা ফুরাইতে চায় না। রমেশ কলিকাতায় যে-দলের সহিত মিশিত, এবারে আসিয়া তাহাদের সহিত দেখা করিতে পারিল না। পাছে পথে কাহারও সহিত দৈবাৎ দেখা হইয়া পড়ে, এই ভয়ে সে যথাসাধ্য সাবধানে থাকিত।

কিন্তু রমেশ কলিকাতায় আসিতেই একটা পরিবর্তন অনুভব করিল। যে নির্জন অবকাশের মাঝখানে, যে নির্মল শান্তির পরিবেষ্টনে কমলা তাহার নবকৈশোরের প্রথম আবির্ভাব লইয়া রমেশের কাছে রমণীয় হইয়া দেখা দিয়াছিল, কলিকাতায় তাহার মোহ অনেকটা ছুটিয়া গেল। দর্জিপাড়ার বাসায় রমেশ কমলাকে কল্পনাক্ষেত্রে আনিয়া ভালোবাসার মুগ্ধনেত্রে দেখিবার চেষ্টা করিল— কিন্তু এখানে তাহার মন কোনোমতে সাড়া দিল না— আজ কমলা তাহার কাছে অপরিণতা অশিক্ষিতা বালিকার রূপে প্রতিভাত হইল।

জোর যতই অতিরিক্তমাত্রায় প্রয়োগ করা যায়, জোর ততই কমিয়া আসিতে থাকে। হেমনলিনীকে কোনোমতেই মনের মধ্যে

আমল দিবে না, এই পণ করিতে করিতেই অহোরাত্র হেমনলিনীর কথা রমেশের মনে জাগরূক থাকে। ভুলিবার কঠিন সংকল্পই স্মরণে রাখিবার প্রবল সহায় হইয়া উঠিল।

রমেশের যদি কিছুমাত্র তাড়া থাকিত, তবে বহু পূর্বেই কলিকাতার কাজ শেষ করিয়া সে ফিরিতে পারিত। কিন্তু সামান্য কাজ গড়াইতে গড়াইতে বাড়িয়া চলিল। অবশেষে তাহাও নিঃশেষিত হইয়া গেল।

কাল রমেশ প্রথমে কার্যানুরোধে এলাহাবাদে যাত্রা করিয়া সেখান হইতে গাজিপুরে ফিরিবে। এতদিন সে ধৈর্যরক্ষা করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু সে-ধৈর্যের কি কোনো পুরস্কার নাই। বিদায়ের আগে গোপনে একবার কলুটোলার খবর লইয়া আসিলে ক্ষতি কী।

আজ কলুটোলার সেই গলিতে যাওয়া স্থির করিয়া সে একখানা চিঠি লিখিতে বসিল। তাহাতে কমলার সহিত তাহার সম্বন্ধ আদ্যোপান্ত বিস্তারিত করিয়া লিখিল। এবারে গাজিপুরে ফিরিয়া গিয়া সে অগত্যা হতভাগিনী কমলাকে নিজের পরিণীত-পত্নীরূপে গ্রহণ করিবে, তাহাও জ্ঞাপন করিল। এইরূপে হেমনলিনীর সহিত তাহার সর্বতোভাবে বিচ্ছেদ ঘটিবার পূর্বে সত্য ঘটনা সম্পূর্ণভাবে জানাইয়া এই পত্রদ্বারা সে বিদায় গ্রহণ করিল।

চিঠি লিখিয়া লেফাফার মধ্যে পুরিয়া উপরে কাহারো নাম লিখিল না, ভিতরেও কাহাকেও সম্বোধন করিল না। অন্নদাবাবুর ভৃত্যেরা রমেশের প্রতি অনুরক্ত ছিল— কারণ রমেশ, হেমনলিনীর সম্পর্কীয় স্বজন-পরিজন সকলকে একটা বিশেষ মমতার সহিত দেখিত। এইজন্য সেই বাড়ির চাকর-বাকরেরা রমেশের নিকট হইতে নানা উপলক্ষ্যে কাপড়চোপড় পার্বণী হইতে বঞ্চিত হইত না। রমেশ ঠিক করিয়াছিল, সন্ধ্যার অন্ধকারে কলুটোলার বাড়িতে গিয়া একবার সে দূর হইতে

হেমনলিনীকে দেখিয়া আসিবে এবং কোনো একজন চাকরকে দিয়া এই চিঠি গোপনে হেমনলিনীর হাতে পৌঁছাইয়া দিয়া সে চিরকালের মতো তাহার পূর্ববন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া চলিয়া যাইবে।

সন্ধ্যার সময় রমেশ চিঠিখানি হাতে লইয়া সেই চিরপরিচিত গলির মধ্যে স্পন্দিতবক্ষে কম্পিতপদে প্রবেশ করিল। দ্বারের কাছে আসিয়া দেখিল— দ্বার রুদ্ধ, উপরে চাহিয়া দেখিল— সমস্ত জানলা বন্ধ, বাড়ি শূন্য, অন্ধকার।

তবু রমেশ দ্বারে ঘা দিল। দুই-চার বার আঘাত করিতে করিতে ভিতর হইতে একজন বেহারা দ্বার খুলিয়া বাহির হইল। রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, "কেও সুখন নাকি।"

বেহারা কহিল, "হাঁ বাবু, আমি সুখন।"

রমেশ। বাবু কোথায় গেছেন?

বেহারা। দিদিঠাকরুনকে লইয়া পশ্চিমে হাওয়া খাইতে গিয়াছেন।

রমেশ। কোথায় গেছেন?

বেহারা। তাহা তো বলিতে পারি না।

রমেশ। আর কে সঙ্গে গেছেন?

বেহারা। নলিনবাবু সঙ্গে গেছেন।

রমেশ। নলিনবাবুটি কে।

বেহারা। তাহা তো বলিতে পারি না।

রমেশ প্রশ্ন করিয়া করিয়া জানিল, নলিনবাবু যুবাপুরুষ, কিছুকাল হইতে এই বাড়িতে যাতায়াত করিতেছেন। যদিও রমেশ হেমনলিনীর আশা ত্যাগ করিয়াই যাইতেছিল, তথাপি নলিনবাবুটির প্রতি তাহার সদ্ভাব আকৃষ্ট হইল না।

রমেশ। তোর দিদিঠাকরুনের শরীর কেমন আছে।

বেহারা কহিল, "তাঁহার শরীর তো ভালোই আছে।"

স্থখন-বেহারাটা ভাবিয়াছিল, এই সুসংবাদে রমেশবাবু নিশ্চিন্ত ও সুখী হইবেন। অন্তর্যামী জানেন, স্থখন-বেহারা ভুল বুঝিয়াছিল।

রমেশ কহিল, "আমি একবার উপরের ঘরে যাইব।"

বেহারা তাহার ধূমোচ্ছ্বসিত কেরোসিনের ডিপা লইয়া রমেশকে উপরে লইয়া গেল। রমেশ ভূতের মতো ঘরে ঘরে একবার ঘুরিয়া বেড়াইল— দুই-একটা চৌকি ও সোফা বাছিয়া লইয়া তাহার উপরে বসিল। জিনিসপত্র, গৃহসজ্জা, সমস্তই ঠিক পূর্বের মতোই আছে, মাঝে হইতে নলিনবাবুটি কে আসিল। পৃথিবীতে কাহারও অভাবে অধিকদিন কিছুই শূন্য থাকে না। যে-বাতায়নে রমেশ একদিন হেমনলিনীর পাশে দাঁড়াইয়া ক্ষান্তবর্ষণ শ্রাবণদিনের সূর্যাস্ত-আভায় দুটি হৃদয়ের নিঃশব্দ মিলনকে মণ্ডিত করিয়া লইয়াছিল— সেই বাতায়নে আর কি সূর্যাস্তের আভা পড়ে না। সেই বাতায়নে আর-কেহ আসিয়া আর-একদিন যখন যুগল-মূর্তি রচনা করিতে চাহিবে, তখন পূর্ব-ইতিহাস আসিয়া কি তাহাদের স্থান-রোধ করিয়া দাঁড়াইবে, নিঃশব্দে তর্জনী তুলিয়া তাহাদিগকে দূরে সরাইয়া দিবে? ক্ষুণ্ণ অভিমানে রমেশের হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল।

পরদিন রমেশ এলাহাবাদে না গিয়া একেবারে গাজিপুরে চলিয়া গেল।

৩৪

কলিকাতায় রমেশ প্রায় মাসখানেক কাটাইয়া আসিয়াছে। এই এক মাস কমলার পক্ষে অল্পদিন নহে। কমলার জীবনে একটা পরিণতির স্রোত হঠাৎ অত্যন্ত দ্রুতবেগে বহিতেছে। ঊষার আলো যেমন দেখিতে

দেখিতে প্রভাতের রৌদ্রে ফুটিয়া পড়ে— কমলার নারীপ্রকৃতি তেমনি অতি অল্পকালের মধ্যেই সুপ্তি হইতে জাগরণের মধ্যে সচেতন হইয়া উঠিল। শৈলজার সহিত যদি তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় না হইত, শৈলজার জীবন হইতে প্রেমালোকের ছটা ও উত্তাপ যদি প্রতিফলিত হইয়া তাহার হৃদয়ের উপরে না পড়িত, তবে কতকাল তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইত বলা যায় না।

ইতিমধ্যে রমেশের আসিবার দেরি দেখিয়া শৈলজার বিশেষ অনুরোধে খুড়া কমলাদের বাসের জন্য শহরের বাহিরে গঙ্গার ধারে একটি বাংলা ঠিক করিয়াছেন। অল্পসল্প আসবাব সংগ্রহ করিয়া বাড়িটি বাসযোগ্য করিয়া তুলিবার আয়োজন করিতেছেন এবং নূতন ঘরকন্নার জন্য আবশ্যকমতো চাকরদাসীও ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন।

অনেকদিন দেরি করিয়া রমেশ যখন গাজিপুরে ফিরিয়া আসিল, তখন খুড়ার বাড়িতে পড়িয়া থাকিবার আর-কোনো ছুতা থাকিল না। এতদিন পরে কমলা নিজের স্বাধীন ঘরকন্নার মধ্যে প্রবেশ করিল।

বাংলাটির চারিদিকে বাগান করিবার মতো জমি যথেষ্ট আছে। দুই সারি সুদীর্ঘ শিশুগাছের ভিতর দিয়া একটি ছায়াময় রাস্তা গেছে। শীতের শীর্ণ গঙ্গা বহুদূরে সরিয়া গিয়া বাড়ি এবং গঙ্গার মাঝখানে একটি নিচু চর পড়িয়াছে— সেই চরে চাষারা স্থানে স্থানে গোধূম চাষ করিয়াছে এবং স্থানে স্থানে তরমুজ ও খরমুজা লাগাইতেছে। বাড়ির দক্ষিণ-সীমানায় গঙ্গার দিকে একটি বৃহৎ বৃদ্ধ নিমগাছ আছে, তাহার তলা বাঁধানো।

বহুদিন ভাড়াটের অভাবে বাড়ি ও জমি অনাদৃত অবস্থায় থাকাতে বাগানে গাছপালা প্রায় কিছুই ছিল না এবং ঘরগুলিও অপরিচ্ছন্ন হইয়া ছিল। কিন্তু কমলার কাছে এ-সমস্তই অত্যন্ত ভালো লাগিল।

গৃহিণীপদলাভের আনন্দ-আভায় তাহার চক্ষে সমস্তই সুন্দর হইয়া উঠিল। কোন্ ঘর কী কাজে ব্যবহার করিতে হইবে, জমির কোথায় কিরূপ গাছ-পালা লাগাইতে হইবে, তাহা সে মনে মনে ঠিক করিয়া লইল। খুড়ার সহিত পরামর্শ করিয়া কমলা সমস্ত জমিতে চাষ দিয়া লইবার ব্যবস্থা করিল। নিজে উপস্থিত থাকিয়া রান্নাঘরের চুলা বানাইয়া লইল এবং তাহার পার্শ্ববর্তী ভাঁড়ারঘরে যেখানে যেরূপ পরিবর্তন আবশ্যক, তাহা সাধন করিল। সমস্ত দিন ধোয়া-মাজা গোছানো-গাছানো— কাজকর্মের আর অন্ত নাই। চারিদিকেই কমলার মমত্ব আকৃষ্ট হইতে লাগিল।

গৃহকর্মের মধ্যে রমণীর সৌন্দর্য যেমন বিচিত্র, যেমন মধুর, এমন আর কোথাও নহে। রমেশ আজ কমলাকে সেই কর্মের মাঝখানে দেখিল— সে যেন পাখিকে খাঁচার বাইরে আকাশে উড়িতে দেখিল। তাহার প্রফুল্ল মুখ, তাহার সুনিপুণ পটুত্ব, রমেশের মনে এক নূতন বিস্ময় ও আনন্দের উদ্রেক করিয়া দিল।

এতদিন কমলাকে রমেশ তাহার স্বস্থানে দেখে নাই— আজ তাহাকে আপন নূতন সংসারের শিখরদেশে যখন দেখিল, তখন তাহার সৌন্দর্যের সঙ্গে একটা মহিমা দেখিতে পাইল।

কমলার কাছে আসিয়া রমেশ কহিল, "কমলা, করিতেছ কী। শ্রান্ত হইয়া পড়িবে যে।"

কমলা তাহার কাজের মাঝখানে একটুখানি থামিয়া রমেশের দিকে মুখ তুলিয়া তাহার মিষ্টমুখের হাসি হাসিল— কহিল, "না, আমার কিছু হইবে না।"

রমেশ যে তাহার তত্ত্ব লইতে আসিল, এটুকু সে পুরস্কারস্বরূপ গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ আবার কাজের মধ্যে নিবিষ্ট হইয়া গেল।

মুগ্ধ রমেশ ছুতা করিয়া আবার তাহার কাছে গিয়া কহিল, "তোমার খাওয়া হইয়াছে তো কমলা।"

কমলা কহিল, "বেশ, খাওয়া হয় নাই তো কী। কোন্‌কালে খাইয়াছি।"

রমেশ এ-খবর জানিত, তবু এই প্রশ্নের ছলে কমলাকে একটুখানি আদর না জানাইয়া থাকিতে পারিল না— কমলাও রমেশের এই অনাবশ্যক প্রশ্নে যে একটুখানি খুশি হয় নাই তাহা নহে।

রমেশ আবার একটুখানি কথাবার্তার সূত্রপাত করিবার জন্য কহিল, "কমলা, তুমি নিজের হাতে কত করিবে— আমাকে একটু খাটাইয়া লও না।"

কর্মিষ্ঠ লোকের দোষ এই, অন্য লোকের কর্মপটুতার উপরে তাহাদের বড়ো একটা বিশ্বাস থাকে না। তাহাদের ভয় হয়, যে-কাজ তাহারা নিজে না করিবে, সেই কাজ অন্যে করিলেই পাছে সমস্ত নষ্ট করিয়া দেয়। কমলা হাসিয়া কহিল, "না, এ-সমস্ত কাজ তোমাদের নয়।"

রমেশ কহিল, "পুরুষরা নিতান্তই সহিষ্ণু বলিয়া পুরুষজাতির প্রতি তোমাদের এই অবজ্ঞা আমরা সহ্য করিয়া থাকি, বিদ্রোহ করি না— তোমাদের মতো যদি স্ত্রীলোক হইতাম, তবে তুমুল ঝগড়া বাধাইয়া দিতাম। আচ্ছা, খুড়াকে তো তুমি খাটাইতে ত্রুটি কর না— আমি এতই কি অকর্মণ্য।"

কমলা কহিল, "তা জানি না, কিন্তু তুমি রান্নাঘরের ঝুল ঝাড়াইতেছ, তাহা মনে করিলেই আমার হাসি পায়। তুমি এখান থেকে সরো— এখানে ভারি ধুলা উড়াইয়াছে।"

রমেশ কমলার সহিত কথা চালাইবার জন্য বলিল, "ধুলা তো

লোক-বিচার করে না, ধুলা আমাকেও যে-চক্ষে দেখে, তোমাকেও সেই চক্ষে দেখে।"

কমলা। আমার কাজ আছে বলিয়া ধুলা সহিতেছি, তোমার কাজ নাই, তুমি কেন ধুলা সহিবে।

রমেশ ভৃত্যদের কান বাঁচাইয়া মৃদুস্বরে কহিল, "কাজ থাক্‌ বা না থাক্‌, তুমি যাহা সহ্য করিবে, আমি তাহার অংশ লইব।"

কমলার কর্ণমূল একটুখানি লাল হইয়া উঠিল— রমেশের কথার কোনো উত্তর না দিয়া কমলা একটু সরিয়া গিয়া কহিল, "উমেশ, এইখানটায় আর-এক ঘড়া জল ঢাল্‌ না— দেখছিসনে কত কাদা জমিয়া আছে। ঝাঁটাটা আমার হাতে দে দেখি।" বলিয়া ঝাঁটা লইয়া খুব বেগে মার্জনকার্যে নিযুক্ত হইল।

রমেশ কমলাকে ঝাঁট দিতে দেখিয়া হঠাৎ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া কহিল, "আহা কমলা, ও কী করিতেছ।"

পিছন হইতে শুনিতে পাইল, "কেন রমেশবাবু, অন্যায় কাজটা কী হইতেছে। এদিকে ইংরেজি পড়িয়া আপনারা মুখে সাম্য প্রচার করেন; ঝাঁট দেওয়ার কাজটা যদি এত হেয় মনে হয়, তবে চাকরের হাতেই বা ঝাঁটা দেন কেন। আমি মূর্খ, আমার কথা যদি জিজ্ঞাসা করেন, সতী মায়ের হাতের ঐ ঝাঁটার প্রত্যেক কাঠি সূর্যের রশ্মিচ্ছটার মতো আমার কাছে উজ্জ্বল ঠেকে। মা, তোমার জঙ্গল আমি একরকম প্রায় শেষ করিয়া আসিলাম, কোন্‌খানে তরকারির খেত করিবে, আমাকে একবার দেখাইয়া দিতে হইবে।"

কমলা কহিল, "খুড়ামশায়, একটুখানি সবুর করো, আমার এ-ঘর সারা হইল বলিয়া।"

এই বলিয়া কমলা ঘর-পরিষ্কার শেষ করিয়া কোমরে-জড়ানো আঁচল

মাথায় তুলিয়া বাহিরে আসিয়া খুড়ার সহিত তরকারির খেত লইয়া গভীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল।

এমনি করিয়া দেখিতে দেখিতে দিন শেষ হইয়া গেল, কিন্তু ঘর-গোছানো এখনো ঠিকমতো হইয়া উঠিল না। বাংলাঘর অনেকদিন অব্যবহৃত ও রুদ্ধ ছিল, আরও দুই-চারি দিন ঘরগুলি ধোয়া-মাজা করিয়া জানালা-দরজা খুলিয়া না রাখিলে তাহা বাসযোগ্য হইবে না দেখা গেল।

কাজেই আবার আজ সন্ধ্যার পরে খুড়ার বাড়িতেই আশ্রয় লইতে হইল। আজ তাহাতে রমেশের মনটা কিছু দমিয়া গেল। আজ তাহাদের নিজের নিভৃত ঘরটিতে সন্ধ্যাপ্রদীপটি জ্বলিবে এবং কমলার সলজ্জ স্মিত-হাস্যটির সম্মুখে রমেশ আপনার পরিপূর্ণ হৃদয় নিবেদন করিয়া দিবে, ইহা সে সমস্ত দিন থাকিয়া থাকিয়া কল্পনা করিতেছিল। আরও দুই-চারি দিন বিলম্বের সম্ভাবনা দেখিয়া রমেশ তাহার আদালত-প্রবেশ-সম্বন্ধীয় কাজে পরদিন এলাহাবাদে চলিয়া গেল।

৩৫

পরদিন কমলার নূতন বাসায় শৈলর চড়িভাতির নিমন্ত্রণ হইল। বিপিন আহারান্তে আপিসে গেলে পর শৈল নিমন্ত্রণরক্ষা করিতে গেল। কমলার অনুরোধে খুড়া সেদিন সোমবারের স্কুল কামাই কারয়াছিলেন। দুইজনে মিলিয়া নিমগাছতলায় রান্না চড়াইয়া দিয়াছেন, উমেশ সহায়কার্যে ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে।

রান্না ও আহার হইয়া গেলে পর খুড়া ঘরের মধ্যে গিয়া মধ্যাহ্ন-নিদ্রায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং দুই সখীতে নিমগাছের ছায়ায় বসিয়া তাহাদের সেই

চিরদিনের আলোচনায় নিবিষ্ট হইল। এই গল্পগুলির সহিত মিশিয়া কমলার কাছে এই নদীর তীর, এই শীতের রৌদ্র, এই গাছের ছায়া বড়ো অপরূপ হইয়া উঠিল—, ওই মেঘশূন্য নীলাকাশের যত সুদূর উচ্চে রেখার মতো হইয়া চিল ভাসিতেছে, কমলার বক্ষোবাসী একটা উদ্দেশ্যহারা আকাঙ্ক্ষা ততদূরেই উধাও হইয়া উড়িয়া গেল।

বেলা যাইতে না যাইতেই শৈল ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তাহার স্বামী আপিস হইতে আসিবে। কমলা কহিল, "একদিনও কি ভাই তোমার নিয়ম ভাঙিবার জো নাই।"

শৈল তাহার কোনো উত্তর না দিয়া একটুখানি হাসিয়া কমলার চিবুক ধরিয়া নাড়া দিল— এবং বাংলার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার পিতার ঘুম ভাঙাইয়া কহিল, "বাবা, আমি বাড়ি যাইতেছি।"

কমলাকে খুড়া কহিলেন, "মা, তুমিও চলো।"

কমলা কহিল, "না, আমার কাজ বাকি আছে, আমি সন্ধ্যার পরে যাইব।"

খুড়া তাঁহার পুরাতন চাকরকে ও উমেশকে কমলার কাছে রাখিয়া শৈলকে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিতে গেলেন, সেখানে তাঁহার কিছু কাজ ছিল — কহিলেন, "আমার ফিরিতে বেশি বিলম্ব হইবে না।"

কমলা যখন তাহার ঘর-গোছানোর কাজ শেষ করিল, তখনো সূর্য অস্ত যায় নাই। সে মাথায়-গায়ে একটা র‍্যাপার জড়াইয়া নিমগাছের তলায় আসিয়া বসিল। দূরে ওপারে যেখানে বড়ো বড়ো গোটা-দুই-তিন নৌকার মাস্তুল অগ্নিবর্ণ আকাশের গায়ে কালো আঁচড় কাটিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহারই পশ্চাতের উঁচু পাড়ির আড়ালে সূর্য নামিয়া গেল।

এমন সময় উমেশটা একটা ছুতা করিয়া তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। কহিল, "মা, অনেকক্ষণ তুমি পান খাও নাই— ও-বাড়ি

হইতে আসিবার সময় আমি পান জোগাড় করিয়া আনিয়াছি।" বলিয়া একটা কাগজে মোড়া কয়েকটা পান কমলার হাতে দিল।

কমলার তখন চৈতন্য হইল— সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। উমেশ কহিল, "চক্রবর্তীমশায় গাড়ি পাঠাইয়া দিয়াছেন।"

কমলা গাড়িতে উঠিবার পূর্বে বাংলার মধ্যে ঘরগুলি আর-একবার দেখিয়া লইবার জন্য প্রবেশ করিল।

বড়ো ঘরে শীতের সময় আগুন জ্বালিবার জন্য বিলাতি ছাঁদের একটি চুল্লি ছিল। তাহারই সংলগ্ন থাকের উপরে কেরোসিনের আলো জ্বলিতেছিল। সেই থাকের উপর কমলা পানের মোড়ক রাখিয়া কী-একটা পর্যবেক্ষণ করিতে যাইতেছিল। এমন সময় হঠাৎ কাগজের মোড়কে রমেশের হস্তাক্ষরে তাহার নিজের নাম কমলার চোখে পড়িল।

উমেশকে কমলা জিজ্ঞাসা করিল, "এ-কাগজ তুই কোথায় পেলি।"

উমেশ কহিল, "বাবুর ঘরের কোণে পড়িয়া ছিল, ঝাঁট দিবার সময় তুলিয়া আনিয়াছি।"

কমলা সেই কাগজখানা মেলিয়া ধরিয়া পড়িতে লাগিল।

হেমনলিনীকে রমেশ সেদিন যে বিস্তারিত চিঠি লিখিয়াছিল, এটা সেই চিঠি। স্বভাবশিথিল রমেশের হাত হইতে কখন সেটা কোথায় পড়িয়া গড়াইতেছিল, তাহা তাহার হুঁশ ছিল না।

কমলার পড়া হইয়া গেল। উমেশ কহিল, "মা, অমন করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলে যে। রাত হইয়া যাইতেছে।"

ঘর নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। কমলার মুখের দিকে চাহিয়া উমেশ ভীত

হইয়া উঠিল। কহিল, "মা, আমার কথা শুনিতেছ মা। ঘরে চলো, রাত হইল।"

কিছুক্ষণ পরে খুড়ার চাকর আসিয়া কহিল, "মায়ীজি, গাড়ি অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া আছে। চলো আমরা যাই।"

৩৬

শৈলজা জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই, আজ কি তোমার শরীর ভালো নাই। মাথা ধরিয়াছে?"

কমলা কহিল, "না, খুড়ামশায়কে দেখিতেছি না কেন।"

শৈল কহিল, "ইস্কুলে বড়োদিনের ছুটি আছে— দিদিকে দেখিবার জন্য মা তাঁহাকে এলাহাবাদে পাঠাইয়া দিয়াছেন—কিছুদিন হইতে দিদির শরীর ভালো নাই।"

কমলা কহিল, "তিনি কবে ফিরিবেন।"

শৈল। তাঁর ফিরিতে অন্তত হপ্তাখানেক দেরি হইবার কথা। তোমাদের বাংলা সাজানো লইয়া তুমি সমস্তদিন বড়ো বেশি পরিশ্রম কর, আজ তোমাকে বড়ো খারাপ দেখা যাইতেছে। আজ সকাল-সকাল খাইয়া শুইতে যাও।

শৈলকে কমলা যদি সকল কথা বলিতে পারিত, তবে বাঁচিয়া যাইত— কিন্তু বলিবার কথা নয়। "যাহাকে এতকাল আমার স্বামী বলিয়া জানিতাম, সে আমার স্বামী নয়," এ-কথা আর যাহাকে হউক, শৈলকে কোনোমতেই বলা যায় না।

কমলা শোবার ঘরে আসিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া প্রদীপের আলোকে আর-একবার রমেশের সেই চিঠি লইয়া বসিল। চিঠি যাহাকে উদ্দেশ

করিয়া লেখা হইতেছে, তাহার নাম নাই, ঠিকানা নাই— কিন্তু সে যে স্ত্রীলোক, রমেশের সঙ্গে তাহার বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল ও কমলাকে লইয়াই তাহার সঙ্গে সম্বন্ধ ভাঙিয়া গেছে, তাহা চিঠি হইতে স্পষ্টই বোঝা যায়। যাহাকে চিঠি লিখিতেছে, রমেশ যে তাহাকেই সমস্ত হৃদয় দিয়া ভালোবাসে এবং দৈবদুর্বিপাকে কোথা হইতে কমলা তাহার ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়াতেই অনাথার প্রতি দয়া করিয়া এই ভালোবাসার বন্ধন সে অগত্যা চিরকালের মতো ছিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এ-কথাও চিঠিতে গোপন নাই।

সেই নদীর চরে রমেশের সহিত প্রথম মিলন হওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া আর এই গাজিপুরে আসা পর্যন্ত সমস্ত স্মৃতি কমলা মনে মনে আবৃত্তি করিয়া লইল— যাহা অস্পষ্ট ছিল, সমস্ত স্পষ্ট হইল।

রমেশ যখন বরাবর তাহাকে পরের স্ত্রী বলিয়া জানিতেছে এবং ভাবিয়া অস্থির হইতেছে যে, তাহাকে লইয়া কী করিবে, তখন যে কমলা নিশ্চিন্তমনে তাহাকে স্বামী জানিয়া অসংকোচে তাহার সঙ্গে চিরস্থায়ী ঘরকন্নার সম্পর্ক পাতাইতে বসিতেছে, ইহার লজ্জা কমলাকে বার বার করিয়া তপ্তশেলে বিঁধিতে থাকিল। প্রতিদিনের বিচিত্র ঘটনা মনে পড়িয়া সে যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইতে লাগিল। এ-লজ্জা তাহার জীবনে একেবারে মাখা হইয়া গেছে—ইহা হইতে কিছুতেই আর তাহার উদ্ধার নাই!

রুদ্ধঘরের দরজা খুলিয়া ফেলিয়া কমলা খিড়কির বাগানে বাহির হইয়া পড়িল। অন্ধকার শীতের রাত্রি—কালো আকাশ কালো পাথরের মতো কনকনে ঠাণ্ডা। কোথাও বাষ্পের লেশ নাই; তারাগুলি সুস্পষ্ট জ্বলিতেছে।

সম্মুখে খর্বাকার কলমের আমের বন অন্ধকার বাড়াইয়া দাঁড়াইয়া

রহিল। কমলা কোনোমতেই কিছুই ভাবিয়া পাইল না। সে ঠাণ্ডা ঘাসের উপর বসিয়া পড়িল, কাঠের মূর্তির মতো স্থির হইয়া রহিল— তাহার চোখ দিয়া এক ফোঁটা জল বাহির হইল না।

এমন কতক্ষণ সে বসিয়া থাকিত বলা যায় না— কিন্তু তীব্র শীত তাহার হৃৎপিণ্ডকে দোলাইয়া দিল— তাহার সমস্ত শরীর ঠকঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল। গভীর রাত্রে কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রোদয় যখন নিস্তব্ধ তালবনের অন্তরালে অন্ধকারের একটি প্রান্তকে ছিন্ন করিয়া দিল, তখন কমলা ধীরে ধীরে উঠিয়া ঘরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল।

সকালবেলা কমলা চোখ মেলিয়া দেখিল, শৈল তাহার খাটের পাশে দাঁড়াইয়া আছে। অনেক বেলা হইয়া গেছে বুঝিয়া লজ্জিত কমলা তাড়াতাড়ি বিছানার উপর উঠিয়া বসিল।

শৈল কহিল, "না ভাই, তুমি উঠিয়ো না, আর-একটু ঘুমাও—নিশ্চয় তোমার শরীর ভালো নাই। তোমার মুখ বড়ো শুকনো দেখাইতেছে, চোখের নিচে কালি পড়িয়া গেছে। কী হইয়াছে ভাই, আমাকে বলো না।"—বলিয়া শৈলজা কমলার পাশে বসিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল।

কমলার বুক ফুলিয়া উঠিতে লাগিল— তাহার অশ্রু আর বাধা মানে না। শৈলজার কাঁধের উপর মুখ লুকাইয়া তাহার কান্না একেবারে ফাটিয়া বাহির হইল। শৈল একটি কথাও না বলিয়া তাহাকে দৃঢ় করিয়া আলিঙ্গন করিয়া ধরিল।

একটু পরেই কমলা তাড়াতাড়ি শৈলজার বাহুবন্ধন ছাড়াইয়া উঠিয়া পড়িল— চোখ মুছিয়া ফেলিয়া জোর করিয়া হাসিতে লাগিল। শৈল কহিল, "নাও নাও, আর হাসিতে হইবে না। ঢের ঢের মেয়ে দেখিয়াছি, তোমার মতো এমন চাপা মেয়ে আমি দেখি নাই। কিন্তু তুমি মনে

করিতেছ আমার কাছে লুকাইবে—আমাকে তেমন হাবা পাও নাই। তবে বলিব? রমেশবাবু এলাহাবাদে গিয়া অবধি তোমাকে একখানি চিঠি লেখেননি, তাই রাগ হইয়াছে— অভিমানিনী! কিন্তু তোমারও বোঝা উচিত, তিনি সেখানে কাজে গেছেন, দুদিন বাদেই আসিবেন— ইহার মধ্যে যদি সময় করিয়া উঠিতে না পারেন, তাই বলিয়া কি অত রাগ করিতে আছে। ছি। তাও বলি ভাই, তোমাকে আজ এত উপদেশ দিতেছি— আমি হইলেও ঠিক ওই কাণ্ডটি করিয়া বসিতাম। এমন মিছিমিছি কান্না মেয়েমানুষকে অনেক কাঁদিতে হয়। আবার এই কান্না ঘুচিয়া গিয়া যখন হাসি ফুটিয়া উঠিবে, তখন কিছুই মনে থাকিবে না।"—এই বলিয়া কমলাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া শৈল কহিল, "আজ তুমি মনে করিতেছ, রমেশবাবুকে আর কখনো তুমি মাপ করিবে না— তাই না? আচ্ছা সত্যি বলো।"

কমলা কহিল, "হাঁ, সত্যিই বলিতেছি।"

শৈল কমলার গালে করতলের আঘাত করিয়া কহিল, "ইস্। তাই বই কি। দেখা যাইবে! আচ্ছা বাজি রাখো!"

কমলার সঙ্গে কথাবার্তা হইবার পরেই শৈল এলাহাবাদে তাহার বাপকে চিঠি পাঠাইল। তাহাতে লিখিল, "কমলা রমেশবাবুর কোনো চিঠিপত্র না পাইয়া অত্যন্ত চিন্তিত আছে। একে বেচারা নূতন বিদেশে আসিয়াছে, তাহার 'পরে রমেশবাবু যখন-তখন তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া যাইতেছেন এবং চিঠিপত্র লিখিতেছেন না, ইহাতে তাহার কী কষ্ট হইতেছে, একবার ভাবিয়া দেখো দেখি। তাঁহার এলাহাবাদের কাজ কি আর শেষ হইবে না নাকি। কাজ তো ঢের লোকের থাকে, কিন্তু তাই বলিয়া দুই ছত্র চিঠি লিখিবার কি অবসর পাওয়া যায় না।"

খুড়া রমেশের সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহার কন্যার পত্রের অংশবিশেষ শুনাইয়া ভর্ৎসনা করিলেন।

কমলার দিকে রমেশের মন যথেষ্ট পরিমাণে আকৃষ্ট হইয়াছে, এ-কথা সত্য, কিন্তু আকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়াই তাহার দ্বিধা আরও বাড়িয়া উঠিল।

এই দ্বিধার মধ্যে পড়িয়া রমেশ কোনোমতেই এলাহাবাদ হইতে ফিরিতে পারিতেছিল না। ইতিমধ্যে খুড়ার কাছ হইতে শৈলর চিঠি শুনিল।

চিঠি হইতে বেশ বুঝিতে পারিল, কমলা রমেশের জন্য বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছে—সে কেবল নিজে লজ্জায় লিখিতে পারে নাই।

ইহাতে রমেশের দ্বিধার দুই শাখা দেখিতে দেখিতে একটাতে আসিয়া মিলিয়া গেল। এখন তো রমেশের কেবলমাত্র সুখ-দুঃখ লইয়া কথা নয়, কমলাও যে রমেশকে ভালোবাসিয়াছে। বিধাতা যে কেবল নদীর চরের উপরে তাহাদের দুইজনকে মিলাইয়া দিয়াছেন, তাহা নহে, হৃদয়ের মধ্যেও এক করিয়াছেন।

এই ভাবিয়া রমেশ আর বিলম্বমাত্র না করিয়া কমলাকে এক চিঠি লিখিয়া বসিল। লিখিল—

"প্রিয়তমাসু—

কমলা, তোমাকে এই যে সম্ভাষণ করিলাম, ইহাকে চিঠি লিখিবার একটা প্রচলিত পদ্ধতিপালন বলিয়া গণ্য করিয়ো না। যদি তোমাকে আজ পৃথিবীতে সকলের চেয়ে প্রিয় বলিয়া না জানিতাম, তবে কখনোই আজ "প্রিয়তমা" বলিয়া সম্ভাষণ করিতে পারিতাম না। যদি তোমার মনে কখনো কোনো সন্দেহ হইয়া থাকে, যদি তোমার কোমল হৃদয়ে কখনো কোনো

আঘাত করিয়া থাকি, তবে এই যে আজ সত্য করিয়া তোমাকে ডাকিলাম 'প্রিয়তমা', ইহাতেই আজ তোমার সমস্ত সংশয় সমস্ত বেদনা নিঃশেষে ক্ষালন করিয়া দিক। ইহার চেয়ে তোমাকে আর বেশি বিস্তারিত করিয়া কী বলিব। এ পর্যন্ত আমার অনেক আচরণ তোমার কাছে নিশ্চয় ব্যথাজনক হইয়াছে —সেজন্য যদি তুমি মনে মনে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া থাক, তবে আমি প্রতিবাদী হইয়া তাহার লেশমাত্র প্রতিবাদ করিব না— আমি কেবল বলিব, আজ তুমি আমার প্রিয়তমা, তোমার চেয়ে প্রিয় আমার আর-কেহই নাই— ইহাতেও যদি আমার সমস্ত অপরাধের, সমস্ত অসংগত আচরণের শেষ জবাব না হয়, তবে আর কিছুতেই হইবে না।

"অতএব কমলা, আজ তোমাকে এই 'প্রিয়তমা' সম্বোধন করিয়া আমাদের সংশয়াচ্ছন্ন অতীতকে দূরে সরাইয়া দিলাম, এই 'প্রিয়তমা' সম্বোধন করিয়া আমাদের ভালোবাসার ভবিষ্যৎকে আরম্ভ করিলাম। তোমার কাছে আমার একান্ত মিনতি, তুমি আজ আমার 'প্রিয়তমা' এই কথাটি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করো। ইহা যদি ঠিক তুমি মনে গ্রহণ করিতে পার, তবে কোনো সংশয় লইয়া আমাকে আর-কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন থাকিবে না।

"তাহার পরে, আমি তোমার ভালোবাসা পাইয়াছি কিনা, সে-কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে আমার সাহস হয় না। আমি জিজ্ঞাসা করিবও না। আমার এই অনুচ্চারিত প্রশ্নের অনুকূল উত্তর একদিন তোমার হৃদয়ের ভিতর দিয়া আমার হৃদয়ের মধ্যে নিঃশব্দে আসিয়া পৌঁছিবে, ইহাতে আমি

সন্দেহমাত্র করি না। ইহা আমি আমার ভালোবাসার জোরে বলিতেছি ;—আমার যোগ্যতা লইয়া অহংকার করি না, কিন্তু আমার সাধনা কেন সার্থক হইবে না।

"আমি বেশ বুঝিতেছি, আমি যাহা লিখিতেছি, তাহা কেমন সহজ হইতেছে না— তাহা রচনার মতো শুনাইতেছে— ইচ্ছা করিতেছে, এ-চিঠি ছিঁড়িয়া ফেলি। কিন্তু যে-চিঠি মনের মতো হইবে, সে-চিঠি এখনি লেখা সম্ভব হইবে না। কেননা, চিঠি দুজনের জিনিস— কেবল এক পক্ষ যখন চিঠি লেখে, তখন সে-চিঠিতে সব কথা ঠিক করিয়া লেখা চলে না— তোমাতে আমাতে যেদিন মন-জানাজানির বাকি থাকিবে না, সেইদিনই চিঠির মতো চিঠি লিখিতে পারিব। সামনাসামনি দুই দরজা খোলা থাকিলে তখনি ঘরে অবাধে হাওয়া খেলে। কমলা, প্রিয়তমা, তোমার হৃদয় কবে সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটন করিতে পারিব।

"এসব কথার মীমাংসা ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্রমে হইবে— ব্যস্ত হইয়া ফল নাই। যেদিন আমার চিঠি পাইবে, তাহার পরের দিন সকালবেলাতেই আমি গাজিপুরে পৌঁছিব। তোমার কাছে আমার অনুরোধ এই, গাজিপুরে পৌঁছিয়া আমাদের বাসাতেই যেন তোমাকে দেখিতে পাই। অনেকদিন গৃহহারার মতো কাটিল— আর আমার ধৈর্য নাই— এবারে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিব— হৃদয়লক্ষ্মীকে গৃহলক্ষ্মীর মূর্তিতে দেখিব। সেই মুহূর্তে দ্বিতীয়বার আমাদের শুভদৃষ্টি হইবে। মনে আছে— আমাদের প্রথমবার সেই শুভদৃষ্টি? সেই জ্যোৎস্নারাত্রে, সেই নদীর ধারে, জনশূন্য বালুমরুর মধ্যে? সেখানে ছাদ ছিল না, প্রাচীর ছিল না, পিতামাতাভ্রাতা-আত্মীয়প্রতিবেশীর সম্বন্ধ

ছিল না— সে যে গৃহের একেবারে বাহির। সে যেন স্বপ্ন, সে যেন কিছুই সত্য নহে। সেইজন্য আর একদিন স্নিগ্ধ-নির্মল প্রাতঃকালের আলোকে গৃহের মধ্যে, সত্যের মধ্যে সেই শুভদৃষ্টিকে সম্পূর্ণ করিয়া লইবার অপেক্ষা আছে। পুণ্যপৌষের প্রাতঃকালে আমাদের গৃহদ্বারে তোমার সরল সহাস্য মূর্তিখানি চিরজীবনের মতো আমার হৃদয়ের মধ্যে অঙ্কিত করিয়া লইব, এইজন্য আমি আগ্রহে পরিপূর্ণ হইয়া আছি। প্রিয়তমে, আমি তোমার হৃদয়ের দ্বারে অতিথি— আমাকে ফিরাইয়ো না।

প্রসাদভিক্ষু রমেশ।"

৩৭

শৈল ম্লান কমলাকে একটুখানি উৎসাহিত করিয়া তুলিবার জন্য কহিল, "আজ তোমাদের বাংলায় যাইবে না?"

কমলা কহিল, "না, আর দরকার নাই।"

শৈল। তোমার ঘর-সাজানো শেষ হইয়া গেল?

কমলা। হাঁ ভাই, শেষ হইয়া গেছে।

কিছুক্ষণ পরে আবার শৈল আসিয়া কহিল, "একটা জিনিস যদি দিই তো কী দিবি বল্।"

কমলা কহিল, "আমার কী আছে দিদি।"

শৈল। একেবারে কিছুই নাই?

কমলা। কিছুই না।

শৈল কমলার কপোলে করাঘাত করিয়া কহিল, "ইস্, তাই তো,— যা কিছু ছিল, সমস্ত বুঝি একজনকে সমর্পণ করিয়া দিয়াছিস? এটা

কী বল্‌ দেখি।” বলিয়া শৈল অঞ্চলের ভিতর হইতে একটা চিঠি বাহির করিল।

লেফাফায় রমেশের হস্তাক্ষর দেখিয়া কমলার মুখ তৎক্ষণাৎ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল—সে একটুখানি মুখ ফিরাইল।

শৈল কহিল, “ওগো, আর অভিমান দেখাইতে হইবে না, ঢের হইয়াছে। এদিকে চিঠিখানা ছোঁ মারিয়া লইবার জন্য মনটার ভিতরে ধড়ফড় করিতেছে— কিন্তু মুখ ফুটিয়া না চাহিলে আমি দিব না— কখনো দিব না— দেখি কতক্ষণ পণ রাখিতে পার।”

এমন সময় উমা একটা সাবানের বাক্সে দড়ি বাঁধিয়া টানিয়া আনিয়া কহিল, “মাসী, গ-গ।”

কমলা তাড়াতাড়ি উমিকে কোলে তুলিয়া বারংবার চুমো খাইতে খাইতে শোবার ঘরে লইয়া গেল। উমি তাহার শকটচালনায় অকস্মাৎ বাধাপ্রাপ্ত হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল— কিন্তু কমলা কোনো-মতেই ছাড়িল না—তাহাকে ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া নানাপ্রকার প্রলাপবাক্যে তাহার মনোরঞ্জন-চেষ্টায় প্রবলবেগে প্রবৃত্ত হইল।

শৈল আসিয়া কহিল, “হার মানিলাম— তোরই জিত— আমি তো পারিতাম না। ধন্যি মেয়ে। এই নে ভাই— কেন মিছে অভিশাপ কুড়াইব।”

এই বলিয়া বিছানার উপরে চিঠিখানা ফেলিয়া উমিকে কমলার হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

লেফাফাটা লইয়া একটুখানি নাড়াচাড়া করিয়া কমলা চিঠিখানা খুলিল— প্রথম দুই-চারি লাইনের উপরে দৃষ্টিপাত করিয়াই তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল। লজ্জায় সে চিঠিখানা একবার ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। প্রথম ধাক্কার এই প্রবল বিতৃষ্ণার আক্ষেপ সামলাইয়া লইয়া আবার সেই

চিঠি মাটি হইতে তুলিয়া সমস্তটা সে পড়িল। সমস্তটা সে ভালো করিয়া বুঝিল কি না বুঝিল, জানি না, কিন্তু তার মনে হইল, যেন সে হাতে করিয়া একটা পঙ্কিল পদার্থ নাড়িতেছে। চিঠিখানা আবার সে ফেলিয়া দিল। যে-ব্যক্তি তাহার স্বামী নহে, তাহারই ঘর করিতে হইবে, এই-জন্য এই আহ্বান! রমেশ জানিয়া-শুনিয়া এতদিন পরে তাহাকে এই অপমান করিল! গাজিপুরে আসিয়া রমেশের দিকে কমলা যে তাহার হৃদয় অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল, সে কি রমেশ বলিয়া, না তাহার স্বামী বলিয়া। রমেশ তাহাই লক্ষ্য করিয়াছিল, সেইজন্যই অনাথার প্রতি দয়া করিয়া তাহাকে আজ এই ভালোবাসার চিঠি লিখিয়াছে! ভ্রমক্রমে রমেশের কাছে যেটুকু প্রকাশ পাইয়াছিল, সেটুকু কমলা আজ কেমন করিয়া ফিরাইয়া লইবে—কেমন করিয়া! এমন লজ্জা, এমন ঘৃণা, কমলার অদৃষ্টে কেন ঘটিল। সে জন্মগ্রহণ করিয়া কাহার কাছে কী অপরাধ করিয়াছে। এবারে 'ঘর' বলিয়া একটা বীভৎস জিনিস কমলাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে— কমলা কেমন করিয়া রক্ষা পাইবে। রমেশ যে তাহার কাছে এতবড়ো বিভীষিকা হইয়া উঠিবে, দুই দিন আগে তাহা কি কমলা স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারিত।

ইতিমধ্যে দ্বারের কাছে উমেশ আসিয়া একটুখানি কাসিল। কমলার কাছে কোনো সাড়া না পাইয়া সে আস্তে আস্তে ডাকিল, "মা।" কমলা দ্বারের কাছে আসিল, উমেশ মাথা চুলকাইয়া বলিল, "মা, আজ সিধুবাবুরা মেয়ের বিবাহে কলিকাতা হইতে একটা যাত্রার দল আনাইয়াছেন।"

কমলা কহিল, "বেশ তো উমেশ, তুই যাত্রা শুনিতে যাস।"

উমেশ। কাল সকালে কি ফুল তুলিয়া আনিয়া দিতে হইবে।

কমলা। না না, ফুলের দরকার নেই।

উমেশ যখন চলিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ কমলা তাহাকে ফিরিয়া ডাকিল— কহিল, "ও উমেশ, তুই যাত্রা শুনিতে যাইতেছিস, এই নে, পাঁচটা টাকা নে।"

উমেশ আশ্চর্য হইয়া গেল। যাত্রা শুনিবার সঙ্গে পাঁচটা টাকার কী যোগ, তাহা সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। কহিল, "মা, শহর হইতে কি তোমার জন্য কিছু কিনিয়া আনিতে হইবে।"

কমলা। না না, আমার কিছুই চাইনে। তুই রাখিয়া দে, তোর কাজে লাগিবে।

হতবুদ্ধি উমেশ চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে কমলা আবার তাহাকে ডাকিয়া কহিল, "উমেশ, তুই এই কাপড় পরিয়া যাত্রা শুনিতে যাইবি নাকি— তোকে লোকে বলিবে কী।"

লোকে যে উমেশের নিকট সাজসজ্জাসম্বন্ধে অত্যন্ত বেশি প্রত্যাশা করে এবং ত্রুটি দেখিলে আলোচনা করিয়া থাকে, উমেশের এরূপ ধারণা ছিল না— এই কারণে ধুতির শুভ্রতা ও উত্তরচ্ছদের একান্ত অভাবসম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। কমলার প্রশ্ন শুনিয়া উমেশ কিছু না বলিয়া একটুখানি হাসিল।

কমলা তাহার দুই জোড়া শাড়ি বাহির করিয়া উমেশের কাছে ফেলিয়া দিয়া কহিল, "এই নে, যা, পরিস।"

শাড়ির চওড়া বাহারে পাড় দেখিয়া উমেশ অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, কমলার পায়ের কাছে পড়িয়া ঢিপ করিয়া প্রণাম করিল, এবং হাস্যদমনের বৃথাচেষ্টায় সমস্ত মুখখানাকে বিকৃত করিয়া চলিয়া গেল। উমেশ চলিয়া গেলে কমলা দুই ফোঁটা চোখের জল মুছিয়া জানলার কাছে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শৈল ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল, "ভাই কমল, আমাকে তোর চিঠি দেখাবিনে ?"

কমলার কাছে শৈলের তো কিছুই গোপন ছিল না— তাই শৈল এতদিন পরে সুযোগ পাইয়া এই দাবি করিল।

কমলা কহিল, "ওই যে দিদি, দেখো না।" বলিয়া মেজের উপরে চিঠি পড়িয়া ছিল, দেখাইয়া দিল। শৈল আশ্চর্য হইয়া ভাবিল, "বাস্ রে, এখনো রাগ যায় নাই।" মাটি হইতে শৈল চিঠি তুলিয়া লইয়া সমস্তটা পড়িল। চিঠিতে ভালোবাসার কথা যথেষ্ট আছে বটে, কিন্তু তবু এ কেমনতরো চিঠি। মানুষ আপনার স্ত্রীকে এমনি করিয়া চিঠি লেখে! এ যেন কী-এক-রকম! শৈল জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা ভাই, তোমার স্বামী কি নভেল লেখেন।"

"স্বামী" শব্দটা শুনিয়া চকিতের মধ্যে কমলার দেহমন যেন সংকুচিত হইয়া গেল। সে কহিল, "জানি না।"

শৈল কহিল, "তাহলে আজ তুমি বাংলাতেই যাইবে ?"

কমলা মাথা নাড়িয়া জানাইল যে, যাইবে।

শৈল কহিল, "আমিও আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত তোমার সঙ্গে থাকিতে পারিতাম, কিন্তু জান তো ভাই, আজ নরসিংবাবুর বউ আসিবে। মা বরঞ্চ তোমার সঙ্গে যান।"

কমলা ব্যস্ত হইয়া কহিল, "না না, মা গিয়া কী করিবেন। সেখানে তো চাকর আছে।"

শৈল হাসিয়া কহিল, "আর তোমার বাহন উমেশ আছে, তোমার ভয় কী।"

উমা তখন কাহার একটা পেনসিল সংগ্রহ করিয়া যেখানে-সেখানে আঁচড় কাটিতেছিল, এবং চীৎকার করিয়া অব্যক্ত ভাষা উচ্চারণ

করিতেছিল, মনে করিতেছিল, 'পড়িতেছি'। শৈল তাহার এই সাহিত্যরচনা হইতে তাহাকে বলপূর্বক কাড়িয়া লইল— সে যখন প্রবল তারস্বরে আপত্তিপ্রকাশ করিল, কমলা বলিল, "একটা মজার জিনিস দিতেছি আয়।"

এই বলিয়া ঘরে লইয়া গিয়া তাহাকে বিছানার উপর ফেলিয়া আদরের দ্বারা তাহাকে অত্যন্ত উদ্বেজিত করিয়া তুলিল। সে যখন প্রতিশ্রুত উপহারের দাবি করিল, তখন কমলা তাহার বাক্স খুলিয়া একজোড়া সোনার ব্রেসলেট বাহির করিল। এই দুর্লভ খেলেনা পাইয়া উমি ভারি খুশি হইল। মাসী তাহার হাতে পরাইয়া দিতেই সে সেই ঢলঢলে গহনাজোড়া সমেত দুটি হাত সন্তর্পণে তুলিয়া ধরিয়া সগর্বে তাহার মাকে দেখাইতে গেল। মা ব্যস্ত হইয়া যথাস্থানে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য ব্রেসলেট কাড়িয়া লইল—কহিল, "কমল, তোমার কী-রকম বুদ্ধি। এ-সব জিনিস উহার হাতে দাও কেন।"

এই দুর্ব্যবহারে উমির আর্তনাদের নালিশ গগন ভেদ করিয়া উঠিল। কমল কাছে আসিয়া কহিল, "দিদি, এ-ব্রেসলেটজোড়া আমি উমিকেই দিয়াছি।"

শৈল আশ্চর্য হইয়া কহিল, "পাগল নাকি।"

কমলা কহিল, "আমার মাথা খাও দিদি, এ-ব্রেসলেটজোড়া তুমি আমাকে ফিরাইতে পারিবে না। ইহা ভাঙিয়া উমির হার গড়াইয়া দিয়ো।"

শৈল কহিল, "না, সত্য বলিতেছি, তোর মতো খ্যাপা মেয়ে আমি দেখি নাই।"

এই বলিয়া কমলার গলা জড়াইয়া ধরিল। কমলা কহিল, "তোদের এখান হইতে আমি তো আজ চলিলাম দিদি— খুব সুখে ছিলাম— এমন

সুখ আমার জীবনে কখনো পাই নাই।" বলিতে বলিতে ঝরঝর করিয়া তাহার চোখের জল পড়িতে লাগিল।

শৈলও উদ্গত অশ্রু দমন করিয়া বলিল, "তোর রকমটা কী বল্ দেখি কমল, যেন কতদূরেই যাইতেছিস। যে সুখে ছিলি, সে আর আমার বুঝিতে বাকি নাই—এখন তোর সব বাধা দূর হইল, সুখে আপন ঘরে একলা রাজত্ব করিবি—আমরা কখনো গিয়া পড়িলে ভাবিবি, আপদ বিদায় হইলেই বাঁচি।"

বিদায়কালে কমলা শৈলকে প্রণাম করিলে পর শৈল কহিল, "কাল দুপুরবেলা আমি তোদের ওখানে যাইব।"

কমলা তাহার উত্তরে হাঁ-না কিছুই বলিল না।

বাংলায় গিয়া কমলা দেখিল, উমেশ আসিয়াছে। কমলা কহিল, "তুই যে! যাত্রা শুনিতে যাবি না?"

উমেশ কহিল, "তুমি যে আজ এখানে থাকিবে, আমি—"

কমলা। আচ্ছা আচ্ছা, সে তোর ভাবিতে হইবে না। তুই যাত্রা শুনিতে যা—এখানে বিষণ আছে। যা, দেরি করিসনে।

উমেশ। এখনো তো যাত্রার অনেক দেরি।

কমলা। তা হোক না, বিয়ে-বাড়িতে কত ধুম হইতেছে, ভালো করিয়া দেখিয়া আয় গে যা।

এ-সম্বন্ধে উমেশকে অধিক উৎসাহিত করিবার প্রয়োজন ছিল না। সে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে কমলা হঠাৎ তাহাকে ডাকিয়া কহিল, "দেখ্, খুড়োমশায় আসিলে তুই—"

এইটুকু বলিয়া কথাটা কী করিয়া শেষ করিতে হইবে ভাবিয়া পাইল না। উমেশ হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কমলা খানিকক্ষণ ভাবিয়া কহিল, "মনে রাখিস, খুড়োমশায় তোকে ভালোবাসেন— তোর যখন যা

দরকার হইবে, আমার প্রণাম জানাইয়া তুই তাঁর কাছে চাস, তিনি দিবেন— তাঁকে আমার প্রণাম দিতে কখনো ভুলিসনে—জানিস।”

উমেশ এই অনুশাসনের কোনো অর্থ না বুঝিয়া “যে আজ্ঞে” বলিয়া চলিয়া গেল।

অপরাহ্নে বিষণ জিজ্ঞাসা করিল, “মা-জি, কোথায় যাইতেছ।”

কমলা কহিল, “গঙ্গায় স্নান করিতে চলিয়াছি।”

বিষণ কহিল, “সঙ্গে যাইব ?”

কমলা কহিল, “না, তুই ঘরে পাহারা দে।” বলিয়া তাহার হাতে অনাবশ্যক একটা টাকা দিয়া কমলা গঙ্গার দিকে চলিয়া গেল।

৩৮

একদিন অপরাহ্নে, হেমনলিনীর সহিত একত্রে নিভৃতে চা খাইবার প্রত্যাশায় অন্নদাবাবু তাহাকে সন্ধান করিবার জন্য দোতলায় আসিলেন— দোতলায় বসিবার ঘরে তাহাকে খুঁজিয়া পাইলেন না, শুইবার ঘরেও সে নাই। বেহারাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, হেমনলিনী বাহিরে কোথাও যায় নাই। তখন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া অন্নদা ছাদের উপরে উঠিলেন।

তখন কলিকাতা শহরের নানা আকার ও আয়তনের বহুদূরবিস্তৃত ছাদগুলির উপরে হেমন্তের অবসন্ন রৌদ্র ম্লান হইয়া আসিয়াছে—, দিনান্তের লঘু হাওয়াটি থাকিয়া থাকিয়া যেমন ইচ্ছা ঘুরিয়া ফিরিয়া যাইতেছে। হেমনলিনী চিলের ছাদের প্রাচীরের ছায়ায় চুপ করিয়া বসিয়া ছিল।

অন্নদাবাবু কখন তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তাহা সে

টেরও পাইল না। অবশেষে অন্নদাবাবু যখন আস্তে আস্তে তাহার পাশে আসিয়া তাহার কাঁধে হাত রাখিলেন, তখন সে চমকিয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই লজ্জায় তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল। হেমনলিনী তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িবার পূর্বেই অন্নদাবাবু তাহার পাশে বসিলেন। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "হেম, এই সময়ে তোর মা যদি থাকিতেন! আমি তোর কোনো কাজেই লাগিলাম না।"

বৃদ্ধের মুখে এই করুণ উক্তি শুনিবামাত্র হেমনলিনী যেন একটি সুগভীর মূর্ছার ভিতর হইতে তৎক্ষণাৎ জাগিয়া উঠিল। তাহার বাপের মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখিল। সে-মুখের উপরে কী স্নেহ, কী করুণা, কী বেদনা। এই কয়দিনের মধ্যে সে মুখের কী পরিবর্তনই হইয়াছে। সংসারে হেমনলিনীকে লইয়া যে-ঝড় উঠিয়াছে, তাহার সমস্ত বেগ নিজের উপর লইয়া বৃদ্ধ একলা যুঝিতেছেন —কন্যার আহত হৃদয়ের কাছে বার বার ফিরিয়া ফিরিয়া আসিতেছেন —সান্ত্বনা দিবার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল দেখিয়া আজ হেমনলিনীর মাকে তাঁহার মনে পড়িতেছে এবং আপন অক্ষম স্নেহের অন্তঃস্তর হইতে দীর্ঘনিশ্বাস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে— হঠাৎ হেমনলিনীর কাছে আজ এ-সমস্তই যেন বজ্রের আলোকে প্রকাশ পাইল। ধিক্‌কারের আঘাতে তাহাকে আপন শোকের পরিবেষ্টন হইতে এক মুহূর্তে বাহির করিয়া আনিল। যে-পৃথিবী তাহার কাছে ছায়ার মতো বিলীন হইয়া আসিয়াছিল, তাহা এখনি সত্য হইয়া ফুটিয়া উঠিল। হঠাৎ এই মুহূর্তে হেমনলিনীর মনে অত্যন্ত লজ্জার উদয় হইল। যে-সকল স্মৃতির মধ্যে সে একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া বসিয়া ছিল, সে-সমস্ত বলপূর্বক আপনার চারিদিক হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া সে আপনাকে মুক্তি দিল। জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, তোমার শরীর এখন কেমন আছে।"

শরীর! শরীরটা যে আলোচ্য বিষয়, তাহা অন্নদা এ-কয়দিন একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি কহিলেন, "আমার শরীর। আমার শরীর তো বেশ আছে মা। তোমার যে-রকম চেহারা হইয়া আসিয়াছে, এখন তোমার শরীরের জন্যই আমার ভাবনা। আমাদের শরীর এত বৎসর পর্যন্ত টিঁকিয়া আছে, আমাদের সহজে কিছু হয় না— তোদের এই দেহটুকু যে সেদিনকার, ভয় হয় পাছে ঘা সহিতে না পারে।" এই বলিয়া আস্তে আস্তে তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া দিলেন।

হেমনলিনী জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, বাবা, মা যখন মারা যান, তখন আমি কতবড়ো ছিলাম।"

অন্নদা। তুই তখন তিন বছরের মেয়ে ছিলি, তখন তোর কথা ফুটিয়াছে। আমার বেশ মনে আছে, তুই আমাকে জিজ্ঞাসা করিলি, 'মা কোথা।' আমি বলিলাম, 'মা তাঁর বাবার কাছে গেছেন।' তোর জন্মাবার পূর্বেই তোর মার বাবার মৃত্যু হইয়াছিল, তুই তাঁকে জানিতিস না। আমার কথা শুনিয়া কিছুই বুঝিতে না পারিয়া আমার মুখের দিকে গম্ভীর হইয়া চাহিয়া রহিলি। খানিকক্ষণ বাদে আমার হাত ধরিয়া তোর মার শূন্য শয়নঘরের দিকে লইয়া যাইবার জন্য টানিতে লাগিলি। তোর বিশ্বাস ছিল, আমি তোকে সেখানকার শূন্যতার ভিতর হইতে একটা সন্ধান বলিয়া দিতে পারিব। তুই জানিতিস তোর বাবা মস্ত লোক, এ-কথা তোর মনেও হয় নাই যে, যেগুলো আসল কথা সেগুলোর সম্বন্ধে তোর মস্ত বাবা শিশুরই মতো অজ্ঞ ও অক্ষম। আজও সেই কথা মনে হয় যে, আমরা কত অক্ষম—ঈশ্বর বাপের মনে স্নেহ দিয়াছেন, কিন্তু কত অল্পই ক্ষমতা দিয়াছেন।

এই বলিয়া তিনি হেমনলিনীর মাথার উপরে একবার তাঁহার ডান হাত স্পর্শ করিলেন।

হেমনলিনী পিতার সেই কল্যাণবর্ষী কম্পিতহস্ত নিজের ডান হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া তাহার উপরে অন্য হাত বুলাইতে লাগিল। কহিল, "মাকে আমার খুব অল্প একটুখানি মনে পড়ে। আমার মনে পড়ে— দুপুরবেলায় তিনি বিছানায় শুইয়া বই লইয়া পড়িতেন, আমার তাহা কিছুতেই ভালো লাগিত না, আমি বই কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিতাম।"

ইহা হইতে আবার সেকালের কথা উঠিল। মা কেমন ছিলেন, কী করিতেন, তখন কী হইত, এই আলোচনা হইতে হইতে সূর্য অস্তমিত এবং আকাশ মলিন তাম্রবর্ণ হইয়া আসিল। চারিদিকে কলিকাতার কর্ম ও কোলাহল, তাহারই মাঝখানে একটি গলির বাড়ির ছাদের কোণে এই বৃদ্ধ ও নবীনা দুটিতে মিলিয়া, পিতা ও কন্যার চিরন্তন স্নিগ্ধ সম্বন্ধটিকে সন্ধ্যাকাশের ম্রিয়মাণ ছায়ায় অশ্রুসিক্ত মাধুরীতে ফুটাইয়া তুলিল।

এমন সময়ে সিঁড়িতে যোগেন্দ্রের পায়ের শব্দ শুনিয়া দুইজনের গুঞ্জনালাপ তৎক্ষণাৎ থামিয়া গেল এবং চকিত হইয়া দুইজনেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। যোগেন্দ্র আসিয়া উভয়ের মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল এবং কহিল, "হেমের সভা বুঝি আজকাল এই ছাদেই?"

যোগেন্দ্র অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। ঘরের মধ্যে দিনরাত্রি এই যে একটা শোকের কালিমা লাগিয়াই আছে, ইহাতে তাহাকে প্রায় বাড়ি-ছাড়া করিয়াছে। অথচ বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে গেলে হেমনলিনীর বিবাহ লইয়া নানা জবাবদিহির মধ্যে পড়িতে হয় বলিয়া কোথাও যাওয়াও মুশকিল। সে কেবলই বলিতেছে, "হেমনলিনী অত্যন্ত বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছে। মেয়েদের ইংরেজি গল্পের বই পড়িতে দিলে এইরূপ দুর্গতি ঘটে। হেম ভাবিতেছে, 'রমেশ যখন আমাকে

পরিত্যাগ করিয়াছে, তখন আমার হৃদয় ভাঙিয়া যাওয়া উচিত’, তাই সে আজ খুব সমারোহ করিয়া হৃদয় ভাঙিতে বসিয়াছে। নভেল-পড়া কয়জন মেয়ের ভাগ্যে ভালোবাসার নৈরাশ্য সহিবার এমন চমৎকার সুযোগ ঘটে।”

যোগেন্দ্রের কঠিন বিদ্রূপ হইতে কন্যাকে বাঁচাইবার জন্য অন্নদাবাবু তাড়াতাড়ি বলিলেন, “আমি হেমকে লইয়া একটুখানি গল্প করিতেছি।” যেন তিনিই গল্প করিবার জন্য হেমকে ছাদে টানিয়া আনিয়াছেন।

যোগেন্দ্র কহিল, “কেন, চায়ের টেবিলে কি আর গল্প হয় না। বাবা, তুমিসুদ্ধ হেমকে খ্যাপাইবার চেষ্টায় আছ। এমন করিলে তো বাড়িতে টেকা দায় হয়।”

হেমনলিনী চকিত হইয়া কহিল, “বাবা, এখনো কি তোমার চা খাওয়া হয় নাই।”

যোগেন্দ্র। চা তো কবিকল্পনা নয় যে, সন্ধ্যাবেলাকার আকাশের সূর্যাস্ত-আভা হইতে আপনি ঝরিয়া পড়িবে। ছাদের কোণে বসিয়া থাকিলে চায়ের পেয়ালা ভরিয়া উঠে না, এ-কথাও কি নূতন করিয়া বলিয়া দিতে হইবে।

অন্নদা হেমনলিনীর লজ্জানিবারণের জন্য তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, “আমি যে আজ চা খাইব না বলিয়া ঠিক করিয়াছি।”

যোগেন্দ্র। কেন বাবা, তোমরা সকলেই তপস্বী হইয়া উঠিবে নাকি। তাহা হইলে আমার দশা কী হইবে। বায়ু-আহারটা আমার সহ্য হয় না।

অন্নদা। না না, তপস্যার কথা হইতেছে না; কাল রাত্রে আমার ভালো ঘুম হয় নাই, তাই ভাবিতেছিলাম, আজ চা না খাইয়া দেখা যাক কেমন থাকি।

বস্তুত হেমনলিনীর সঙ্গে কথা কহিবার সময় পরিপূর্ণ চায়ের পেয়ালার ধ্যানমূর্তি অনেকবার অন্নদাবাবুকে প্রলুব্ধ করিয়া গেছে, কিন্তু আজ উঠিতে পারেন নাই। অনেকদিন পরে আজ হেম তাঁহার সঙ্গে সুস্থভাবে কথা কহিতেছে, এই নিভৃত ছাদে দুটিতে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আলাপ জমিয়া উঠিয়াছে, এমন গভীর-নিবিড়-ভাবে আলাপ পূর্বে তো তাঁহার কখনো মনে পড়ে না। এ-আলাপ এক জায়গা হইতে আর-এক জায়গায় তুলিয়া লইয়া যাওয়া সহিবে না— নড়িবার চেষ্টা করিলেই ভীরু হরিণের মতো সমস্ত জিনিস ছুটিয়া পালাইবে। সেইজন্যই অন্নদাবাবু আজ চা-পাত্রের মুহুর্মুহু আহ্বান উপেক্ষা করিয়াছিলেন।

অন্নদাবাবু যে চা-পান রহিত করিয়া অনিদ্রার চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এ-কথা হেমনলিনী বিশ্বাস করিল না— সে কহিল, "চলো বাবা, চা খাইবে চলো। অন্নদাবাবু সেই মুহূর্তেই অনিদ্রার আশঙ্কাটা বিস্মৃত হইয়া ব্যগ্রপদেই টেবিলের অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

চা খাইবার ঘরে প্রবেশ করিয়াই অন্নদাবাবু দেখিলেন, অক্ষয় সেখানে বসিয়া আছে। তাঁহার মনটা উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন, হেমের মন আজ একটুখানি সুস্থ হইয়াছে, অক্ষয়কে দেখিলেই আবার বিকল হইয়া উঠিবে,— কিন্তু এখন আর কোনো উপায় নাই। মুহূর্ত পরেই হেমনলিনী ঘরে প্রবেশ করিল। অক্ষয় তাহাকে দেখিয়াই উঠিয়া পড়িল, কহিল, "যোগেন, আমি আজ তবে আসি।"

হেমনলিনী কহিল, "কেন অক্ষয়বাবু, আপনার কি কোনো কাজ আছে। এক পেয়ালা চা খাইয়া যান।"

হেমনলিনীর এই অভ্যর্থনায় ঘরের সকলেই আশ্চর্য হইয়া গেল। অক্ষয় পুনর্বার আসন গ্রহণ করিয়া কহিল, "আপনাদের অবর্তমানেই

আমি দু-পেয়ালা চা খাইয়াছি—পীড়াপীড়ি করিলে আরও দু-পেয়ালা যে চলে না, তাহা বলিতে পারি না।"

হেমনলিনী হাসিয়া কহিল, "চায়ের পেয়ালা লইয়া আপনাকে কোনোদিন তো পীড়াপীড়ি করিতে হয় নাই।"

অক্ষয় কহিল, "না, ভালো জিনিসকে আমি কখনো প্রয়োজন নাই বলিয়া ফিরিতে দিই না, বিধাতা আমাকে ওইটুকু বুদ্ধি দিয়াছেন।"

যোগেন্দ্র কহিল, "সেই কথা স্মরণ করিয়া ভালো জিনিসও যেন তোমাকে কোনোদিন প্রয়োজন নাই বলিয়া ফিরাইয়া না দেয়, আমি তোমাকে এই আশীর্বাদ করি।"

অনেকদিন পরে অন্নদার চায়ের টেবিলে কথাবার্তা বেশ সহজ-ভাবে জমিয়া উঠিল। সচরাচর হেমনলিনী শান্তভাবে হাসিয়া থাকে, আজ তাহার হাসির ধ্বনি মাঝে মাঝে কথোপকথনের উপরে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। অন্নদাবাবুকে সে ঠাট্টা করিয়া কহিল, "বাবা, অক্ষয়বাবুর অন্যায় দেখো—কয়দিন তোমার পিল না খাইয়াও উনি দিব্যি ভালো আছেন। যদি কিছুমাত্র কৃতজ্ঞতা থাকিত, তবে অন্তত মাথাও ধরিত।"

যোগেন্দ্র। ইহাকেই বলে পিল-হারামি।

অন্নদাবাবু অত্যন্ত খুশি হইয়া হাসিতে লাগিলেন। অনেকদিন পরে আবার যে তাঁহার পিল-বাক্সের উপরে আত্মীয়স্বজনের কটাক্ষপাত আরম্ভ হইয়াছে, ইহা তিনি পারিবারিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ বলিয়া গণ্য করিলেন, তাঁহার মন হইতে একটা ভার নামিয়া গেল।

তিনি কহিলেন, "এই বুঝি! লোকের বিশ্বাসে হস্তক্ষেপ! আমার পিলাহারী দলের মধ্যে ওই একটিমাত্র অক্ষয় আছে— তাহাকেও ভাঙাইয়া লইবার চেষ্টা!"

অক্ষয় কহিল, “সে-ভয় করিবেন না অন্নদাবাবু। অক্ষয়কে ভাঙাইয়া লওয়া শক্ত।”

যোগেন্দ্র। মেকি টাকার মতো— ভাঙাইতে গেলে পুলিস-কেশ হইবার সম্ভাবনা।

এইরূপে হাস্যালাপে অন্নদাবাবুর চায়ের টেবিলের উপর হইতে যেন অনেকদিনের এক ভূত ছাড়িয়া গেল।

আজিকার এই চায়ের সভা শীঘ্র ভাঙিত না— কিন্তু আজ যথাসময়ে হেমনলিনীর চুলবাঁধা হয় নাই বলিয়া তাহাকে উঠিয়া যাইতে হইল— তখন অক্ষয়েরও একটা বিশেষ কাজের কথা মনে পড়িল— সেও চলিয়া গেল।

যোগেন্দ্র কহিল, “বাবা, আর বিলম্ব নয়— এইবেলা হেমের বিবাহের যোগাড় করো।”

অন্নদাবাবু অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন। যোগেন্দ্র কহিল, “রমেশের সহিত বিবাহ ভাঙিয়া-যাওয়া লইয়া সমাজে অত্যন্ত কানাকানি চলিতেছে— ইহা লইয়া কাঁহাতক সকল লোকের সঙ্গে আমি একলা ঝগড়া করিয়া বেড়াইব। সকল কথা যদি খোলসা করিয়া বলিবার জো থাকিত, তাহা হইলে ঝগড়া করিতে আপত্তি করিতাম না। কিন্তু হেমের জন্য মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারি না— কাজেই হাতাহাতি করিতে হয়। সেদিন অখিলকে চাবকাইয়া আসিতে হইয়াছিল— শুনিলাম, সে-লোকটা যাহা মুখে আসে তাহাই বলিয়াছিল। শীঘ্র যদি হেমের বিবাহ হইয়া যায়, তাহা হইলে সমস্ত কথা চুকিয়া যায় এবং আমাকেও পৃথিবীসুদ্ধ লোককে দিনরাত্রি আস্তিন তুলিয়া শাসাইয়া বেড়াইতে হয় না। আমার কথা শোনো, আর দেরি করিয়ো না।”

অন্নদা। বিবাহ কাহার সঙ্গে হইবে যোগেন?

যোগেন্দ্র। একটিমাত্র লোক আছে। যে-কাণ্ড হইয়া গেল এবং যে-সমস্ত কথাবার্তা উঠিয়াছে, তাহাতে পাত্র পাওয়া অসম্ভব। কেবল বেচারা অক্ষয় রহিয়াছে— তাহাকে কিছুতেই দমাইতে পারে না। তাহাকে পিল খাইতে বল পিল খাইবে, বিবাহ করিতে বল বিবাহ করিবে।

অন্নদা। পাগল হইয়াছ যোগেন? অক্ষয়কে হেম বিবাহ করিবে!

যোগেন্দ্র। তুমি যদি গোল না কর তো আমি তাহাকে রাজি করিতে পারি।

অন্নদা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া কহিলেন, "না যোগেন না, তুমি হেমকে কিছুই বোঝ না। তুমি তাহাকে ভয় দেখাইয়া, কষ্ট দিয়া, অস্থির করিয়া তুলিবে। এখন তাহাকে কিছুদিন সুস্থ থাকিতে দাও— সে-বেচারা অনেক কষ্ট পাইয়াছে, বিবাহের ঢের সময় আছে।"

যোগেন্দ্র কহিল, "আমি তাহাকে কিছুমাত্র পীড়ন করিব না, যতদূর সাবধানে ও মৃদুভাবে কাজ উদ্ধার করিতে হয়, তাহার ত্রুটি হইবে না। তোমরা কি মনে কর, আমি ঝগড়া না করিয়া কথা কহিতে পারি না।"

যোগেন্দ্র অধীরপ্রকৃতির লোক। সেইদিন সন্ধ্যাবেলায় চুলবাঁধা সারিয়া হেমনলিনী বাহির হইবামাত্র যোগেন্দ্র তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "হেম, একটা কথা আছে।"

কথা আছে শুনিয়া হেমের হৃৎকম্প হইল। যোগেন্দ্রের অনুবর্তী হইয়া আস্তে আস্তে বসিবার ঘরে আসিয়া বসিল। যোগেন্দ্র কহিল, "হেম, বাবার শরীরটা কী-রকম খারাপ হইয়াছে দেখিয়াছ?"

হেমনলিনীর মুখে একটা উদ্‌বেগ প্রকাশ পাইল; সে কোনো কথা কহিল না।

যোগেন্দ্র। আমি বলিতেছি, ইহার একটা প্রতিকার না করিলে উনি একটা শক্ত ব্যামোয় পড়িবেন।

হেমনলিনী বুঝিল, পিতার এই অস্বাস্থ্যের জন্য অপরাধ তাহারই উপরে পড়িতেছে। সে মাথা নিচু করিয়া ম্লানমুখে কাপড়ের পাড় লইয়া টানিতে লাগিল।

যোগেন্দ্র কহিল, "যা হইয়া গেছে, সে তো হইয়াই গেছে, তাহা লইয়া যতই আক্ষেপ করিতে থাকিব, ততই আমাদের লজ্জার কথা। এখন বাবার মনকে যদি সম্পূর্ণ সুস্থ করিতে চাও, তবে যত শীঘ্র পার, এই সমস্ত অপ্রিয় ব্যাপারের একেবারে গোড়া মারিয়া ফেলিতে হইবে।"

এই বলিয়া উত্তর প্রত্যাশা করিয়া যোগেন্দ্র হেমনলিনীর মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল।

হেম সলজ্জমুখে কহিল, "এ-সমস্ত কথা লইয়া আমি যে কোনোদিন বাবাকে বিরক্ত করিব, এমন সম্ভাবনা নাই।"

যোগেন্দ্র। তুমি তো করিবে না জানি, কিন্তু তাহাতে তো অন্য লোকের মুখ বন্ধ হইবে না।

হেম কহিল, "তা আমি কী করিতে পারি বলো।"

যোগেন্দ্র। চারিদিকে এই যে সব নানা কথা উঠিয়াছে, তাহা বন্ধ করিবার একটিমাত্র উপায় আছে।

যোগেন্দ্র যে উপায় মনে মনে ঠাওরাইয়াছে, হেমনলিনী তাহা বুঝিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি কহিল, "এখনকার মতো কিছুদিন বাবাকে লইয়া পশ্চিমে বেড়াইতে গেলে ভালো হয় না? দু-চার মাস কাটাইয়া আসিলে ততদিনে সমস্ত গোল থামিয়া যাইবে।"

যোগেন্দ্র কহিল, "তাহাতেও সম্পূর্ণ ফল হইবে না। তোমার মনে

কোনো ক্ষোভ নাই, যতদিন বাবা এ-কথা নিশ্চয় না বুঝিতে পারিবেন, ততদিন তাঁহার মনে শেল বিঁধিয়া থাকিবে—ততদিন তাঁহাকে কিছুতেই সুস্থ হইতে দিবে না।”

দেখিতে দেখিতে হেমনলিনীর দুই চোখ জলে ভাসিয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি জল মুছিয়া ফেলিল—কহিল, “আমাকে কী করিতে বল।”

যোগেন্দ্র কহিল, “তোমার কানে কঠোর শুনাইবে আমি জানি, কিন্তু সকল দিকের মঙ্গল যদি চাও, তোমাকে কালবিলম্ব না করিয়া বিবাহ করিতে হইবে।”

হেমনলিনী স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। যোগেন্দ্র অধৈর্য সংবরণ করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল, “হেম, তোমরা কল্পনাদ্বারা ছোটো কথাকে বড়ো করিয়া তুলিতে ভালোবাস। তোমার বিবাহসম্বন্ধে যেমন গোলমাল ঘটিয়াছে, এমন কত মেয়ের ঘটিয়া থাকে— আবার চুকিয়া-বুকিয়া পরিষ্কার হইয়া যায়— নহিলে, ঘরের মধ্যে কথায় কথায় নভেল তৈরি হইতে থাকিলে তো লোকের প্রাণ বাঁচে না। চিরজীবন সন্ন্যাসিনী হইয়া ছাদে বসিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকিব, সেই অপদার্থ মিথ্যাচারীটার স্মৃতি হৃদয়-মন্দিরে স্থাপন করিয়া পূজা করিব, —পৃথিবীর লোকের সামনে এই সমস্ত কাব্য করিতে তোমরা লজ্জা করিবে না,— কিন্তু আমরা যে লজ্জায় মরিয়া যাই। ভদ্র গৃহস্থঘরে বিবাহ করিয়া এই সমস্ত লক্ষ্মীছাড়া কাব্য, যত শীঘ্র পার চুকাইয়া ফেলো।”

লোকের চোখের সামনে কাব্য হইয়া উঠিবার লজ্জা যে কতখানি তাহা হেমনলিনী বিলক্ষণ জানে, এইজন্য যোগেন্দ্রের বিদ্রূপবাক্য তাহাকে ছুরির মতো বিঁধিল। সে কহিল, “দাদা, আমি কি বলিতেছি সন্ন্যাসিনী হইয়া থাকিব, বিবাহ করিব না।”

যোগেন্দ্র কহিল, “তাহা যদি না বলিতে চাও তো বিবাহ করো।

অবশ্য, তুমি যদি বল, স্বর্গরাজ্যের ইন্দ্রদেবকে না হইলে তোমার পছন্দ হইবে না, তাহা হইলে সেই সন্ন্যাসিনীব্রতই গ্রহণ করিতে হয়। পৃথিবীতে মনের মতো কটা জিনিসই বা মেলে—যাহা পাওয়া যায়, মনকে তাহারই মতো করিয়া লইতে হয়। আমি তো বলি, ইহাতেই মানুষের যথার্থ মহত্ত্ব।"

হেমনলিনী মর্মাহত হইয়া কহিল, "দাদা, তুমি আমাকে এমন করিয়া খোঁটা দিয়া কথা বলিতেছ কেন। আমি কি তোমাকে পছন্দ লইয়া কোনো কথা বলিয়াছি।"

যোগেন্দ্র। বল নাই বটে, কিন্তু আমি দেখিয়াছি— অকারণে এবং অন্যায় কারণে তোমার কোনো কোনো হিতৈষী বন্ধুর উপরে তুমি স্পষ্ট বিদ্বেষপ্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হও না। কিন্তু এ-কথা তোমাকে স্বীকার করিতেই হইবে, এ-জীবনে যত লোকের সঙ্গে তোমার আলাপ হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে একজন লোককে দেখা গেছে—যে ব্যক্তি সুখে-দুঃখে মানে-অপমানে তোমার প্রতি হৃদয় স্থির রাখিয়াছে। এই কারণে আমি তাহাকে মনে মনে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। তোমাকে সুখী করিবার জন্য জীবন দিতে পারে, এমন স্বামী যদি চাও, তবে সে-লোককে খুঁজিতে হইবে না। আর যদি কাব্য করিতে চাও তবে—

হেমনলিনী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "এমন করিয়া তুমি আমাকে বলিয়ো না। বাবা আমাকে যেরূপ আদেশ করিবেন, যাহাকে বিবাহ করিতে বলিবেন, আমি পালন করিব। যদি না করি, তখন তোমার কাব্যের কথা তুলিয়ো।"

যোগেন্দ্র তৎক্ষণাৎ নরম হইয়া কহিল, "হেম, রাগ করিয়ো না বোন। আমার মন খারাপ হইয়া গেলে মাথার ঠিক থাকে না জান তো— তখন যাহা মুখে আসে, তাহাই বলিয়া বসি। আমি কি ছেলেবেলা হইতে

তোমাকে দেখি নাই— আমি কি জানি না, লজ্জা তোমার পক্ষে কত স্বাভাবিক এবং বাবাকে তুমি কত ভালোবাস।”

এই বলিয়া যোগেন্দ্র অন্নদাবাবুর ঘরে চলিয়া গেল। যোগেন্দ্র তাহার বোনের উপর না জানি কিরূপ উৎপীড়ন করিতেছে, তাহাই কল্পনা করিয়া অন্নদা তাঁহার ঘরে উদ্‌বিগ্ন হইয়া বসিয়া ছিলেন— ভাই-বোনের কথোপকথনের মাঝখানে গিয়া পড়িবার জন্য উঠি-উঠি করিতেছিলেন, এমন সময় যোগেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইল— অন্নদা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

যোগেন্দ্র কহিল, “বাবা, হেম বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছে। তুমি মনে করিতেছ, আমি বুঝি খুব বেশি জেদ করিয়া তাহাকে রাজি করাইয়াছি— তাহা মোটেই নয়। এখন, তুমি তাহাকে একবার মুখ ফুটিয়া বলিলেই সে অক্ষয়কে বিবাহ করিতে আপত্তি করিবে না।”

অন্নদা কহিলেন, “আমাকে বলিতে হইবে ?”

যোগেন্দ্র। তুমি না বলিলে সে কি নিজে আসিয়া বলিবে, ‘আমি অক্ষয়কে বিবাহ করিব’ ? আচ্ছা, নিজের মুখে তোমার বলিতে যদি সংকোচ হয়, তবে আমাকে অনুমতি করো, আমি তোমার আদেশ তাহাকে জানাই গে।

অন্নদা ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “না না, আমার যাহা বলিবার, আমি নিজেই বলিব। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি করিবার প্রয়োজন কী। আমার মতে আর-কিছুদিন যাইতে দেওয়া উচিত।”

যোগেন্দ্র কহিল, “না বাবা, বিলম্বে নানা বিঘ্ন হইতে পারে—এ-রকম ভাবে বেশিদিন থাকা কিছু নয়।”

যোগেন্দ্রের জেদের কাছে বাড়ির কাহারো পারিবার জো নাই— সে যাহা ধরিয়া বসে, তাহা সাধন না করিয়া ছাড়ে না। অন্নদা তাহাকে

মনে মনে ভয় করেন। তিনি আপাতত কথাটাকে ঠেকাইয়া রাখিবার জন্য বলিলেন, "আচ্ছা, আমি বলিব।"

যোগেন্দ্র কহিল, "বাবা, আজই বলিবার উপযুক্ত সময়। সে তোমার আদেশের জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। আজই যা হয় একটা শেষ করিয়া ফেলো।"

অন্নদা বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। যোগেন্দ্র কহিল, "বাবা, তুমি ভাবিলে চলিবে না— হেমের কাছে একবার চলো।"

অন্নদা কহিলেন, "যোগেন, তুমি থাকো, আমি একলা তাহার কাছে যাইব।"

যোগেন্দ্র কহিল, "আচ্ছা, আমি এইখানেই বসিয়া রহিলাম।"

অন্নদা বসিবার ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, ঘর অন্ধকার। তাড়াতাড়ি একটা কৌচের উপর হইতে কে একজন ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং পরক্ষণেই একটি অশ্রু-আর্দ্র কণ্ঠ কহিল, "বাবা, আলো নিবিয়া গেছে। বেহারাকে জ্বালিতে বলি।"

আলো নিবিবার কারণ অন্নদা ঠিক বুঝিতে পারিলেন— তিনি বলিলেন, "থাক্ না মা, আলোর দরকার কী।" বলিয়া হাতড়াইয়া হেমনলিনীর কাছে আসিয়া বসিলেন।

হেম কহিল, "বাবা, তোমার শরীরের তুমি যত্ন করিতেছ না।"

অন্নদা কহিলেন, "তাহার বিশেষ কারণ আছে মা— শরীরটা বেশ ভালো আছে বলিয়াই যত্ন করি না। তোমার শরীরটার দিকে তুমি একটু তাকাইয়ো হেম।"

হেমনলিনী ক্ষুণ্ন হইয়া বলিয়া উঠিল, "তোমরা সকলেই ওই একই কথা বলিতেছ— ভারি অন্যায় বাবা। আমি তো বেশ সহজ মানুষেরই মতো আছি— শরীরের অযত্ন করিতে আমাকে কী দেখিলে বলো তো।

যদি তোমাদের মনে হয়, শরীরের জন্য আমার কিছু করা আবশ্যক, আমাকে বল না কেন। আমি কি কখনো তোমার কোনো কথায় 'না' বলিয়াছি বাবা।" শেষের দিকে কণ্ঠস্বরটা দ্বিগুণ আর্দ্র শুনাইল।

অন্নদা ব্যস্ত ও ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, "কখনো না মা। তোমাকে কখনো কিছু বলিতেও হয় নাই— তুমি আমার মা কিনা, তাই তুমি আমার অন্তরের কথা জান— তুমি আমার ইচ্ছা বুঝিয়া কাজ করিয়াছ। আমার একান্ত মনের আশীর্বাদ যদি ব্যর্থ না হয়, তবে ঈশ্বর তোমাকে চিরসুখিনী করিবেন।"

হেম কহিল, "বাবা, আমাকে কি তোমার কাছে রাখিবে না।"

অন্নদা। কেন রাখিব না।

হেম। যতদিন না দাদার বউ আসে, অন্তত ততদিন তো থাকিতে পারি। আমি না থাকিলে তোমাকে কে দেখিবে।

অন্নদা। আমাকে দেখা! ও কথা বলিস্‌নে মা। আমাকে দেখিবার জন্য তোদের লাগিয়া থাকিতে হইবে, আমার সে-মূল্য নাই।

হেম কহিল, "বাবা, ঘর বড়ো অন্ধকার— আলো আনি।" বলিয়া পাশের ঘর হইতে একটা হাতলণ্ঠন আনিয়া ঘরে রাখিল। কহিল, "কয়দিন গোলমালে সন্ধ্যাবেলায় তোমাকে খবরের কাগজ পড়িয়া শোনানো হয় নাই। আজকে শোনাইব।"

অন্নদা উঠিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, একটু বোস্‌ মা, আমি আসিয়া শুনিতেছি।" বলিয়া যোগেন্দ্রের কাছে গেলেন। মনে করিয়াছিলেন বলিবেন,—আজ কথা হইতে পারিল না, আর-একদিন হইবে। কিন্তু যেই যোগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "কী হইল বাবা। বিবাহের কথা বলিলে?" অমনি তাড়াতাড়ি কহিলেন, "হাঁ বলিয়াছি।" তাঁহার ভয় ছিল, পাছে যোগেন্দ্র নিজে গিয়া হেমনলিনীকে ব্যথিত করিয়া তোলে।

যোগেন্দ্র কহিল, "সে অবশ্য রাজি হইয়াছে?"

অন্নদা। হাঁ, এক রকম রাজি বইকি।

যোগেন্দ্র কহিল, "তবে আমি অক্ষয়কে বলিয়া আসি গে।"

অন্নদা ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "না না, অক্ষয়কে এখন কিছু বলিয়ো না। বুঝিয়াছ যোগেন, অত বেশি তাড়াতাড়ি করিতে গেলে সমস্ত ফাঁসিয়া যাইবে। এখন কাহাকেও কিছু বলিবার দরকার নাই—আমরা বরঞ্চ একবার পশ্চিমে বেড়াইয়া আসি গে, তারপরে সমস্ত ঠিক হইবে।"

যোগেন্দ্র সে-কথার কোনো উত্তর না করিয়া চলিয়া গেল। কাঁধে একখানা চাদর ফেলিয়া একেবারে অক্ষয়ের বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইল। অক্ষয় তখন একখানি ইংরেজি মহাজনী হিসাবের বই লইয়া বুক-কীপিং শিখিতেছিল। যোগেন্দ্র তাহার খাতাপত্র টান দিয়া ফেলিয়া কহিল, "ও সব পরে হইবে, এখন তোমার বিবাহের দিন ঠিক করো।"

অক্ষয় কহিল, "বল কী।"

৩৯

পরদিন হেমনলিনী প্রত্যুষে উঠিয়া যখন প্রস্তুত হইয়া বাহির হইল, তখন দেখিল, অন্নদাবাবু তাঁহার শোবার ঘরের জানালার কাছে একটা ক্যাম্বিসের কেদারা টানিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। ঘরে আসবাব অধিক নাই; একটি খাট আছে, এক কোণে একটি আলমারি— একটি দেয়ালে অন্নদাবাবুর পরলোকগতা স্ত্রীর একটি ছায়াপ্রায় বিলীয়মান বাঁধানো ফোটোগ্রাফ— এবং তাহারই সম্মুখের দেয়ালে সেই তাঁহার পত্নীর স্বহস্তরচিত একখণ্ড পশমের কারুকার্য। স্ত্রীর জীবদ্দশায়

আলমারিতে যে-সমস্ত টুকিটাকি শৌখিন জিনিস যেমনভাবে সজ্জিত ছিল, আজও তাহারা তেমনি রহিয়াছে।

পিতার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া পাকা চুল তুলিবার ছলে মাথায় কোমল অঙ্গুলিগুলি চালনা করিয়া হেম বলিল, "বাবা, চলো, আজ সকাল-সকাল চা খাইয়া লইবে। তারপরে তোমার ঘরে বসিয়া তোমার সেকালের গল্প শুনিব—সে-সব কথা আমার কত ভালো লাগে, বলিতে পারি না।"

হেমনলিনী সম্বন্ধে অন্নদাবাবুর বোধশক্তি আজকাল এমনি প্রখর হইয়া উঠিয়াছে যে, এই চা খাইতে তাড়া দিবার কারণ বুঝিতে তাঁহার কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। আর-কিছু পরেই অক্ষয় চায়ের টেবিলে আসিয়া উপস্থিত হইবে— তাহারই সঙ্গ এড়াইবার জন্য তাড়াতাড়ি চা খাওয়া সারিয়া লইয়া হেম পিতার কক্ষে নিভৃতে আশ্রয় লইতে ইচ্ছা করিয়াছে, ইহা তিনি মুহূর্তেই বুঝিতে পারিলেন। ব্যাধভয়ে ভীত হরিণীর মতো তাঁহার কন্যা যে সর্বদা ত্রস্ত হইয়া আছে, ইহা তাঁহার মনে অত্যন্ত বাজিল।

নিচে গিয়া দেখিলেন, চাকর এখনো চায়ের জল তৈরি করে নাই। তাহার উপরে হঠাৎ অত্যন্ত রাগিয়া উঠিলেন— সে বৃথা বুঝাইবার চেষ্টা করিল যে, আজ নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই চায়ের তলব হইয়াছে। চাকররা সব বাবু হইয়া উঠিয়াছে, তাহার ঘুম ভাঙাইবার জন্য আবার অন্য লোক রাখা দরকার হইয়াছে— এইরূপ মত তিনি অত্যন্ত নিঃসংশয়ে প্রচার করিলেন।

চাকর তো তাড়াতাড়ি চায়ের জল আনিয়া উপস্থিত করিল। অন্নদাবাবু অন্যদিন যেরূপ গল্প করিতে করিতে ধীরে-সুস্থে-আরামে চা-রস উপভোগ করিতেন আজ তাহা না করিয়া অনাবশ্যক সত্বরতার সহিত পেয়ালা নিঃশেষ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হেমনলিনী কিছু আশ্চর্য হইয়া

কহিল, “বাবা, আজ কি তোমার কোথাও বাহির হইবার তাড়া আছে।”

অন্নদাবাবু কহিলেন, “কিছু না, কিছু না। ঠাণ্ডার দিনে গরম চা-টা এক চুমুকে খাইয়া লইলে বেশ ঘামিয়া শরীরটা হালকা হইয়া যায়।”

কিন্তু অন্নদাবাবুর শরীরে ঘর্ম নির্গত হইবার পূর্বেই যোগেন্দ্র অক্ষয়কে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। আজ অক্ষয়ের বেশভূষায় একটু বিশেষ পারিপাট্য ছিল। হাতে রুপা-বাঁধানো ছড়ি—বুকের কাছে ঘড়ির চেন ঝুলিতেছে— বাম হাতে একটা ব্রাউন কাগজে মোড়া কেতাব। অন্যদিন অক্ষয় টেবিলের যে-অংশে বসে আজ সেখানে না বসিয়া হেমনলিনীর অনতিদূরে একটা চৌকি টানিয়া লইল— হাসিমুখে কহিল, “আপনাদের ঘড়ি আজ দ্রুত চলিতেছে।”

হেমনলিনী অক্ষয়ের মুখের দিকে চাহিল না, তাহার কথার উত্তরমাত্র দিল না। অন্নদাবাবু কহিলেন, “হেম, চলো তো মা উপরে। আমার গরম কাপড়গুলা একবার রৌদ্রে দেওয়া দরকার।” যোগেন্দ্র কহিল, “বাবা, রৌদ্র তো পালাইতেছে না— এত তাড়াতাড়ি কেন। হেম, অক্ষয়কে এক পেয়ালা চা ঢালিয়া দাও। আমারও চায়ের দরকার আছে —কিন্তু অতিথি আগে।”

অক্ষয় হাসিয়া হেমনলিনীকে কহিল, “কর্তব্যের খাতিরে এতবড়ো আত্মত্যাগ দেখিয়াছেন? দ্বিতীয় সার ফিলিপ সিড্‌নি।”

হেমনলিনী অক্ষয়ের কথায় লেশমাত্র অবধান প্রকাশ না করিয়া দুই পেয়ালা চা প্রস্তুত করিয়া এক পেয়ালা যোগেন্দ্রকে দিল ও অপর পেয়ালাটি অক্ষয়ের অভিমুখে ঈষৎ একটু ঠেলিয়া দিয়া অন্নদাবাবুর মুখের দিকে তাকাইল। অন্নদাবাবু কহিলেন, “রৌদ্র বাড়িয়া উঠিলে কষ্ট হইবে —চলো, এইবেলা চলো।”

যোগেন্দ্র কহিল, "আজ কাপড় রৌদ্রে দেওয়া থাক্ না। অক্ষয় আসিয়াছে—"

অন্নদা হঠাৎ উদ্দীপ্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "তোমাদের কেবলই জবরদস্তি। তোমরা কেবল জেদ করিয়া অন্য লোকের মর্মান্তিক বেদনার উপর দিয়া নিজের ইচ্ছাকে জারি করিতে চাও। আমি অনেকদিন নীরবে সহ্য করিয়াছি, কিন্তু আর এরূপ চলিবে না। মা হেম, কাল হইতে উপরে আমার ঘরে তোতে-আমাতে চা খাইব।"

এই বলিয়া হেমকে লইয়া অন্নদা চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে হেম শান্তস্বরে কহিল, "বাবা, আর একটু বসো। আজ তোমার ভালো করিয়া চা খাওয়া হইল না। অক্ষয়বাবু, কাগজে-মোড়া এই রহস্যটি কী, জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি।"

অক্ষয় কহিল, "শুধু জিজ্ঞাসা কেন, এ-রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতেও পারেন।" এই বলিয়া মোড়কটি হেমনলিনীর দিকে অগ্রসর করিয়া দিল।

হেম খুলিয়া দেখিল, একখানি মরক্কো-বাঁধানো টেনিসন। হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া উঠিল। ঠিক এই টেনিসন, এইরূপ বাঁধানো, সে পূর্বে উপহার পাইয়াছে—এবং সেই বইখানি আজও তাহার শোবার ঘরের দেরাজের মধ্যে গোপন সমাদরে রক্ষিত আছে।

যোগেন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "রহস্য এখনো সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত হয় নাই।" এই বলিয়া বইয়ের প্রথম শূন্য পাতাটি খুলিয়া তাহার হাতে তুলিয়া দিল। সেই পাতায় লেখা আছে— শ্রীমতী হেমনলিনীর প্রতি অক্ষয়-শ্রদ্ধার উপহার।

তৎক্ষণাৎ বইখানা হেমের হাত হইতে একেবারে ভূতলে পড়িয়া গেল এবং তৎপ্রতি সে লক্ষ্যমাত্র না করিয়া কহিল, "বাবা, চলো।"

উভয়ে ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। যোগেন্দ্রের চোখ দুটা আগুনের মতো জ্বলিতে লাগিল। সে কহিল, "না, আমার আর এখানে থাকা পোষাইল না। আমি যেখানে হোক একটা ইস্কুলমাস্টারি লইয়া এখান হইতে চলিয়া যাইব।"

অক্ষয় কহিল, "ভাই, তুমি মিথ্যা রাগ করিতেছ। আমি তো তখনি সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলাম যে, তুমি ভুল বুঝিয়াছ। তুমি আমাকে বারংবার আশ্বাস দেওয়াতেই আমি বিচলিত হইয়াছিলাম, কিন্তু আমি নিশ্চয় বলিতেছি আমার প্রতি হেমনলিনীর মন কোনোদিন অনুকূল হইবে না। অতএব সে-আশা ছাড়িয়া দাও। কিন্তু আসল কথা এই যে, উনি যাহাতে রমেশকে ভুলিতে পারেন, সেটা তোমাদের করা কর্তব্য।"

যোগেন্দ্র কহিল, "তুমি তো বলিলে কর্তব্য— উপায়টা কী শুনি।"

অক্ষয় কহিল, "আমি ছাড়া জগতে আর বিবাহযোগ্য যুবাপুরুষ নাই নাকি। আমি দেখিতেছি, তুমি যদি তোমার বোন হইতে, তবে আমার আইবড়ো নাম ঘোচাইবার জন্য পিতৃপুরুষদিগকে হতাশভাবে দিন গণনা করিতে হইত না। যেমন করিয়া হোক, একটি ভালো পাত্র যোগাড় করা চাই,—যাহার প্রতি তাকাইবামাত্র অবিলম্বে কাপড় রৌদ্রে দিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া না ওঠে।"

যোগেন্দ্র। পাত্র তো ফরমাশ দিয়া মেলে না।

অক্ষয়। তুমি একেবারে এত অল্পেই হাল ছাড়িয়া দিয়া বস কেন। পাত্রের সন্ধান আমি বলিতে পারি, কিন্তু তাড়াহুড়া যদি কর, তবে সমস্ত মাটি হইয়া যাইবে। প্রথমেই বিবাহের কথা পাড়িয়া দুই পক্ষকে সশঙ্কিত করিয়া তুলিলে চলিবে না। আস্তে আস্তে আলাপ-পরিচয় জমিতে দাও, তাহার পরে সময় বুঝিয়া দিনস্থির করিয়ো।

যোগেন্দ্র। প্রণালীটি অতি উত্তম, কিন্তু লোকটি কে শুনি।

অক্ষয়। তুমি তাহাকে তেমন ভালো করিয়া জান না, কিন্তু দেখিয়াছ। নলিনাক্ষ ডাক্তার।

যোগেন্দ্র। নলিনাক্ষ!

অক্ষয়। চমকাও কেন। তাহাকে লইয়া ব্রাহ্মসমাজে গোলমাল চলিতেছে, চলুক না। তা বলিয়া অমন পাত্রটিকে হাতছাড়া করিবে?

যোগেন্দ্র। আমি হাত তুলিয়া লইলেই অমনি পাত্র যদি হাতছাড়া হইত, তাহা হইলে ভাবনা কী ছিল। কিন্তু নলিনাক্ষ বিবাহ করিতে কি রাজি হইবেন।

অক্ষয়। আজই হইবেন, এমন কথা বলিতে পারি না— কিন্তু সময়ে কী না হইতে পারে। যোগেন, আমার কথা শোনো। কাল নলিনাক্ষের বক্তৃতার দিন আছে— সেই বক্তৃতায় হেমনলিনীকে লইয়া যাও। লোকটার বলিবার ক্ষমতা আছে। স্ত্রীলোকের চিত্ত-আকর্ষণের পক্ষে ওই ক্ষমতাটা অকিঞ্চিৎকর নয়। হায়, অবোধ অবলারা এ-কথা বোঝে না যে, বক্তা স্বামীর চেয়ে শ্রোতা স্বামী ঢের ভালো।

যোগেন্দ্র। কিন্তু নলিনাক্ষের ইতিহাসটা কী, ভালো করিয়া বলো দেখি, শোনা যাক।

অক্ষয়। দেখো যোগেন, ইতিহাসে যদি কিছু খুঁত থাকে, তাহা লইয়া বেশি ব্যস্ত হইয়ো না। অল্প একটুখানি খুঁতে দুর্লভ জিনিস সুলভ হয়— আমি তো সেটাকে লাভ মনে করি।

অক্ষয় নলিনাক্ষের ইতিহাস যাহা বলিল, তাহা সংক্ষেপে এই—

নলিনাক্ষের পিতা রাজবল্লভ ফরিদপুর-অঞ্চলে একটি ছোটোখাটো জমিদার ছিলেন। তাঁহার বছর-ত্রিশ বয়সে তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী কোনোমতেই স্বামীর ধর্ম গ্রহণ করিলেন না এবং আচারবিচারসম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সহিত স্বামীর সঙ্গে

স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতে লাগিলেন— বলা বাহুল্য, ইহা রাজবল্লভের পক্ষে সুখকর হয় নাই। তাঁহার ছেলে নলিনাক্ষ ধর্মপ্রচারের উৎসাহে ও বক্তৃতাশক্তি দ্বারা উপযুক্ত বয়সে ব্রাহ্মসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। তিনি সরকারী ডাক্তারের কাজে বাংলার নানাস্থানে অবস্থিতি করিয়া চরিত্রের নির্মলতা, চিকিৎসার নৈপুণ্য ও সৎ কর্মের উদ্‌যোগে সর্বত্র খ্যাতি বিস্তার করিতে থাকেন।

ইতিমধ্যে একটি অভাবনীয় ব্যাপার ঘটিল। বৃদ্ধবয়সে রাজবল্লভ একটি বিধবাকে বিবাহ করিবার জন্য হঠাৎ উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। কেহই তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারিল না। রাজবল্লভ বলিতে লাগিলেন, "আমার বর্তমান স্ত্রী আমার যথার্থ সহধর্মিণী নহে— যাহার সঙ্গে ধর্মে, মতে, ব্যবহারে ও হৃদয়ে মিল হইয়াছে, তাহাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ না করিলে অন্যায় হইবে।" এই বলিয়া রাজবল্লভ সর্বসাধারণের ধিক্‌কারের মধ্যে সেই বিধবাকে অগত্যা হিন্দুমতানুসারে বিবাহ করিলেন।

ইহার পরে নলিনাক্ষের মা গৃহত্যাগ করিয়া কাশী যাইতে প্রবৃত্ত হইলে নলিনাক্ষ রংপুরের ডাক্তারি ছাড়িয়া আসিয়া কহিল, "মা, আমিও তোমার সঙ্গে কাশী যাইব।"

মা কাঁদিয়া কহিলেন, "বাছা, আমার সঙ্গে তোদের তো কিছুই মেলে না, কেন মিছামিছি কষ্ট পাইবি।"

নলিনাক্ষ কহিল, "তোমার সঙ্গে আমার কিছুই অমিল হইবে না।"

নলিনাক্ষ তাহার এই স্বামিপরিত্যক্ত অবমানিত মাতাকে সুখী করিবার জন্য দৃঢ়সংকল্প হইল। তাঁহার সঙ্গে কাশী গেল। মা কহিলেন, "বাবা, ঘরে কি বউ আসিবে না।"

নলিনাক্ষ বিপদে পড়িল, কহিল, "কাজ কী মা, বেশ আছি।"

মা বুঝিলেন, নলিন অনেকটা ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া

ব্রাহ্মপরিবারের বাহিরে বিবাহ করিতে প্রস্তুত নহে। ব্যথিত হইয়া তিনি কহিলেন, "বাছা, আমার জন্যে তুই চিরজীবন সন্ন্যাসী হইয়া থাকিবি, এ তো কোনোমতেই হইতে পারে না। তোর যেখানে রুচি তুই বিবাহ কর্ বাবা, আমি কখনো আপত্তি করিব না।"

নলিন দুই-এক দিন একটু চিন্তা করিয়া কহিল, "তুমি যেমন চাও, আমি তেমনি একটি বউ আনিয়া তোমার দাসী করিয়া দিব— তোমার সঙ্গে কোনো বিষয়ে অমিল হইবে, তোমাকে দুঃখ দিবে, এমন মেয়ে আমি কখনোই ঘরে আনিব না।"

এই বলিয়া নলিন পাত্রীর সন্ধানে বাংলাদেশে চলিয়া আসিয়াছিল। তাহার পরে মাঝখানে ইতিহাসে একটুখানি বিচ্ছেদ আছে। কেহ বলে, গোপনে সে এক পল্লীতে গিয়া কোনো এক অনাথাকে বিবাহ করিয়াছিল এবং বিবাহের পরেই তাহার স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছিল। কেহ বা তাহাতে সন্দেহ প্রকাশ করে। অক্ষয়ের বিশ্বাস এই যে, বিবাহ করিতে আসিয়া শেষমুহূর্তে সে পিছাইয়াছিল।

যাহাই হউক, অক্ষয়ের মতে, এখন নিশ্চয়ই নলিনাক্ষ যাহাকেই পছন্দ করিয়া বিবাহ করিবে, তাহার মা তাহাতে আপত্তি না করিয়া খুশিই হইবেন। হেমনলিনীর মতো অমন মেয়ে নলিনাক্ষ কোথায় পাইবে। আর যাই হউক, হেমের যেরূপ মধুর স্বভাব, তাহাতে সে যে তাহার শাশুড়ীকে যথেষ্ট ভক্তিশ্রদ্ধা করিয়া চলিবে, কোনোমতেই তাঁহাকে কষ্ট দিবে না, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। নলিনাক্ষ দুদিন ভালো করিয়া হেমকে দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। অতএব অক্ষয়ের পরামর্শ এই যে, কোনোমতে দুজনের পরিচয় করাইয়া দেওয়া হউক।

৪০

অক্ষয় চলিয়া যাইবামাত্র যোগেন্দ্র দোতলায় উঠিয়া গেল। দেখিল, উপরের বসিবার ঘরে হেমনলিনীকে কাছে বসাইয়া অন্নদাবাবু গল্প করিতেছেন। যোগেন্দ্রকে দেখিয়া অন্নদা একটু লজ্জিত হইলেন। আজ চায়ের টেবিলে তাঁহার স্বাভাবিক শান্তভাব নষ্ট হইয়া হঠাৎ তাঁহার রোষ প্রকাশিত হইয়াছিল, ইহাতেও তাঁহার মনে মনে ক্ষোভ ছিল। তাই তাড়াতাড়ি বিশেষ সমাদরের স্বরে কহিলেন, "এসো যোগেন্দ্র, বসো।"

যোগেন্দ্র কহিল, "বাবা, তোমরা যে কোনোখানে বাহির হওয়া একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছ। দুজনে দিনরাত্রি ঘরে বসিয়া থাকা কি ভালো।"

অন্নদা কহিলেন, "ওই শোনো। আমরা তো চিরকাল এইরকম কোণে বসিয়াই কাটাইয়া দিয়াছি। হেমকে তো কোথাও বাহির করিতে হইলে মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করিতে হইত।"

হেম কহিল, "কেন বাবা আমার দোষ দাও। তুমি কোথায় আমাকে লইয়া যাইতে চাও, চলো না।"

হেমনলিনী আপনার প্রকৃতির বিরুদ্ধে গিয়াও সবলে প্রমাণ করিতে চায় যে, সে মনের মধ্যে একটা শোক চাপিয়া ধরিয়া ঘরের মাটি আঁকড়াইয়া পড়িয়া নাই। তাহার চারিদিকে যেখানে যাহা-কিছু হইতেছে, সব বিষয়েই যেন তাহার ঔৎসুক্য অত্যন্ত সজীব হইয়া আছে।

যোগেন্দ্র কহিল, "বাবা, কাল একটা মীটিং আছে, সেখানে হেমকে লইয়া চলো না।"

অন্নদা জানিতেন, মিটিঙের ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে হেমনলিনী চিরদিনই একান্ত অনিচ্ছা ও সংকোচ অনুভব করে—তাই তিনি কিছু না বলিয়া একবার হেমের মুখের দিকে চাহিলেন।

হেম হঠাৎ একটা অস্বাভাবিক উৎসাহ প্রকাশ করিয়া কহিল, "মীটিং ? সেখানে কে বক্তৃতা দিবে দাদা।"

যোগেন্দ্র। নলিনাক্ষ ডাক্তার।

অন্নদা। নলিনাক্ষ !

যোগেন্দ্র। ভারি চমৎকার বলিতে পারেন। তা ছাড়া, লোকটার জীবনের ইতিহাস শুনিলে আশ্চর্য হইয়া যাইতে হয়। এমন ত্যাগ-স্বীকার ! এমন দৃঢ়তা ! এ-রকম মানুষের মতো মানুষ পাওয়া দুর্লভ।

আর ঘণ্টা-দুই আগে একটা অস্পষ্ট জনশ্রুতি ছাড়া নলিনাক্ষসম্বন্ধে যোগেন্দ্র কিছুই জানিত না।

হেম একটা আগ্রহ দেখাইয়া কহিল, "বেশ তো বাবা, চলো না, তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে যাইব।"

হেমনলিনীর এইরূপ উৎসাহের ভাবটাকে অন্নদা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিলেন না— তথাপি তিনি মনে মনে একটু খুশি হইলেন। তিনি ভাবিলেন, হেম যদি জোর করিয়াও এইরূপ মেলামেশা যাওয়া-আসা করিতে থাকে, তাহা হইলে শীঘ্র উহার মন সুস্থ হইবে। মানুষের সহবাসই মানুষের সর্বপ্রকার মনোবৈকল্যের প্রধান ঔষধ। তিনি কহিলেন, "তা বেশ তো যোগেন্দ্র, কাল যথাসময়ে আমাদের মীটিঙে লইয়া যাইয়ো। কিন্তু নলিনাক্ষসম্বন্ধে কী জান, বলো তো। অনেক লোকে তো অনেক কথা কয়।"

যে অনেক লোকে অনেক কথা বলিয়া থাকে, প্রথমত যোগেন্দ্র তাহাদিগকে খুব একচোট গালি দিয়া লইল। বলিল, "ধর্ম লইয়া

যাহারা ভড়ং করে, তাহারা মনে করে, কথায় কথায় পরের প্রতি অবিচার ও পরনিন্দা করিবার জন্য তাহারা ভগবানের স্বাক্ষরিত দলিল লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে— ধর্মব্যবসায়ীদের মতো এতবড়ো সংকীর্ণচিত্ত বিশ্বনিন্দুক আর জগতে নাই।" বলিতে বলিতে যোগেন্দ্র অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

অন্নদা যোগেন্দ্রকে ঠাট্টা করিবার জন্য বার বার বলিতে লাগিলেন, "সে-কথা ঠিক, সে-কথা ঠিক। পরের দোষত্রুটি লইয়া কেবলই আলোচনা করিতে থাকিলে মন ছোটো হইয়া যায়, স্বভাব সন্দিগ্ধ হইয়া উঠে, হৃদয়ের সরসতা থাকে না।"

যোগেন্দ্র কহিল, "বাবা, তুমি কি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছ? কিন্তু ধার্মিকের মতো আমার স্বভাব নয়— আমি মন্দ বলিতেও জানি, ভালো বলিতেও জানি এবং মুখের উপরে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া হাতে-হাতেই সব কথা চুকাইয়া ফেলি।"

অন্নদা ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "যোগেন, তুমি কি পাগল হইয়াছ। তোমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিব কেন। আমি কি তোমাকে চিনি না।"

তখন ভূরি ভূরি প্রশংসাবাদের দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া যোগেন্দ্র নলিনাক্ষের বৃত্তান্ত বিবরিত করিল। কহিল, "মাতাকে সুখী করিবার জন্য নলিনাক্ষ আচারসম্বন্ধে সংযত হইয়া কাশীতে বাস করিতেছে, এইজন্যই, বাবা, তুমি যাহাদিগকে অনেক লোক বল, তাহারা অনেক কথা বলিতেছে। কিন্তু আমি তো এজন্য নলিনাক্ষকে ভালোই বলি। হেম, তুমি কী বল।"

হেমনলিনী কহিল, "আমিও তো তাই বলি।"

যোগেন্দ্র কহিল, "হেম যে ভালোই বলিবে, তাহা আমি নিশ্চয়

জানিতাম। বাবাকে সুখী করিবার জন্ম হেম একটা-কিছু ত্যাগস্বীকার করিবার উপলক্ষ্য পাইলে যেন বাঁচে, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারি।"

অন্নদা স্নেহকোমলহাস্তে হেমের মুখের দিকে চাহিলেন— হেমনলিনী লজ্জায় রক্তিম মুখখানি নত করিল।

৪১

সভাভঙ্গের পর অন্নদা হেমনলিনীকে লইয়া যখন ঘরে ফিরিলেন, তখনো সন্ধ্যা হয় নাই। চা খাইতে বসিয়া অন্নদাবাবু কহিলেন, "আজ বড়ো আনন্দলাভ করিয়াছি।" ইহার অধিক আর তিনি কথা কহিলেন না; তাঁহার মনের ভিতরের দিকে একটা ভাবের স্রোত বহিতেছিল।

আজ চা খাওয়ার পরেই হেমনলিনী আস্তে আস্তে উপরে চলিয়া গেল, অন্নদাবাবু তাহা লক্ষ্য করিলেন না।

আজ সভাস্থলে নলিনাক্ষ— যিনি বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাঁহাকে দেখিতে আশ্চর্য তরুণ এবং সুকুমার; যুবাবয়সেও যেন শৈশবের অম্লান লাবণ্য তাঁহার মুখশ্রীকে পরিত্যাগ করে নাই; অথচ তাঁহার অন্তরাত্মা হইতে যেন একটি ধ্যানপরতার গাম্ভীর্য তাঁহার চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইতেছে।

তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল "ক্ষতি"। তিনি বলিয়াছিলেন, সংসারে যে-ব্যক্তি কিছুই হারায় নাই, সে কিছু পায় নাই। অমনি যাহা আমাদের হাতে আসে, তাহাকে আমরা সম্পূর্ণ পাই না; ত্যাগের দ্বারা আমরা যখন তাহাকে পাই, তখনি যথার্থ তাহা আমাদের অন্তরের ধন হইয়া উঠে। যাহা কিছু আমাদের প্রকৃত সম্পদ, তাহা সম্মুখ হইতে সরিয়া গেলেই যে-ব্যক্তি হারাইয়া ফেলে, সে-লোক দুর্ভাগা; বরঞ্চ

তাহাকে ত্যাগ করিয়াই তাহাকে বেশি করিয়া পাইবার ক্ষমতা মানবচিত্তের আছে। যাহা আমার যায়, তাহার সম্বন্ধে যদি আমি নত হইয়া করজোড় করিয়া বলিতে পারি, "আমি দিলাম, আমার ত্যাগের দান, আমার দুঃখের দান, আমার অশ্রুর দান",— তবে ক্ষুদ্র বৃহৎ হইয়া উঠে, অনিত্য নিত্য হয় এবং যাহা আমাদের ব্যবহারের উপকরণমাত্র ছিল, তাহা পূজার উপকরণ হইয়া আমাদের অন্তঃকরণের দেবমন্দিরের রত্নভাণ্ডারে চিরসঞ্চিত হইয়া থাকে।

এই কথাগুলি আজ হেমনলিনীর সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া বাজিতেছে। ছাদের উপরে নক্ষত্রদীপ্ত আকাশের তলে সে আজ স্তব্ধ হইয়া বসিল। তাহার সমস্ত মন আজ পূর্ণ— সমস্ত আকাশ, সমস্ত জগৎসংসার তাহার কাছে আজ পরিপূর্ণ।

বক্তৃতাসভা হইতে ফিরিবার সময় যোগেন্দ্র কহিল, "অক্ষয়, তুমি বেশ পাত্রটি সন্ধান করিয়াছ যা হোক। এ তো সন্ন্যাসী। এর অর্ধেক কথা তো আমি বুঝিতেই পারিলাম না।"

অক্ষয় কহিল, "রোগীর অবস্থা বুঝিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হয়। হেমনলিনী রমেশের ধ্যানে মগ্ন আছেন— সে-ধ্যান সন্ন্যাসী নহিলে আমাদের মতো সহজ লোকে ভাঙাইতে পারিবে না। যখন বক্তৃতা চলিতেছিল, তখন তুমি কি হেমের মুখ লক্ষ্য করিয়া দেখ নাই।"

যোগেন্দ্র। দেখিয়াছি বইকি। ভালো লাগিতেছিল, তাহা বেশ বুঝা গেল। কিন্তু বক্তৃতা ভালো লাগিলেই যে বক্তাকে বরমাল্য দেওয়া সহজ হয়, তাহার কোনো হেতু দেখি না।

অক্ষয়। ওই বক্তৃতা কি আমাদের মতো কাহারও মুখে শুনিলে ভালো লাগিত। তুমি জান না যোগেন্দ্র, তপস্বীর উপর মেয়েদের একটা বিশেষ টান আছে। সন্ন্যাসীর জন্য উমা তপস্যা করিয়াছিলেন, কালিদাস

তাহা কাব্যে লিখিয়া গেছেন। আমি তোমাকে বলিতেছি, আর যে-কোনো পাত্র তুমি খাড়া করিবে, হেমনলিনী রমেশের সঙ্গে মনে মনে তাহার তুলনা করিবে— সে-তুলনায় কেহ টিঁকিতে পারিবে না। নলিনাক্ষ মানুষটি সাধারণ লোকের মতোই নয়— ইহার সঙ্গে তুলনার কথা মনেই উদয় হইবে না। অন্য কোনো যুবককে হেমনলিনীর সম্মুখে আনিলেই তোমাদের উদ্দেশ্য সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে এবং তাহার সমস্ত হৃদয় বিদ্রোহ হইয়া উঠিবে। কিন্তু নলিনাক্ষকে বেশ একটু কৌশল করিয়া যদি এখানে আনিতে পার, তাহা হইলে হেমের মনে কোনো সন্দেহ উঠিবে না—তাহার পরে ক্রমে শ্রদ্ধা হইতে মাল্যদান পর্যন্ত কোনোপ্রকারে চালনা করিয়া লইয়া যাওয়া নিতান্ত শক্ত হইবে না।

যোগেন্দ্র। কৌশলটা আমার দ্বারা ভালো ঘটিয়া ওঠে না— বলাটাই আমার পক্ষে সহজ। কিন্তু যাই বল, পাত্রটি আমার পছন্দ হইতেছে না।

অক্ষয়। দেখো যোগেন, তুমি নিজের জেদ লইয়া সমস্ত মাটি করিয়ো না। সকল সুবিধা একত্রে পাওয়া যায় না। যেমন করিয়া হোক, রমেশের চিন্তা হেমনলিনীর মন হইতে না তাড়াইতে পারিলে আমি তো ভালো বুঝি না। তুমি যে গায়ের জোরে সেটা করিয়া উঠিতে পারিবে, তাহা মনেও করিয়ো না। আমার পরামর্শ অনুসারে যদি ঠিকমতো চল, তাহা হইলে তোমাদের একটা সদ্‌গতি হইতেও পারে।

যোগেন্দ্র। আসল কথা, নলিনাক্ষ আমার পক্ষে একটু বেশি দুর্বোধ। এ-রকম লোকদের লইয়া কারবার করিতে আমি ভয় করি। একটা দায় হইতে উদ্ধার হইতে গিয়া ফের আর-একটা দায়ের মধ্যে জড়াইয়া পড়িব।

অক্ষয়। ভাই, তোমরা নিজের দোষে পুড়িয়াছ— আজকে সিঁদুরে মেঘ দেখিয়া আতঙ্ক লাগিতেছে। রমেশসম্বন্ধে তোমরা যে গোড়াগুড়ি একেবারে অন্ধ ছিলে। এমন ছেলে আর হয় না—ছলনা কাহাকে বলে, রমেশ তাহা জানে না—দর্শনশাস্ত্রে রমেশ দ্বিতীয় শংকরাচার্য বলিলেই হয়, আর সাহিত্যে স্বয়ং সরস্বতীর উনবিংশ শতাব্দীর পুরুষ-সংস্করণ। রমেশকে প্রথম হইতেই আমার ভালো লাগে নাই— ওই রকম অত্যুচ্চ-আদর্শওয়ালা লোক আমার বয়সে আমি ঢের-ঢের দেখিয়াছি। কিন্তু আমার কথাটি কহিবার জো ছিল না—তোমরা জানিতে, আমার মতো অযোগ্য অভাজন কেবল মহাত্মা-লোকদের ঈর্ষা করিতেই জানে, আমাদের আর-কোনো ক্ষমতা নাই। যা হোক, এতদিন পরে বুঝিয়াছ, মহাপুরুষদের দূর হইতে ভক্তি করা চলে, কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে নিজের বোনের বিবাহের সম্বন্ধ করা নিরাপদ নহে। কিন্তু কণ্টকেনৈব কণ্টকম। যখন এই একটি মাত্র উপায় আছে, তখন আর এ লইয়া খুঁতখুঁত করিতে বসিয়ো না।

যোগেন্দ্র। দেখো অক্ষয়, তুমি যে আমাদের সকলের আগে রমেশকে চিনিতে পারিয়াছিলে, এ-কথা হাজার বলিলেও আমি বিশ্বাস করিব না। তখন নিতান্ত গায়ের জ্বালায় তুমি রমেশকে দু-চক্ষে দেখিতে পারিতে না —সেটা যে তোমার অসাধারণ বুদ্ধির পরিচয়, তাহা আমি মানিব না। যাই হোক, কলকৌশলের যদি প্রয়োজন থাকে, তুমি লাগো, আমার দ্বারা হইবে না। মোটের উপরে নলিনাক্ষকে আমার ভালোই লাগিতেছে না।

যোগেন্দ্র এবং অক্ষয় উভয়ে যখন অন্নদার চা খাইবার ঘরে আসিয়া পৌছিল, দেখিল, হেমনলিনী ঘরের অন্য দ্বার দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। অক্ষয় বুঝিল, হেমনলিনী তাহাদিগকে জানালা দিয়া পথেই দেখিতে

পাইয়াছিল। ঈষৎ একটু হাসিয়া সে অন্নদার কাছে আসিয়া বসিল। চায়ের পেয়ালা ভর্তি করিয়া লইয়া কহিল, "নলিনাক্ষবাবু যাহা বলেন, একেবারে প্রাণের ভিতর হইতে বলেন, সেইজন্য তাঁহার কথাগুলা এত সহজে প্রাণের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করে।"

অন্নদাবাবু কহিলেন, "লোকটির ক্ষমতা আছে।"

অক্ষয় কহিল, "শুধু ক্ষমতা! এমন সাধুচরিত্রের লোক দেখা যায় না।"

যোগেন্দ্র যদিও চক্রান্তের মধ্যে ছিল, তবু সে থাকিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল, "আঃ, সাধুচরিত্রের কথা আর বলিয়ো না। সাধুসঙ্গ হইতে ভগবান আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন।"

যোগেন্দ্র কাল এই নলিনাক্ষের সাধুতার অজস্র প্রশংশা করিয়াছিল—এবং যাহারা নলিনাক্ষের বিরুদ্ধে কথা কহে, তাহাদিগকে নিন্দুক বলিয়া গালি দিয়াছিল।

অন্নদা কহিলেন, "ছি যোগেন্দ্র, অমন কথা বলিয়ো না। বাহির হইতে যাঁহাদিগকে ভালো বলিয়া মনে হয়, অন্তরেও তাঁহারা ভালো, এ-কথা বিশ্বাস করিয়া বরং আমি ঠকিতে রাজি আছি, তবু নিজের ক্ষুদ্র বুদ্ধিমত্তার গৌরবরক্ষার জন্য সাধুতাকে সন্দেহ করিতে আমি প্রস্তুত নই। নলিনাক্ষবাবু যে-সব কথা বলিয়াছেন, এ-সমস্ত পরের মুখের কথা নহে;—তাঁহার নিজের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার ভিতর হইতে তিনি যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, আমার পক্ষে আজ তাহা নূতন লাভ বলিয়া মনে হইয়াছে। যে-ব্যক্তি কপট, সে-ব্যক্তি সত্যকার জিনিস দিবে কোথা হইতে। সোনা যেমন বানানো যায় না, এসব কথাও তেমনি বানানো যায় না। আমার ইচ্ছা হইয়াছে, নলিনাক্ষবাবুকে আমি নিজে গিয়া সাধুবাদ দিয়া আসিব।"

অক্ষয় কহিল, "আমার ভয় হয়, ইঁহার শরীর টেঁকে কি না।"

অন্নদাবাবু ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "কেন, ইঁহার শরীর কি ভালো নয়।"

অক্ষয়। ভালো থাকিবার তো কথা নয়— দিনরাত্রি আপনার সাধনা এবং শাস্ত্রালোচনা লইয়াই আছেন, শরীরের প্রতি তো আর দৃষ্টি নাই।

অন্নদা কহিলেন, "এটা ভারি অন্যায়। শরীর নষ্ট করিবার অধিকার আমাদের নাই— আমরা আমাদের শরীর সৃষ্টি করি নাই। আমি যদি উঁহাকে কাছে পাইতাম, তবে নিশ্চয় অল্পদিনেই আমি উঁহার স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিতাম। আসলে স্বাস্থ্যরক্ষার গুটিকতক সহজ নিয়ম আছে, তাহার মধ্যে প্রথম হচ্ছে—"

যোগেন্দ্র অধৈর্য হইয়া কহিল, "বাবা, বৃথা কেন তোমরা ভাবিয়া মরিতেছ। নলিনাক্ষবাবুর শরীর তো দিব্য দেখিলাম,—তাঁহাকে দেখিয়া আজ আমার বেশ বোধ হইল, সাধুত্ব-জিনিসটা স্বাস্থ্যকর। আমার নিজেরই মনে হইতেছে, ওটা চেষ্টা করিয়া দেখিলে হয়।"

অন্নদা কহিলেন, "না যোগেন্দ্র, অক্ষয় যাহা বলিতেছে, তাহা হইতেও পারে। আমাদের দেশে বড়ো বড়ো লোকেরা প্রায় অল্প-বয়সেই মারা যান— ইঁহারা নিজের শরীরকে উপেক্ষা করিয়া দেশের লোকসান করিয়া থাকেন। এটা কিছুতে ঘটিতে দেওয়া উচিত নয়। যোগেন্দ্র, তুমি নলিনাক্ষবাবুকে যাহা মনে করিতেছ, তাহা নয়, উঁহার মধ্যে আসল জিনিস আছে। উঁহাকে এখন হইতেই সাবধান করিয়া দেওয়া দরকার।"

অক্ষয়। আমি উঁহাকে আপনার কাছে আনিয়া উপস্থিত করিব, আপনি যদি উঁহাকে একটু ভালো করিয়া বুঝাইয়া দেন তো ভালো হয়। আর, আমার মনে হয়, আপনি সেই যে শিকড়ের রসটা আমাকে

পরীক্ষার সময় দিয়াছিলেন, সেটা আশ্চর্য বলকারক। যে-কোনো লোক সর্বদা মনকে খাটাইতেছে, তাহার পক্ষে এমন মহৌষধ আর নাই। আপনি যদি একবার নলিনাক্ষবাবুকে—

যোগেন্দ্র একেবারে চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়া কহিল, "আঃ অক্ষয়, তুমি জ্বালাইলে। বড়ো বাড়াবাড়ি করিতেছ। আমি চলিলাম।"

৪২

পূর্বে যখন তাঁহার শরীর ভালো ছিল, তখন অন্নদাবাবু ডাক্তারি ও কবিরাজি নানাপ্রকার বটিকাদি সর্বদাই ব্যবহার করিতেন— এখন আর ওষুধ খাইবারও উৎসাহ নাই এবং নিজের অস্বাস্থ্য লইয়া আজকাল তিনি আর আলোচনামাত্রও করেন না, বরঞ্চ তাহা গোপন করিতেই চেষ্টা করেন।

আজ তিনি যখন অসময়ে কেদারায় ঘুমাইতেছিলেন, তখন সিঁড়িতে পদশব্দ শুনিয়া হেমনলিনী কোল হইতে সেলাইয়ের সামগ্রী নামাইয়া তাহার দাদাকে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য দ্বারের কাছে গেল। গিয়া দেখিল, তাহার দাদার সঙ্গে সঙ্গে নলিনাক্ষবাবু আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাড়াতাড়ি অন্য ঘরে পালাইবার উপক্রম করিতেই যোগেন্দ্র তাহাকে ডাকিয়া কহিল, "হেম, নলিনাক্ষবাবু আসিয়াছেন, ইঁহার সঙ্গে তোমার পরিচয় করাইয়া দিই।"

হেম থমকিয়া দাঁড়াইল এবং নলিনাক্ষ তাহার সম্মুখে আসিতেই তাহার মুখের দিকে না চাহিয়া নমস্কার করিল। অন্নদাবাবু জাগিয়া উঠিয়া ডাকিলেন, "হেম।" হেম তাঁহার কাছে আসিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "নলিনাক্ষবাবু আসিয়াছেন।"

যোগেন্দ্রের সহিত নলিনাক্ষ ঘরে প্রবেশ করিতেই অন্নদাবাবু ব্যস্তভাবে অগ্রসর হইয়া নলিনাক্ষকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিলেন। কহিলেন, "আজ আমার বড়ো সৌভাগ্য, আপনি আমার বাড়িতে আসিয়াছেন। হেম, কোথায় যাইতেছ মা, এইখানে বসো। নলিনাক্ষ-বাবু, এটি আমার কন্যা হেম, আমরা দুজনেই সেদিন আপনার বক্তৃতা শুনিতে গিয়া বড়ো আনন্দলাভ করিয়া আসিয়াছি। আপনি ওই যে একটি কথা বলিয়াছেন—আমরা যাহা পাইয়াছি তাহা কখনোই হারাইতে পারি না, যাহা যথার্থ পাই নাই তাহাই হারাই— এ-কথাটির অর্থ বড়ো গভীর— কী বলো মা হেম। বাস্তবিক কোন্ জিনিসটিকে যে আমার করিতে পারিয়াছি, আর কোন্‌টিকে পারি নাই, তাহার পরীক্ষা হয় তখনি, যখনি তাহা আমাদের হাতের কাছ হইতে সরিয়া যায়। নলিনাক্ষবাবু, আপনার কাছে আমাদের একটি অনুরোধ আছে। মাঝে মাঝে আপনি আসিয়া যদি আমাদের সঙ্গে আলোচনা করিয়া যান, তবে আমাদের বড়ো উপকার হয়। আমরা বড়ো কোথাও বাহির হই না— আপনি যখনি আসিবেন, আমাকে আর আমার মেয়েটিকে এই ঘরেই দেখিতে পাইবেন।"

নলিনাক্ষ আলজ্জিত হেমনলিনীর মুখের দিকে একবার চাহিয়া কহিল, "আমি বক্তৃতাসভায় বড়ো বড়ো কথা বলিয়া আসিয়াছি বলিয়া আপনারা আমাকে মস্ত একটা গম্ভীর লোক মনে করিবেন না। সেদিন ছাত্ররা নিতান্ত ধরিয়া পড়িয়াছিল বলিয়া বক্তৃতা করিতে গিয়াছিলাম, অনুরোধ এড়াইবার ক্ষমতা আমার একেবারেই নাই— কিন্তু এমন করিয়া বলিয়া আসিয়াছি যে, দ্বিতীয়বার অনুরুদ্ধ হইবার আশঙ্কা আমার নাই। ছাত্ররা স্পষ্টই বলিতেছে, আমার বক্তৃতা বারো-আনা বোঝাই যায় নাই। যোগেনবাবু, আপনিও তো সেদিন উপস্থিত ছিলেন,

আপনাকে সতৃষ্ণনয়নে ঘড়ির দিকে তাকাইতে দেখিয়া আমার হৃদয় যে বিচলিত হয় নাই, এ-কথা মনে করিবেন না।”

যোগেন্দ্র কহিল, “আমি ভালো বুঝিতে পারি নাই, সেটা আমার বুদ্ধির দোষ হইতে পারে, সে-জন্য আপনি কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হইবেন না।”

অন্নদা। যোগেন, সব কথা বুঝিবার বয়স সব নয়।

নলিনাক্ষ। সব কথা বুঝিবার দরকারও সব সময়ে দেখি না।

অন্নদা। কিন্তু নলিনবাবু, আপনাকে আমার একটি কথা বলিবার আছে। ঈশ্বর আপনাদিগকে কাজ করাইয়া লইবার জন্য পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন, তাই বলিয়া শরীরকে অবহেলা করিবেন না। যাঁহারা দাতা, তাঁহাদের এ-কথা সর্বদাই স্মরণ করাইতে হয় যে, মূলধন নষ্ট করিয়া ফেলিবেন না, তাহা হইলে দান করিবার শক্তি চলিয়া যাইবে।

নলিনাক্ষ। আপনি যদি আমাকে কখনো ভালো করিয়া জানিবার অবসর পান, তবে দেখিবেন, আমি সংসারে কোনো-কিছুকেই অবহেলা করি না। জগতে নিতান্তই ভিক্ষুকের মতো আসিয়াছিলাম, বহুকষ্টে বহুলোকের আনুকূল্যে শরীর-মন অল্পে অল্পে প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে। আমার পক্ষে এ-নবাবি শোভা পায় না যে, আমি কিছুকেই অবহেলা করিয়া নষ্ট করিব। যে-ব্যক্তি গড়িতে পারে না, সে-ব্যক্তি ভাঙিবার অধিকারী তো নয়।

অন্নদা। বড়ো ঠিক কথা বলিয়াছেন। আপনি কতকটা এই ভাবের কথাই সেদিনকার প্রবন্ধেও বলিয়াছিলেন।

যোগেন্দ্র। আপনারা বসুন, আমি চলিলাম, একটু কাজ আছে।

নলিনাক্ষ। যোগেনবাবু, আপনি কিন্তু আমাকে মাপ করিবেন। নিশ্চয় জানিবেন, লোককে অতিষ্ঠ করা আমার স্বভাব নয়। আজ না হয় আমি উঠি। চলুন, খানিকটা রাস্তা আপনার সঙ্গে যাওয়া যাক।

যোগেন্দ্র। না না, আপনি বসুন। আমার প্রতি লক্ষ্য করিবেন না। আমি কোথাও বেশিক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারি না।

অন্নদা। নলিনাক্ষবাবু, যোগেনের জন্য আপনি ব্যস্ত হইবেন না। যোগেন এমনি, যখন খুশি আসে, যখন খুশি যায়, উহাকে ধরিয়া রাখা শক্ত।

যোগেন্দ্র চলিয়া গেলে অন্নদাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "নলিনবাবু, আপনি এখন কোথায় আছেন।"

নলিনাক্ষ হাসিয়া কহিল, "আমি যে বিশেষ কোথাও আছি, তাহা বলিতে পারি না। আমার জানাশুনা লোক অনেক আছেন, তাঁহারা আমাকে টানাটানি করিয়া লইয়া বেড়ান। আমার সে মন্দ লাগে না— কিন্তু মানুষের চুপ করিয়া থাকারও প্রয়োজন আছে। তাই যোগেনবাবু আমার জন্য আপনাদের বাড়ির ঠিক পাশের বাড়িতেই স্থান করিয়া দিয়াছেন। এ-গলিটি বেশ নিভৃত বটে।"

এই সংবাদে অন্নদাবাবু বিশেষ আনন্দপ্রকাশ করিলেন। কিন্তু তিনি যদি লক্ষ্য করিয়া দেখিতেন তো দেখিতে পাইতেন যে, কথাটা শুনিবামাত্র হেমনলিনীর মুখ ক্ষণকালের জন্য বেদনায় বিবর্ণ হইয়া গেল। ওই পাশের বাসাতেই রমেশ ছিল।

ইতিমধ্যে চা তৈরির খবর পাইয়া সকলে মিলিয়া নিচে চা খাইবার ঘরে গেলেন। অন্নদাবাবু কহিলেন, "মা হেম, নলিনবাবুকে এক পেয়ালা চা দাও।"

নলিনাক্ষ কহিল, "না অন্নদাবাবু, আমি চা খাইব না।"

অন্নদা। সে কী কথা নলিনবাবু। এক পেয়ালা চা— না হয় তো কিছু মিষ্টি খান।

নলিনাক্ষ। আমাকে মাপ করিবেন।

অন্নদা। আপনি ডাক্তার, আপনাকে আর কী বলিব। মধ্যাহ্ন-ভোজনের তিন-চার ঘণ্টা পরে চায়ের উপলক্ষ্যে খানিকটা গরম জল খাওয়া হজমের পক্ষে যে নিতান্ত উপকারী। অভ্যাস না থাকে যদি, আপনাকে না হয় খুব পাতলা করিয়া চা তৈরি করিয়া দিই।

নলিনাক্ষ চকিতের মধ্যে হেমনলিনীর মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিল যে, হেমনলিনী নলিনাক্ষের চা খাইতে সংকোচসম্বন্ধে একটা কী আন্দাজ করিয়াছে এবং তাহাই লইয়া মনে মনে আন্দোলন করিতেছে। তৎক্ষণাৎ হেমনলিনীর দিকে চাহিয়া নলিনাক্ষ কহিল, "আপনি যাহা মনে করিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। আপনাদের এই চায়ের টেবিলকে আমি ঘৃণা করিতেছি বলিয়া মনেও করিবেন না। পূর্বে আমি যথেষ্ট চা খাইয়াছি— চায়ের গন্ধে এখনো আমার মনটা উৎসুক হয়। আপনাদের চা খাইতে দেখিয়া আমি আনন্দবোধ করিতেছি। কিন্তু আপনারা বোধ হয় জানেন না, আমার মা অত্যন্ত আচারপরায়ণা— আমি ছাড়া তাঁহার যথার্থ আপনার কেহ নাই— সেই মার কাছে আমি সংকুচিত হইয়া যাইতে পারিব না। এইজন্য আমি চা খাই না। কিন্তু আপনারা চা খাইয়া যে-সুখটুকু পাইতেছেন, আমি তাহার ভাগ পাইতেছি। আপনাদের আতিথ্য হইতে আমি বঞ্চিত নহি।"

ইতিপূর্বে নলিনাক্ষের কথাবার্তায় হেমনলিনী মনে মনে একটু যেন আঘাত পাইতেছিল। সে বুঝিতে পারিতেছিল, নলিনাক্ষ নিজেকে তাহাদের কাছে ঠিকভাবে প্রকাশ করিতেছিল না। সে কেবলই বেশি কথা কহিয়া নিজেকে ঢাকিয়া রাখিবারই চেষ্টা করিতেছিল। হেমনলিনী জানিত না, প্রথম পরিচয়ে নলিনাক্ষ একটা একান্ত সংকোচের ভাব কিছুতেই তাড়াইতে পারে না। এইজন্য নূতন লোকের কাছে

অনেক স্থলেই সে নিজের স্বভাবের বিরুদ্ধে জোর করিয়া প্রগল্‌ভ হইয়া উঠে। নিজের অকৃত্রিম মনের কথা বলিতে গেলেও তাহার মধ্যে একটা বেসুর লাগাইয়া বসে। সেটা নিজের কানেও ঠেকে। সেইজন্যই আজ যোগেন্দ্র যখন অধীর হইয়া উঠিয়া পড়িল, তখন নলিনাক্ষ মনের মধ্যে একটা ধিক্‌কার অনুভব করিয়া তাহার সঙ্গে পালাইবার চেষ্টা করিয়াছিল।

কিন্তু নলিনাক্ষ যখন মার কথা বলিল, তখন হেমনলিনী শ্রদ্ধার চক্ষে তাহার মুখের দিকে না চাহিয়া থাকিতে পারিল না, এবং মাতার উল্লেখমাত্রে সেই মুহূর্তেই নলিনাক্ষের মুখে যে একটি সরস ভক্তির গাম্ভীর্য প্রকাশ পাইল, তাহা দেখিয়া হেমনলিনীর মন আর্দ্র হইয়া গেল। তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল, নলিনাক্ষের মাতার সম্বন্ধে তাহার সঙ্গে আলোচনা করে, কিন্তু সংকোচে তাহা পারিল না।

অন্নদাবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "বিলক্ষণ। এ-কথা পূর্বে জানিলে আমি কখনোই আপনাকে চা খাইতে অনুরোধ করিতাম না। মাপ করিবেন।"

নলিনাক্ষ একটু হাসিয়া কহিল, "চা লইতে পারিলাম না বলিয়া আপনাদের স্নেহের অনুরোধ হইতে কেন বঞ্চিত হইব।"

নলিনাক্ষ চলিয়া গেলে হেমনলিনী তাহার পিতাকে লইয়া দোতলার ঘরে গিয়া বসিল এবং বাংলা মাসিক পত্রিকা হইতে প্রবন্ধ বাছিয়া তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইতে লাগিল। শুনিতে শুনিতে অন্নদাবাবু অনতিবিলম্বে ঘুমাইয়া পড়িলেন। কিছুদিন হইতে অন্নদাবাবুর শরীরে এইরূপ অবসাদের লক্ষণ নিয়মিতভাবে প্রকাশ পাইতেছে।

নলিনাক্ষ। আমাকে মাপ করিবেন।

অন্নদা। আপনি ডাক্তার, আপনাকে আর কী বলিব। মধ্যাহ্ন-ভোজনের তিন-চার ঘণ্টা পরে চায়ের উপলক্ষ্যে খানিকটা গরম জল খাওয়া হজমের পক্ষে যে নিতান্ত উপকারী। অভ্যাস না থাকে যদি, আপনাকে না হয় খুব পাতলা করিয়া চা তৈরি করিয়া দিই।

নলিনাক্ষ চকিতের মধ্যে হেমনলিনীর মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিল যে, হেমনলিনী নলিনাক্ষের চা খাইতে সংকোচসম্বন্ধে একটা কী আন্দাজ করিয়াছে এবং তাহাই লইয়া মনে মনে আন্দোলন করিতেছে। তৎক্ষণাৎ হেমনলিনীর দিকে চাহিয়া নলিনাক্ষ কহিল, "আপনি যাহা মনে করিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। আপনাদের এই চায়ের টেবিলকে আমি ঘৃণা করিতেছি বলিয়া মনেও করিবেন না। পূর্বে আমি যথেষ্ট চা খাইয়াছি— চায়ের গন্ধে এখনো আমার মনটা উৎসুক হয়। আপনাদের চা খাইতে দেখিয়া আমি আনন্দবোধ করিতেছি। কিন্তু আপনারা বোধ হয় জানেন না, আমার মা অত্যন্ত আচারপরায়ণা— আমি ছাড়া তাঁহার যথার্থ আপনার কেহ নাই— সেই মার কাছে আমি সংকুচিত হইয়া যাইতে পারিব না। এইজন্য আমি চা খাই না। কিন্তু আপনারা চা খাইয়া যে-সুখটুকু পাইতেছেন, আমি তাহার ভাগ পাইতেছি। আপনাদের আতিথ্য হইতে আমি বঞ্চিত নহি।"

ইতিপূর্বে নলিনাক্ষের কথাবার্তায় হেমনলিনী মনে মনে একটু যেন আঘাত পাইতেছিল। সে বুঝিতে পারিতেছিল, নলিনাক্ষ নিজেকে তাহাদের কাছে ঠিকভাবে প্রকাশ করিতেছিল না। সে কেবলই বেশি কথা কহিয়া নিজেকে ঢাকিয়া রাখিবারই চেষ্টা করিতেছিল। হেমনলিনী জানিত না, প্রথম পরিচয়ে নলিনাক্ষ একটা একান্ত সংকোচের ভাব কিছুতেই তাড়াইতে পারে না। এইজন্য নূতন লোকের কাছে

অনেক স্থলেই সে নিজের স্বভাবের বিরুদ্ধে জোর করিয়া প্রগল্‌ভ হইয়া উঠে। নিজের অকৃত্রিম মনের কথা বলিতে গেলেও তাহার মধ্যে একটা বেসুর লাগাইয়া বসে। সেটা নিজের কানেও ঠেকে। সেইজন্যই আজ যোগেন্দ্র যখন অধীর হইয়া উঠিয়া পড়িল, তখন নলিনাক্ষ মনের মধ্যে একটা ধিক্‌কার অনুভব করিয়া তাহার সঙ্গে পালাইবার চেষ্টা করিয়াছিল।

কিন্তু নলিনাক্ষ যখন মার কথা বলিল, তখন হেমনলিনী শ্রদ্ধার চক্ষে তাহার মুখের দিকে না চাহিয়া থাকিতে পারিল না, এবং মাতার উল্লেখমাত্রে সেই মুহূর্তেই নলিনাক্ষের মুখে যে একটি সরস ভক্তির গাম্ভীর্য প্রকাশ পাইল, তাহা দেখিয়া হেমনলিনীর মন আর্দ্র হইয়া গেল। তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল, নলিনাক্ষের মাতার সম্বন্ধে তাহার সঙ্গে আলোচনা করে, কিন্তু সংকোচে তাহা পারিল না।

অন্নদাবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "বিলক্ষণ। এ-কথা পূর্বে জানিলে আমি কখনোই আপনাকে চা খাইতে অনুরোধ করিতাম না। মাপ করিবেন।"

নলিনাক্ষ একটু হাসিয়া কহিল, "চা লইতে পারিলাম না বলিয়া আপনাদের স্নেহের অনুরোধ হইতে কেন বঞ্চিত হইব।"

নলিনাক্ষ চলিয়া গেলে হেমনলিনী তাহার পিতাকে লইয়া দোতলার ঘরে গিয়া বসিল এবং বাংলা মাসিক পত্রিকা হইতে প্রবন্ধ বাছিয়া তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইতে লাগিল। শুনিতে শুনিতে অন্নদাবাবু অনতিবিলম্বে ঘুমাইয়া পড়িলেন। কিছুদিন হইতে অন্নদাবাবুর শরীরে এইরূপ অবসাদের লক্ষণ নিয়মিতভাবে প্রকাশ পাইতেছে।

৪৩

কয়েকদিনের মধ্যেই নলিনাক্ষের সহিত অন্নদাবাবুদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিল। প্রথমে হেমনলিনী মনে করিয়াছিল, নলিনাক্ষের মতো লোকের কাছে কেবল বড়ো বড়ো আধ্যাত্মিক বিষয়েই বুঝি উপদেশ পাওয়া যাইবে— এমন মানুষের সঙ্গে যে সাধারণ বিষয়ে সহজ লোকের মতো আলাপ চলিতে পারে, তাহা মনেও করিতে পারে নাই। অথচ সমস্ত হাস্যালাপের মধ্যে নলিনাক্ষের একটা কেমন দূরত্বও ছিল।

একদিন অন্নদাবাবু ও হেমনলিনীর সঙ্গে নলিনাক্ষের কথাবার্তা চলিতেছিল, এমন সময়ে যোগেন্দ্র কিছু উত্তেজিত হইয়া আসিয়া কহিল, "জান বাবা, আজকাল আমাদিগকে সমাজের লোকে নলিনাক্ষবাবুর চেলা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাই লইয়া এইমাত্র পরেশের সঙ্গে আমার খুব ঝগড়া হইয়া গেছে।"

অন্নদাবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, "ইহাতে আমি তো লজ্জার কথা কিছু দেখি না। যেখানে সকলেই গুরু, কেহই চেলা নয়, সেই দলে মিশিতেই আমার লজ্জা বোধ হয়;—সেখানে শিক্ষা দেবার হুড়োমুড়িতে শিক্ষা পাইবার অবকাশ থাকে না।"

নলিনাক্ষ। অন্নদাবাবু, আমিও আপনার দলে—আমরা চেলার দল। যেখানে আমাদের কিছু শিখিবার সম্ভাবনা আছে, সেইখানেই আমরা তলপি বহিয়া বেড়াইব।

যোগেন্দ্র অধীর হইয়া কহিল, "না না, কথাটা ভালো নয়। নলিনবাবু, কেহই যে আপনার বন্ধু বা আত্মীয় হইতে পারিবে না— যাহারা আপনার কাছে আসিবে, তাহারাই আপনার চেলা বলিয়া খ্যাত

হইয়া যাইবে, এমন বদনামটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার নহে। আপনি কী-সব কাণ্ড করেন, ওগুলা ছাড়িয়া দিন।"

নলিনাক্ষ। কী করিয়া থাকি বলুন।

যোগেন্দ্র। ওই যে শুনিয়াছি প্রাণায়াম করেন, ভোরের বেলায় সূর্যের দিকে তাকাইয়া থাকেন, খাওয়াদাওয়া লইয়া নানাপ্রকার আচার-বিচার করিতে ছাড়েন না, ইহাতে দশের মধ্যে আপনি খাপছাড়া হইয়া পড়েন।

যোগেন্দ্রের এই রূঢ়বাক্যে ব্যথিত হইয়া হেমনলিনী মাথা নিচু করিল। নলিনাক্ষ হাসিয়া কহিল, "যোগেনবাবু, দশের মধ্যে খাপছাড়া হওয়াটা দোষের। কিন্তু তলোয়ারই কী, আর মানুষই কী, তাহার সবটাই কি খাপের মধ্যে থাকে। খাপের ভিতরে তলোয়ারের যে-অংশটা থাকিতে বাধ্য, সেটাতে সকল তলোয়ারেরই ঐক্য আছে—বাহিরের হাতলটাতে শিল্পীর ইচ্ছা ও নৈপুণ্য অনুসারে কারিগরি নানারকমের হইয়া থাকে। মানুষেরও দশের খাপের বাহিরে নিজের বিশেষ কারিগরির একটা জায়গা আছে, সেটাও কি আপনারা বেদখল করিতে চান। আর, আমার কাছে এও আশ্চর্য লাগে, আমি সকলের অগোচরে ঘরে বসিয়া যে-সকল নিরীহ অনুষ্ঠান করিয়া থাকি, তাহা লোকের চোখেই বা পড়ে কী করিয়া, আর তাহা লইয়া আলোচনাই বা হয় কেন।"

যোগেন্দ্র। আপনি তা জানেন না বুঝি, যাহারা জগতের উন্নতির ভার সম্পূর্ণ নিজের স্কন্ধে লইয়াছে, তাহারা পরের ঘরে কোথায় কী ঘটিতেছে, তাহা খুঁজিয়া বাহির করা কর্তব্যের মধ্যেই গণ্য করে। যেটুকু খবর না পায়, সেটুকু পূরণ করিয়া লইবার শক্তিও তাহাদের আছে। এ নহিলে বিশ্বের সংশোধন কার্য চলিবে কী করিয়া। তা ছাড়া

নলিনবাবু, পাঁচজনে যাহা না করে, তাহা চোখের আড়ালে করিলেও চোখে পড়িয়া যায়— যাহা সকলেই করে তাহাতে কেহ দৃষ্টিপাত করে না। এই দেখুন না কেন, আপনি ছাদে বসিয়া কী-সব কাণ্ড করেন, তাহা আমাদের হেমের চোখেও পড়িয়া গেছে—হেম সে-কথা বাবাকে বলিতেছিল— অথচ হেম তো আপনার সংশোধনের ভার গ্রহণ করে নাই।

হেমনলিনীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল; সে ব্যথিত হইয়া একটা-কী বলিবার উপক্রম করিবামাত্র নলিনাক্ষ কহিল, "আপনি কিছুমাত্র লজ্জা পাইবেন না; ছাদে বেড়াইতে উঠিয়া সকালে-সন্ধ্যায় আপনি যদি আমার আহ্নিককৃত্য দেখিয়া থাকেন, সেজন্য আপনাকে কে দোষী করিবে। আপনার দুটি চক্ষু আছে বলিয়া আপনি লজ্জিত হইবেন না; ও-দোষটা আমাদেরও আছে।"

অন্নদা। তা ছাড়া হেম আপনার আহ্নিক সম্বন্ধে আমার কাছে কোনো আপত্তি প্রকাশ করে নাই। সে শ্রদ্ধাপূর্বক আপনার সাধন-প্রণালীসম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করিতেছিল।

যোগেন্দ্র। আমি কিন্তু ওসব কিছু বুঝি না। আমরা সাধারণে সংসারে সহজরকমে যে-ভাবে চলিয়া যাইতেছি, তাহাতে কোনো বিশেষ অসুবিধা দেখিতেছি না,—গোপনে অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া বিশেষ কিছু যে লাভ হয়, আমার তাহা মনে হয় না— বরং উহাতে মনের যেন একটা সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়া মানুষকে একঝোঁকা করিয়া দেয়। কিন্তু আপনি আমার কথায় রাগ করিবেন না— আমি নিতান্তই সাধারণ মানুষ; পৃথিবীর মধ্যে আমি নেহাত মাঝারিরকম জায়গাটাতেই থাকি; যাঁহারা কোনোপ্রকার উচ্চমঞ্চে চড়িয়া বসেন, আমার পক্ষে ঢেলা না মারিয়া তাঁহাদের নাগাল পাইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। আমার মতো এমন

অসংখ্য লোক আছে, অতএব আপনি যদি সকলকে ছাড়িয়া কোনো অদ্ভুতলোকে উধাও হইয়া যান, তবে আপনাকে অসংখ্য ঢেলা খাইতে হইবে।

নলিনাক্ষ। ঢেলা যে নানারকমের আছে। কোনোটা বা স্পর্শ করে, কোনোটা বা চিহ্নিত করিয়া যায়। যদি কেহ বলে লোকটা পাগলামি করিতেছে, ছেলেমানুষি করিতেছে, তাহাতে কোনো ক্ষতি করে না— কিন্তু যখন বলে, লোকটা সাধুগিরি-সাধকগিরি করিতেছে, গুরু হইয়া উঠিয়া চেলাসংগ্রহের চেষ্টায় আছে, তখন সে-কথাটা হাসিয়া উড়াইবার চেষ্টা করিতে গেলে যে-পরিমাণ হাসির দরকার হয়, সে-পরিমাণ অপর্যাপ্ত হাসি যোগায় না।

যোগেন্দ্র। কিন্তু আবার বলিতেছি, আমার উপরে রাগ করিবেন না নলিনবাবু। আপনি ছাদে উঠিয়া যাহা খুশি করুন, আমি তাহাতে আপত্তি করিবার কে। আমার বক্তব্য কেবল এই যে, সাধারণের সীমানার মধ্যে নিজেকে ধরিয়া রাখিলে কোনো কথা থাকে না। সকলের যে-রকম চলিতেছে, আমার তেমনি চলিয়া গেলেই যথেষ্ট ;— তাহার বেশি চলিতে গেলেই লোকের ভিড় জমিয়া যায়। তাহারা গালি দিক বা ভক্তি করুক, তাহাতে কিছু আসে যায় না— কিন্তু জীবনটা এইরকম ভিড়ের মধ্যে কাটানো কি আরামের।

নলিনাক্ষ। যোগেনবাবু, যান কোথায়। আমাকে আমার ছাদের উপর হইতে একেবারে সর্বসাধারণের শান-বাঁধানো একতলার মেজের উপর সবলে হঠাৎ উত্তীর্ণ করিয়া দিয়া পালাইলে চলিবে কেন।

যোগেন্দ্র। আজকের মতো আমার পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছে— আর নয়। একটু ঘুরিয়া আসি গে।

যোগেন্দ্র চলিয়া গেলে পর হেমনলিনী মুখ নত করিয়া টেবিল-ঢাকার

ঝালরগুলির প্রতি অকারণে উপদ্রব করিতে লাগিল সে-সময়ে অনুসন্ধান করিলে তাহার চক্ষুপল্লবের প্রান্তে একটা আর্দ্রতার লক্ষণও দেখা যাইত।

হেমনলিনী দিনে দিনে নলিনাক্ষের সহিত আলাপ করিতে করিতে আপনার অন্তরের দৈন্য দেখিতে পাইল এবং নলিনাক্ষের পথ অনুসরণ করিবার জন্য ব্যাকুলভাবে ব্যগ্র হইয়া উঠিল। অত্যন্ত দুঃখের সময় যখন সে অন্তরে-বাহিরে কোনো অবলম্বন খুঁজিয়া পাইতেছিল না, তখনই নলিনাক্ষ বিশ্বকে তাহার সম্মুখে যেন নূতন করিয়া উদ্‌ঘাটিত করিল। ব্রহ্মচারিণীর মতো একটা নিয়ম পালনের জন্য তাহার মন কিছুদিন হইতে উৎসুক ছিল— কারণ, নিয়ম মনের পক্ষে একটা দৃঢ় অবলম্বন ;— শুধু তাহাই নহে, শোক কেবলমাত্র মনের ভাব-আকারে টিঁকিতে চায় না, সে বাহিরেও একটা কোনো কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যে আপনাকে সত্য করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে। এ-পর্যন্ত হেমনলিনী সেরূপ কিছু করিতে পারে নাই,—লোকচক্ষুপাতের সংকোচে বেদনাকে সে অত্যন্ত গোপনে আপনার মনের মধ্যেই পালন করিয়া আসিয়াছে। নলিনাক্ষের সাধনপ্রণালীর অনুসরণ করিয়া আজ যখন সে শুচি আচার ও নিরামিষ আহার গ্রহণ করিল, তখন তাহার মন বড়ো তৃপ্তিলাভ করিল। নিজের শয়নঘরের মেজে হইতে মাদুর ও কার্পেট তুলিয়া ফেলিয়া বিছানাটি একধারে পর্দার দ্বারা আড়াল করিল— সে-ঘরে আর-কোনো জিনিস রাখিল না। সেই মেজে প্রত্যহ হেমনলিনী স্বহস্তে জল ঢালিয়া পরিষ্কার করিত—একটি রেকাবিতে কয়েকটি ফুল থাকিত ; স্নানান্তে শুভ্রবস্ত্র পরিয়া সেইখানে মেজের উপরে হেমনলিনী বসিত— সমস্ত মুক্তবাতায়ন দিয়া ঘরের মধ্যে অবারিত আলোক প্রবেশ করিত, এবং সেই আলোকের দ্বারা, আকাশের দ্বারা, বায়ুর দ্বারা সে আপনার অন্তঃকরণকে অভিষিক্ত করিয়া

হইত। অন্নদাবাবু সম্পূর্ণভাবে হেমনলিনীর সহিত যোগ দিতে পারিতেন না— কিন্তু নিয়মপালনের দ্বারা হেমনলিনীর মুখে যে একটি পরিতৃপ্তির দীপ্তি প্রকাশ পাইত, তাহা দেখিয়া বৃদ্ধের মন স্নিগ্ধ হইয়া যাইত। এখন হইতে নলিনাক্ষ আসিলে হেমনলিনীর এই ঘরেই মেজের উপরে বসিয়া তাঁহাদের তিনজনের মধ্যে আলোচনা চলিত।

যোগেন্দ্র একেবারে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল—"এ সমস্ত কী হইতেছে। তোমরা যে সকলে মিলিয়া বাড়িটাকে ভয়ংকর পবিত্র করিয়া তুলিলে— আমার মতো লোকের এখানে পা ফেলিবার জায়গা নাই।"

আগে হইলে যোগেন্দ্রের বিদ্রূপে হেমনলিনী অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িত;— এখন অন্নদাবাবু যোগেন্দ্রের কথায় মাঝে মাঝে রাগ করিয়া উঠেন, কিন্তু হেমনলিনী নলিনাক্ষের সঙ্গে যোগ দিয়া শান্তস্নিগ্ধভাবে হাস্য করে। এখন সে একটি দ্বিধাহীন নিশ্চিত নির্ভর অবলম্বন করিয়াছে— এ-সম্বন্ধে লজ্জা করাকেও সে দুর্বলতা বলিয়া জ্ঞান করে। লোকে তাহার এখনকার সমস্ত আচরণকে অদ্ভুত মনে করিয়া পরিহাস করিতেছে, তাহা সে জানিত— কিন্তু নলিনাক্ষের প্রতি তাহার ভক্তি ও বিশ্বাস সমস্ত লোককে আচ্ছন্ন করিয়া উঠিয়াছে— এইজন্য লোকের সম্মুখে সে আর সংকুচিত হইত না।

একদিন হেমনলিনী প্রাতঃস্নানের পর উপাসনা শেষ করিয়া তাহার সেই নিভৃত ঘরটিতে বাতায়নের সম্মুখে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে, এমন সময় হঠাৎ অন্নদাবাবু নলিনাক্ষকে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। হেমনলিনীর হৃদয় তখন পরিপূর্ণ ছিল। সে তৎক্ষণাৎ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রথমে নলিনাক্ষকে ও পরে তাহার পিতাকে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিল। নলিনাক্ষ সংকুচিত হইয়া উঠিল। অন্নদাবাবু কহিলেন, "ব্যস্ত হইবেন না নলিনবাবু, হেম আপনার কর্তব্য করিয়াছে।"

অন্যদিন এত সকালে নলিনাক্ষ এখানে আসে না। তাই বিশেষ ঔৎসুক্যের সহিত হেমনলিনী তাহার মুখের দিকে চাহিল। নলিনাক্ষ কহিল, "কাশী হইতে মার খবর পাওয়া গেল, তাঁহার শরীর তেমন ভালো নাই, তাই আজ সন্ধ্যার ট্রেনে কাশীতে যাইব স্থির করিয়াছি। দিনের বেলায় যথাসম্ভব আমার সমস্ত কাজ সারিয়া লইতে হইবে, তাই এখন আপনাদের কাছে বিদায় লইতে আসিয়াছি।"

অন্নদাবাবু কহিলেন, "কী আর বলিব, আপনার মার অসুখ, ভগবান করুন তিনি শীঘ্র সুস্থ হইয়া উঠুন। এই কয়দিনে আমরা আপনার কাছে যে-উপকার পাইয়াছি, তাহার ঋণ কোনোকালে শোধ করিতে পারিব না।"

নলিনাক্ষ কহিল, "নিশ্চয় জানিবেন, আপনাদের কাছ হইতে আমি অনেক উপকার পাইয়াছি। প্রতিবেশীকে যেমন যত্নসাহায্য করিতে হয়, তাহা তো করিয়াইছেন— তা ছাড়া যে-সকল গভীর কথা লইয়া এতদিন আমি একলা মনে মনে আলোচনা করিতেছিলাম, আপনাদের শ্রদ্ধার দ্বারা তাহাকে নূতন তেজ দিয়াছেন— আমার ভাবনা ও সাধনা আপনাদের জীবন অবলম্বন করিয়া আমার পক্ষে আরও দ্বিগুণ আশ্রয়স্থল হইয়া উঠিয়াছে। অন্য মানুষের হৃদয়ের সহযোগিতায় সার্থকতালাভ যে কত সহজ হইয়া উঠিতে পারে, তাহা আমি বেশ বুঝিয়াছি।"

অন্নদা কহিলেন, "আমি আশ্চর্য এই দেখিলাম, আমাদের একটা-কিছুর বড়োই প্রয়োজন হইয়াছিল, কিন্তু সেটা যে কী, আমরা জানিতাম না— ঠিক এমন সময়েই কোথা হইতে আপনাকে পাইলাম, এবং দেখিলাম, আপনাকে নহিলে আমাদের চলিত না। আমরা অত্যন্ত কুনো, লোকজনের কাছে যাতায়াত আমাদের বড়ো বেশি নাই—কোনো

সভায় গিয়া বক্তৃতা শুনিবার বাতিক আমাদের একেবারে নাই বলিলেই হয়— যদি বা আমি যাই, কিন্তু হেমকে নড়াইতে পারা বড়ো শক্ত। কিন্তু সেদিন এ কী আশ্চর্য বলুন দেখি— যেমনি যোগেনের কাছে শুনিলাম, আপনি বক্তৃতা করিবেন, আমরা দুজনেই কোনো আপত্তি প্রকাশ না করিয়া সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম— এমন ঘটনা কখনো ঘটে নাই। এ সব কথা মনে রাখিবেন নলিনবাবু। ইহা হইতে বুঝিবেন, আপনাকে আমাদের নিঃসন্দিগ্ধ প্রয়োজন আছে নহিলে এমনটি ঘটিতে পারিত না। আমরা আপনার দায় স্বরূপ!"

নলিনাক্ষ। আপনারাও এ-কথা মনে রাখিবেন, আপনাদের কাছে ছাড়া আর কাহারো কাছে আমি আমার জীবনের গূঢ়কথা প্রকাশ করি নাই। সত্যকে প্রকাশ করিতে পারাই সত্যসম্বন্ধে চরমশিক্ষা। সেই প্রকাশ করিবার গভীর প্রয়োজন আপনাদের দ্বারাই মিটাইতে পারিয়াছি। অতএব আপনাদিগকে আমার যে কতখানি প্রয়োজন ছিল, সে কথাও আপনারা কখনো ভুলিবেন না।

হেমনলিনী কোনো কথা কহে নাই; বাতায়নের ভিতর দিয়া রৌদ্র আসিয়া মেজের উপরে পড়িয়াছিল, তাহারই দিকে তাকাইয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। নলিনাক্ষের যখন উঠিবার সময় হইল, তখন সে কহিল, "আপনার মা কেমন থাকেন, সে খবর আমরা যেন জানিতে পাই।"

নলিনাক্ষ উঠিয়া দাঁড়াইতেই হেমনলিনী পুনর্বার তাহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

৪৪

এ-কয়দিন অক্ষয় দেখা দেয় নাই। নলিনাক্ষ কাশীতে চলিয়া গেলে আজ সে যোগেন্দ্রের সঙ্গে অন্নদাবাবুর চায়ের টেবিলে দেখা দিয়াছে। অক্ষয় মনে মনে স্থির করিয়াছিল যে, রমেশের স্মৃতি হেমনলিনীর মনে কতখানি জাগিয়া আছে, তাহা পরিমাপ করিবার সহজ উপায় অক্ষয়ের প্রতি তাহার বিরাগপ্রকাশ। আজ দেখিল, হেমনলিনীর মুখ প্রশান্ত— অক্ষয়কে দেখিয়া তাহার মুখের ভাব কিছুমাত্র বিকৃত হইল না। সহজ প্রসন্নতার সহিত হেমনলিনী কহিল, "আপনাকে যে এতদিন দেখি নাই ?"

অক্ষয় কহিল, "আমরা কি প্রত্যহ দেখিবার যোগ্য।"

হেমনলিনী হাসিয়া কহিল, "সে-যোগ্যতা না থাকিলে যদি দেখাশোনা বন্ধ করা উচিত বোধ করেন, তবে আমাদের অনেককেই নির্জনবাস অবলম্বন করিতে হয়।"

যোগেন্দ্র। অক্ষয় মনে করিয়াছিল একলা বিনয় করিয়া বাহাদুরি লইবে, হেম তাহার উপরেও টেক্কা দিয়া সমস্ত মনুষ্যজাতির হইয়া বিনয় করিয়া লইল, কিন্তু এ সম্বন্ধে আমার একটুখানি বলিবার কথা আছে। আমাদের মতো সাধারণ লোকই প্রত্যহ দেখাশোনার যোগ্য— আর যাঁরা অসাধারণ, তাঁহাদিগকে কদাচ-কখনো দেখাই ভালো, তাহার বেশি সহ্য করা শক্ত। এইজন্যই তো অরণ্যে-পর্বতে-গহ্বরেই তাঁহারা ঘুরিয়া বেড়ান— লোকালয়ে তাঁহারা স্থায়ীভাবে বসতি আরম্ভ করিয়া দিলে অক্ষয়-যোগেন্দ্র প্রভৃতি নিতান্তই সামান্য লোকদের অরণ্যে-পর্বতে ছুটিতে হইত।

যোগেন্দ্রের কথাটার মধ্যে যে-খোঁচা ছিল, হেমনলিনীকে তাহা

বিঁধিল। কোনো উত্তর না দিয়া তিন পেয়ালা চা তৈরি করিয়া সে অন্নদা, অক্ষয় ও যোগেন্দ্রের সম্মুখে স্থাপন করিল। যোগেন্দ্র কহিল, "তুমি বুঝি চা খাইবে না ?

হেমনলিনী জানিত, এবার যোগেন্দ্রের কাছে কঠিন কথা শুনিতে হইবে, তবু সে শান্ত দৃঢ়তার সহিত বলিল, "না, আমি চা ছাড়িয়া দিয়াছি।"

যোগেন্দ্র। এবারে রীতিমতো তপস্যা আরম্ভ হইল বুঝি। চায়ের পাতার মধ্যে বুঝি আধ্যাত্মিক তেজ যথেষ্ট নাই, যা-কিছু আছে, সমস্তই হরতুকির মধ্যে ? কী বিপদেই পড়া গেল। হেম, ও-সমস্ত রাখিয়া দাও। এক পেয়ালা চা খাইলেই যদি তোমার যোগ-যাগ ভাঙিয়া যায়, তবে যাক না— এ-সংসারে খুব মজবুত জিনিসও টেকে না, অমন পলকা ব্যাপার লইয়া পাঁচজনের মধ্যে চলা অসম্ভব।

এই বলিয়া যোগেন্দ্র উঠিয়া স্বহস্তে আর-এক পেয়ালা চা তৈরি করিয়া হেমনলিনীর সম্মুখে রাখিল। সে তাহাতে হস্তক্ষেপ না করিয়া অন্নদাবাবুকে কহিল, "বাবা, আজ যে তুমি শুধু চা খাইলে। আর কিছু খাইবে না ?"

অন্নদাবাবুর কণ্ঠস্বর এবং হাত কাঁপিতে লাগিল, "মা, আমি সত্য বলিতেছি, এ-টেবিলে কিছু খাইতে আমার মুখে রোচে না। যোগেনের কথাগুলো আমি অনেকক্ষণ পর্যন্ত নীরবে সহ্য করিতে চেষ্টা করিতেছি। জানি, আমার শরীর-মনের এ-অবস্থায় কথা বলিতে গেলেই আমি কী বলিতে কী বলিয়া ফেলি— শেষকালে অনুতাপ করিতে হইবে।"

হেমনলিনী তাহার পিতার চেয়ারের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "বাবা, তুমি রাগ করিয়ো না— দাদা আমাকে চা খাওয়াইতে চান,

সে তো ভালোই— আমি তো কিছু তাহাতে মনে করি নাই। না বাবা, তোমাকে খাইতে হইবে—খালি পেটে চা খাইলে তোমার অসুখ করে আমি জানি।”

এই বলিয়া হেম আহার্যের পাত্র তাহার বাপের সম্মুখে টানিয়া আনিল। অন্নদা ধীরে ধীরে খাইতে লাগিলেন।

হেমনলিনী নিজের চৌকিতে ফিরিয়া আসিয়া যোগেন্দ্রের প্রস্তুত চায়ের পেয়ালা হইতে চা খাইতে উদ্যত হইল। অক্ষয় তাড়াতাড়ি উঠিয়া কহিল, “মাপ করিবেন, ও-পেয়ালাটি আমাকে দিতে হইবে, আমার পেয়ালা ফুরাইয়া গেছে।”

যোগেন্দ্র উঠিয়া আসিয়া হেমনলিনীর হাত হইতে পেয়ালাটা টানিয়া লইল এবং অন্নদাকে কহিল, “আমার অন্যায় হইয়াছে, আমাকে মাপ করো।”

অন্নদা তাহার কোনো উত্তর করিতে পারিলেন না, দেখিতে দেখিতে তাঁহার দুই চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

যোগেন্দ্র অক্ষয়কে লইয়া আস্তে আস্তে ঘর হইতে সরিয়া গেল। অন্নদাবাবু আহার করিয়া উঠিয়া হেমনলিনীর হাত ধরিয়া কম্পমান চরণে উপরের ঘরে গেলেন।

সেই রাত্রেই অন্নদাবাবুর শূলবেদনার মতো হইল। ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিল, “তাঁহার যকৃতের বিকার উপস্থিত হইয়াছে— এখনো রোগ অগ্রসর হয় নাই, এইবেলা পশ্চিমে কোনো স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়া বৎসরখানেক কিংবা ছয় মাস বাস করিয়া আসিলে শরীর নির্দোষ হইতে পারিবে।”

বেদনা উপশম হইলে ও ডাক্তার চলিয়া গেলে, অন্নদাবাবু কহিলেন, “হেম, চলো মা, আমরা কিছুদিন না হয় কাশীতে গিয়াই থাকি।”

ঠিক একই সময়ে হেমনলিনীর মনেও সে-কথা উদয় হইয়াছিল। নলিনাক্ষ চলিয়া যাইবামাত্র হেম আপন সাধনসম্বন্ধে একটা দুর্বলতা অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। নলিনাক্ষের উপস্থিতিমাত্রই হেমনলিনীর সমস্ত আহ্নিকক্রিয়াকে যেন দৃঢ় অবলম্বন দিত। নলিনাক্ষের মুখশ্রীতেই যে একটা স্থির নিষ্ঠা ও প্রশান্ত প্রসন্নতার দীপ্তি ছিল, তাহাই হেমনলিনীর বিশ্বাসকে সর্বদাই যেন বিকশিত করিয়া রাখিয়াছিল। নলিনাক্ষের অবর্তমানে তাহার উৎসাহের মধ্যে যেন একটা ম্লান ছায়া আসিয়া পড়িল। তাই আজ সমস্ত দিন হেমনলিনী নলিনাক্ষের উপদিষ্ট সমস্ত অনুষ্ঠান অনেক জোর করিয়া এবং বেশি করিয়া পালন করিয়াছে। কিন্তু তাহাতে শ্রান্তি আসিয়া এমনি নৈরাশ্য উপস্থিত হইয়াছিল যে, সে অশ্রু সংবরণ করিতে পারে নাই। চায়ের টেবিলে দৃঢ়তার সহিত সে আতিথ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার মনের মধ্যে একটা ভার চাপিয়াছিল। আবার তাহাকে তাহার সেই পূর্বস্মৃতির বেদনা দ্বিগুণবেগে আক্রমণ করিয়াছে—আবার তাহার মন যেন গৃহহীন, আশ্রয়হীনের মতো হা হা করিয়া বেড়াইতে উদ্যত হইয়াছে। তাই যখন সে কাশী যাইবার প্রস্তাব শুনিল, তখন ব্যগ্র হইয়া কহিল, "বাবা, সেই বেশ হইবে।"

পরদিন একটা আয়োজনের উদ্যোগ দেখিয়া যোগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "কী, ব্যাপারটা কী।"

অন্নদা কহিলেন, "আমরা পশ্চিমে যাইতেছি।"

যোগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "পশ্চিমে কোথায়।"

অন্নদা কহিলেন,"ঘুরিতে ঘুরিতে একটা কোনো জায়গা পছন্দ করিয়া লইব।" তিনি যে কাশীতে যাইতেছেন, এ-কথা একদমে যোগেন্দ্রের কাছে বলিতে সংকুচিত হইলেন।

যোগেন্দ্র কহিল, "আমি কিন্তু এবার তোমাদের সঙ্গে যাইতে পারিব না। আমি সেই হেডমাস্টারির জন্য দরখাস্ত পাঠাইয়া দিয়াছি, তাহার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিতেছি।"

৪৫

রমেশ প্রত্যূষেই এলাহাবাদ হইতে গাজিপুরে ফিরিয়া আসিল। তখন রাস্তায় অধিক লোক ছিল না, এবং শীতের জড়িমায় রাস্তার ধারের গাছগুলা যেন পল্লবাবরণের মধ্যে আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। পাড়ার বস্তিগুলির উপরে তখনো একখানা করিয়া সাদা কুয়াশা ডিম্বগুলির উপরে নিস্তব্ধ-আসীন রাজহংসের মতো স্থির হইয়া ছিল। সেই নির্জন পথে গাড়ির মধ্যে একটা মস্ত মোটা ওভারকোটের নিচে রমেশের বক্ষঃস্থল চঞ্চল হৃৎপিণ্ডের আঘাতে কেবলই তরঙ্গিত হইতেছিল।

বাংলার বাহিরে গাড়ি দাঁড় করাইয়া রমেশ নামিল। ভাবিল, গাড়ির শব্দ নিশ্চয়ই কমলা শুনিয়াছে;— শব্দ শুনিয়া সে হয়তো বারান্দায় বাহির হইয়া আসিয়াছে। স্বহস্তে কমলার গলায় পরাইয়া দিবার জন্য এলাহাবাদ হইতে রমেশ একটি দামি নেকলেস কিনিয়া আনিয়াছে— তাহারই বাক্সটা রমেশ তাহার ওভারকোটের বৃহৎ পকেট হইতে বাহির করিয়া লইল।

বাংলার সম্মুখে আসিয়া রমেশ দেখিল, বিষণ-বেহারা বারান্দায় শুইয়া অকাতরে নিদ্রা দিতেছে— ঘরের দ্বারগুলি বন্ধ। বিমর্ষমুখে রমেশ একটু থমকিয়া দাঁড়াইল। একটু উচ্চস্বরে ডাকিল, "বিষণ।" ভাবিল, এই ডাকে ঘরের ভিতরকার নিদ্রাও ভাঙিবে। কিন্তু এমন

করিয়া নিদ্রা ভাঙাইবার যে অপেক্ষা আছে, ইহাই তাহার মনে বাজিল ; রমেশ তো অর্ধেক রাত্রি ঘুমাইতে পারে নাই।

দুই-তিন ডাকেও বিষণ উঠিল না— শেষকালে ঠেলিয়া তাহাকে উঠাইতে হইল। বিষণ উঠিয়া বসিয়া ক্ষণকাল হতবুদ্ধির মতো তাকাইয়া রহিল। রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, "বহুজি ঘরে আছেন।"

বিষণ প্রথমটা রমেশের কথা যেন বুঝিতেই পারিল না— তাহার পরে হঠাৎ চমকিত হইয়া উঠিয়া কহিল, "হাঁ, তিনি ঘরেই আছেন।" এই বলিয়া সে পুনর্বার শুইয়া পড়িয়া নিদ্রা দিবার উপক্রম করিল।

রমেশ দ্বার ঠেলিতেই দ্বার খুলিয়া গেল। ভিতরে গিয়া ঘরে ঘরে ঘুরিয়া দেখিল, কেহ কোথাও নাই। তথাপি একবার উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল, "কমলা!" কোথাও কোনো সাড়া পাইল না। বাহিরের বাগানে নিমগাছতলা পর্যন্ত ঘুরিয়া আসিল, রান্নাঘরে, চাকরদের ঘরে, আস্তাবল-ঘরে সন্ধান করিয়া আসিল, কোথাও কমলাকে দেখিতে পাইল না। তখন রৌদ্র উঠিয়া পড়িয়াছে—কাকগুলা ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং বাংলার ইঁদারা হইতে জল লইবার জন্য কলস মাথায় পাড়ার মেয়ে দুই-একজন দেখা দিতেছে। পথের ও-পারে কুটির-প্রাঙ্গণে কোনো পল্লীনারী বিচিত্র উচ্চ সুরে গান গাহিতে গাহিতে জাঁতায় গম ভাঙিতে আরম্ভ করিয়াছে।

রমেশ বাংলাঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, বিষণ পুনরায় গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন। তখন সে নত হইয়া দুই হাতে খুব করিয়া বিষণকে ঝাঁকানি দিতে লাগিল— দেখিল, তাহার নিশ্বাসে তাড়ির প্রবল গন্ধ ছুটিতেছে।

ঝাঁকানির বিষম বেগে বিষণ অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া ধড়ফড়

করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। রমেশ পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিল, "বহুজি কোথায়।"

বিষণ কহিল, "বহুজি তো ঘরেই আছেন।"

রমেশ। কই, ঘরে কোথায় ?

বিষণ। কাল তো এখানেই আসিয়াছেন।

রমেশ। তাহার পরে কোথায় গেছেন ?

বিষণ হাঁ করিয়া রমেশের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

এমন সময়ে খুব চওড়াপাড়ের এক বাহারে ধুতি পরিয়া চাদর উড়াইয়া রক্তবর্ণচক্ষু উমেশ আসিয়া উপস্থিত হইল। রমেশ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "উমেশ, তোর মা কোথায়।"

উমেশ কহিল, "মা তো কাল হইতে এখানেই আছেন।"

রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কোথায় ছিলি।"

উমেশ কহিল, "আমাকে মা কাল বিকালে সিধুবাবুদের বাড়ি যাত্রা শুনিতে পাঠাইয়াছিলেন।"

গাড়োয়ান আসিয়া কহিল, "বাবু আমার ভাড়া।"

রমেশ তাড়াতাড়ি সেই গাড়িতে চড়িয়া একেবারে খুড়ার বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে গিয়া দেখিল, বাড়িসুদ্ধ সকলেই যেন চঞ্চল। রমেশের মনে হইল, কমলার বুঝি কোনো অসুখ করিয়াছে। কিন্তু তাহা নহে। কাল সন্ধ্যার কিছু পরেই উমা হঠাৎ অত্যন্ত চীৎকার করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল এবং তাহার মুখ নীল ও হাত-পা ঠাণ্ডা হইয়া পড়ায় সকলেই অত্যন্ত ভয় পাইয়া গেল। তাহার চিকিৎসা লইয়া কাল বাড়িসুদ্ধ সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া ছিল। সমস্ত রাত কেহ ঘুমাইতে পার নাই।

রমেশ মনে করিল, উমির অসুখ হওয়াতে নিশ্চয়ই কাল কমলাকে

এখানে আনানো হইয়াছিল। বিপিনকে কহিল, "কমলা তা হইলে উমিকে লইয়া খুবই উদ্‌বিগ্ন হইয়া আছে।"

কমলা কাল রাত্রে এখানে আসিয়াছিল কিনা, বিপিন তাহা নিশ্চয় জানিত না— তাই রমেশের কথায় একপ্রকার সায় দিয়া কহিল, "হাঁ, তিনি উমিকে যে রকম ভালোবাসেন, খুব ভাবিতেছেন বইকি। কিন্তু ডাক্তার বলিয়াছে, ভাবনার কোনো কারণই নাই।"

যাহা হউক, অত্যন্ত উল্লাসের মুখে কল্পনার পূর্ণ উচ্ছ্বাসে বাধা পাইয়া রমেশের মনটা বিকল হইয়া গেল। সে ভাবিতে লাগিল, তাহাদের মিলনে যেন একটা দৈবের ব্যাঘাত আছে।

এমন সময় রমেশের বাংলা হইতে উমেশ আসিয়া উপস্থিত হইল। এখানকার অন্তঃপুরে তাহার গতিবিধি ছিল। এই বালকটাকে শৈলজা স্নেহও করিত। বাড়ির ভিতরে শৈলজার ঘরের মধ্যে সে প্রবেশ করিতেছে দেখিয়া উমির ঘুম ভাঙিবার আশঙ্কায় শৈল তাড়াতাড়ি ঘরের বাহির হইয়া আসিল।

উমেশ জিজ্ঞাসা করিল, "মা কোথায় মাসীমা।"

শৈল বিস্মিত হইয়া কহিল, "কেন রে, তুই তো কাল তাহাকে সঙ্গে লইয়া ও-বাড়িতে গেলি। সন্ধ্যার পর আমাদের লছমনিয়াকে ওখানে পাঠাইবার কথা ছিল, খুকীর অসুখে তাহা পারি নাই।"

উমেশ মুখ ম্লান করিয়া কহিল, "ও-বাড়িতে তো তাঁহাকে দেখিলাম না।"

শৈল ব্যস্ত হইয়া কহিল, "সে কী কথা। কাল রাত্রে তুই কোথায় ছিলি?"

উমেশ। আমাকে তো মা থাকিতে দিলেন না। ও-বাড়িতে গিয়াই তিনি আমাকে সিধুবাবুদের ওখানে যাত্রা শুনিতে পাঠাইয়াছিলেন

শৈল। তোরও তো বেশ আক্কেল দেখিতেছি। বিষণ কোথায় ছিল ?

উমেশ। বিষণ তো কিছুই বলিতে পারে না। কাল সে খুব তাড়ি খাইয়াছিল।

শৈল। যা, যা, শীঘ্র বাবুকে ডাকিয়া আন্।

বিপিন আসিতেই শৈল কহিল, "ওগো, এ কী সর্বনাশ হইয়াছে।"

বিপিনের মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। সে ব্যস্ত হইয়া কহিল, "কেন, কী হইয়াছে ?"

শৈল। কমল কাল ও-বাংলায় গিয়াছিল, তাহাকে তো সেখানে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না।

বিপিন। তিনি কি কাল রাত্রে এখানে আসেন নাই।

শৈল। না গো। উমির অসুখে আনাইব মনে করিয়াছিলাম, লোক কোথায় ছিল ? রমেশবাবু কি আসিয়াছেন।

বিপিন। বোধ হয়, ও-বাংলায় দেখিতে না পাইয়া তিনি ঠিক করিয়াছেন, কমলা এখানেই আছেন। তিনি তো আমাদের এখানেই আসিয়াছেন।

শৈল। যাও যাও, শীঘ্র যাও, তাঁহাকে লইয়া খোঁজ করো গে। উমি এখন ঘুমাইতেছে— সে ভালোই আছে।

বিপিন ও রমেশ আবার সেই গাড়িতে উঠিয়া বাংলায় ফিরিয়া গেল এবং বিষণকে লইয়া পড়িল। অনেক চেষ্টায় জোড়াতাড়া দিয়া যেটুকু খবর বাহির হইল, তাহা এই— কাল বৈকালে কমলা একলা গঙ্গার ধারের অভিমুখে চলিয়াছিল। বিষণ তাহার সঙ্গে যাইবার প্রস্তাব করে, কমলা তাহার হাতে একটা টাকা দিয়া তাহাকে নিষেধ করিয়া ফিরাইয়া দেয়। সে পাহারা দিবার জন্য বাগানের গেটের কাছে বসিয়া ছিল—

এমন সময়ে গাছ হইতে সদ্যঃসঞ্চিত ফেনোচ্ছল তাড়ির কলস বাঁকে করিয়া তাড়িওয়ালা তাহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছিল, তাহার পর হইতে বিশ্বসংসারে কী যে ঘটিয়াছে, তাহা বিষণের কাছে যথেষ্ট স্পষ্ট নহে। যে-পথ দিয়া কমলাকে গঙ্গার দিকে যাইতে দেখিয়াছিল, বিষণ তাহা দেখাইয়া দিল।

সেই পথ অবলম্বন করিয়া শিশিরসিক্ত শস্যক্ষেত্রের মাঝখান দিয়া রমেশ, বিপিন ও উমেশ কমলার সন্ধানে চলিল। উমেশ হৃতশাবক শিকারী জন্তুর মতো চারিদিকে তীক্ষ্ণ ব্যাকুল দৃষ্টি প্রেরণ করিতে লাগিল। গঙ্গার তটে আসিয়া তিনজনে একবার দাঁড়াইল। সেখানে চারিদিক উন্মুক্ত। ধূসর বালুকা প্রভাত-রৌদ্রে ধু ধু করিতেছে। কোথাও কাহাকেও দেখা গেল না। উমেশ উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া ডাকিল, "মা, মাগো, মা কোথায়?" ও-পারের সুদূর উচ্চতীর হইতে তাহার প্রতিধ্বনি ফিরিয়া আসিল— কেহই সাড়া দিল না।

খুঁজিতে খুঁজিতে উমেশ হঠাৎ দূরে সাদা কী-একটা দেখিতে পাইল। তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া দেখিল, জলের একেবারে ধারেই একগোছা চাবি একটা রুমালে বাঁধা পড়িয়া আছে। "কী রে, ওটা কী।" বলিয়া রমেশও আসিয়া পড়িল। দেখিল, কমলারই চাবির গোছা।

যেখানে চাবি পড়িয়া ছিল, সেখানে বালুতটের প্রান্তভাগে পলিমাটি পড়িয়াছে। সেই কাঁচা মাটির উপর দিয়া গঙ্গার জল পর্যন্ত ছোটো দুইটি পায়ের গভীর চিহ্ন পড়িয়া গেছে। খানিকটা জলের মধ্যে একটা-কী ঝিকঝিক করিতেছিল, তাহা উমেশের দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না— সে সেটা তাড়াতাড়ি তুলিয়া ধরিতেই দেখা গেল, সোনার উপরে এনামেল-করা একটি ছোটো ব্রোচ— ইহা রমেশেরই উপহার।

এইরূপে সমস্ত সংকেতই যখন গঙ্গার জলের দিকেই অঙ্গুলিনির্দেশ করিল, তখন উমেশ আর থাকিতে পারিল না— "মা মাগো" বলিয়া চীৎকার করিয়া জলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। জল সেখানে অধিক ছিল না— উমেশ বারংবার পাগলের মতো ডুব দিয়া দিয়া তলা হাতড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল, জল ঘোলা করিয়া তুলিল।

রমেশ হতবুদ্ধির মতো দাঁড়াইয়া রহিল। বিপিন কহিল, "উমেশ, তুই কী করিতেছিস? উঠিয়া আয়।"

উমেশ মুখ দিয়া জল ফেলিতে ফেলিতে বলিতে লাগিল, "আমি উঠিব না— আমি উঠিব না। মাগো, তুমি আমাকে ফেলিয়া যাইতে পারিবে না।"

বিপিন ভীত হইয়া উঠিল। কিন্তু উমেশ জলের মাছের মতো সাঁতার দিতে পারে— তাহার পক্ষে জলে আত্মহত্যা করা অত্যন্ত কঠিন। সে অনেকটা হাঁপাইয়া-ঝাঁপাইয়া শ্রান্ত হইয়া ডাঙায় উঠিয়া পড়িল এবং বালুর উপরে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

বিপিন নিস্তব্ধ রমেশকে স্পর্শ করিয়া কহিল, "রমেশবাবু, চলুন। এখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কী হইবে। একবার পুলিসকে খবর দেওয়া যাক, তাহারা সমস্ত সন্ধান করিয়া দেখুক।"

শৈলজার ঘরে সেদিন আহারনিদ্রা বন্ধ হইয়া কান্নার রোল উঠিল। নদীতে জেলেরা নৌকা লইয়া অনেকদূর পর্যন্ত জাল টানিয়া বেড়াইল। পুলিস চারিদিকে সন্ধান করিতে লাগিল। স্টেশনে গিয়া বিশেষ করিয়া খবর লইল, কমলার সহিত বর্ণনায় মেলে, এমন কোনো বাঙালির মেয়ে রাত্রে রেলগাড়িতে ওঠে নাই।

সেইদিনই বিকালে খুড়া আসিয়া পৌঁছিলেন। কয়দিন হইতে কমলার

ব্যবহার ও আদ্যোপান্ত সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহার সন্দেহমাত্র রহিল না যে, কমলা গঙ্গার জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছে।

লছমনিয়া কহিল, "সেইজন্যই খুকী কাল রাত্রে অকারণে কান্না জুড়িয়া এমন একটা অদ্ভুত কাণ্ড করিল, উহাকে ভালো করিয়া ঝাড়াইয়া লওয়া দরকার।"

রমেশের বুকের ভিতরটা যেন শুকাইয়া গেল— তাহার মধ্যে অশ্রুর বাষ্পটুকুও ছিল না। সে বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল, একদিন এই কমলা এই গঙ্গার জল হইতে উঠিয়া আমার পাশে আসিয়াছিল, আবার পূজার পবিত্র ফুলটুকুর মতো আর একদিন এই গঙ্গার জলের মধ্যেই অন্তর্হিত হইল।

সূর্য যখন অস্ত গেল, তখন রমেশ আবার সেই গঙ্গার ধারে আসিল —যেখানে চাবির গোছা পড়িয়া ছিল, সেখানে দাঁড়াইয়া সেই পায়ের চিহ্ন কটি একদৃষ্টে দেখিল, তাহার পরে তীরে জুতা খুলিয়া ধুতি গুটাইয়া লইয়া খানিকটা জল পর্যন্ত নামিয়া গেল, এবং বাক্স হইতে সেই নূতন নেকলেসটি বাহির করিয়া দূরে জলের মধ্যে ছুঁড়িয়া ফেলিল।

রমেশ কখন যে গাজিপুর হইতে চলিয়া গেল, খুড়ার বাড়িতে তাহার খবর লইবার মতো অবস্থা কাহারও রহিল না।

৪৬

এখন রমেশের সম্মুখে কোনো কাজ রহিল না। তাহার মনে হইতে লাগিল, ইহজীবনে সে যেন কোনো কাজ করিবে না, কোথাও স্থায়ী হইয়া বসিতে পারিবে না। হেমনলিনীর কথা তাহার মনে একেবারেই যে উঠে নাই, তাহা নহে, কিন্তু তাহা সে সরাইয়া দিয়াছে—সে মনে মনে

বলিয়াছে, "আমার জীবনে যে নিদারুণ ঘটনা আঘাত করিল, তাহাতে আমাকে চিরদিনের জন্য সংসারের অযোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। বজ্রাহত গাছ প্রফুল্ল উপবনের মধ্যে স্থান পাইবার আশা কেন করিবে।"

রমেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবার জন্য বাহির হইল। একজায়গায় কোথাও বেশিদিন রহিল না। সে নৌকায় চড়িয়া কাশীর ঘাটের শোভা দেখিল, সে দিল্লিতে কুতুবমিনারের উপরে চড়িল, আগ্রায় জ্যোৎস্না-রাত্রে তাজ দেখিয়া আসিল। অমৃতসরে গুরুদরবার দেখিয়া রাজপুতনায় আবুপর্বতশিখরের মন্দির দেখিতে গেল—এমনি করিয়া রমেশ নিজের শরীর-মনকে আর বিশ্রাম দিল না।

অবশেষে এই ভ্রমণশ্রান্ত যুবকটির অন্তঃকরণ কেবল ঘর চাহিয়া হা হা করিতে লাগিল। তাহার মনে একটি শান্তিময় ঘরের অতীত স্মৃতি ও একটি সম্ভবপর ঘরের সুখময় কল্পনা কেবলই আঘাত দিতেছে। অবশেষে একদিন তাহার শোককালযাপনের ভ্রমণ হঠাৎ শেষ হইয়া গেল এবং সে একটা মস্ত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কলিকাতার টিকিট কিনিয়া রেলগাড়িতে উঠিয়া পড়িল।

কলিকাতায় পৌঁছিয়া রমেশ সেই কলুটোলার গলিটার ভিতরে হঠাৎ প্রবেশ করিতে পারিল না। সেখানে গিয়া সে কী দেখিবে, কী শুনিবে তাহার কিছুই ঠিকানা নাই। মনের মধ্যে কেবলই একটা আশঙ্কা হইতে লাগিল যে, সেখানে একটা গুরুতর পরিবর্তন হইয়াছে। একদিন তো সে গলির মোড় পর্যন্ত গিয়া ফিরিয়া আসিল। পরদিন সন্ধ্যাবেলা রমেশ নিজেকে জোর করিয়া সেই বাড়ির সম্মুখে উপস্থিত করিল। দেখিল, বাড়ির সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ—ভিতরে কোনো লোক আছে, এমন লক্ষণ নাই। তবু সেই সুখন-বেহারাটা হয়তো শূন্য বাড়ি আগলাইতেছে মনে করিয়া রমেশ বেহারাকে ডাকিয়া দ্বারে বারকতক

আঘাত করিল। কেহ সাড়া দিল না। প্রতিবেশী চন্দ্রমোহন তাহার ঘরের বাহিরে বসিয়া তামাক খাইতেছিল— সে কহিল, "কে ও। রমেশবাবু নাকি। ভালো আছেন তো? এ-বাড়িতে অন্নদাবাবুরা তো এখন কেহ নাই।"

রমেশ। তাঁহারা কোথায় গেছেন জানেন?

চন্দ্রমোহন। সে-খবর তো বলিতে পারি না, পশ্চিমে গেছেন এই জানি।

রমেশ। কে কে গেছেন মশায়?

চন্দ্র। অন্নদাবাবু আর তাঁর মেয়ে।

রমেশ। ঠিক জানেন, তাঁদের সঙ্গে আর কেহ যান নাই?

চন্দ্র। ঠিক জানি বইকি। যাইবার সময়ও আমার সঙ্গে দেখা হইয়াছে।

তখন রমেশ ধৈর্যরক্ষায় অক্ষম হইয়া কহিল, "আমি একজনের কাছে খবর পাইয়াছি, নলিনবাবু বলিয়া একটি বাবু তাঁহাদের সঙ্গে গেছেন।"

চন্দ্র। ভুল খবর পাইয়াছেন। নলিনবাবু আপনার ওই বাসাটাতেই দিনকয়েক ছিলেন। ইঁহারা যাত্রা করিবার দিন দুই-চার পূর্বেই তিনি কাশীতে গেছেন।

রমেশ তখন এই নলিনবাবুটির বিবরণ প্রশ্ন করিয়া করিয়া চন্দ্রমোহনের কাছ হইতে বাহির করিল। ইঁহার নাম নলিনাক্ষ চট্টোপাধ্যায়। শোনা গেছে, পূর্বে রংপুরে ডাক্তারি করিতেন, এখন মাকে লইয়া কাশীতেই আছেন। রমেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। জিজ্ঞাসা করিল, "যোগেন এখন কোথায় আছে বলিতে পারেন?"

চন্দ্রমোহন খবর দিল, যোগেন্দ্র ময়মনসিংহের একটি জমিদারের স্থাপিত হাইস্কুলের হেডমাস্টারপদে নিযুক্ত হইয়া বিশাইপুরে গিয়াছে।

চন্দ্রমোহন জিজ্ঞাসা করিল, "রমেশবাবু, আপনাকে তো অনেকদিন দেখি নাই— আপনি এতকাল কোথায় ছিলেন।"

রমেশ আর গোপন করিবার কারণ দেখিল না— সে কহিল, "প্র্যাকটিস করিতে গাজিপুরে গিয়াছিলাম।"

চন্দ্র। এখন তবে কি সেইখানেই থাকা হইবে।

রমেশ। না, সেখানে আমার থাকা হইল না— এখন কোথায় যাইব ঠিক করি নাই।

রমেশ চলিয়া যাইবার অনতিকাল পরেই অক্ষয় আসিয়া উপস্থিত হইল। যোগেন্দ্র চলিয়া যাইবার সময়, মাঝে মাঝে তাহাদের বাড়ির তত্ত্বাবধানের জন্য অক্ষয়ের উপর ভার দিয়া গিয়াছিল। অক্ষয় যে-ভার গ্রহণ করে, তাহা রক্ষা করিতে কখনো শৈথিল্য করে না— তাই সে হঠাৎ যখন-তখন আসিয়া দেখিয়া যায়, বাড়ির বেহারা দুজনের মধ্যে একজনও হাজির থাকিয়া খবরদারি করিতেছে কি না।

চন্দ্রমোহন তাহাকে কহিল, "রমেশবাবু এই খানিকক্ষণ হইল এখান হইতে চলিয়া গেলেন।"

অক্ষয়। বলেন কী? কী করিতে আসিয়াছিলেন?

চন্দ্র। তাহা তো জানি না। আমার কাছে অন্নদাবাবুদের সমস্ত খবর জানিয়া লইলেন। এমন রোগা হইয়া গেছেন, হঠাৎ তাঁহাকে চেনাই কঠিন— যদি বেহারাকে না ডাকিতেন, আমি চিনিতে পারিতাম না।

অক্ষয়। এখন কোথায় থাকেন, খবর পাইলেন?

চন্দ্র। এতদিন গাজিপুরে ছিলেন— এখন সেখান হইতে উঠিয়া আসিয়াছেন, কোথায় থাকিবেন, ঠিক করিয়া বলিতে পারিলেন না।

অক্ষয় বলিল, "ও।" বলিয়া আপন কর্মে মন দিল।

রমেশ বাসায় ফিরিয়া আসিয়া ভাবিতে লাগিল, "অদৃষ্ট এ কী বিষম কৌতুকে প্রবৃত্ত হইয়াছে। একদিকে আমার সঙ্গে কমলার ও অন্য দিকে নলিনাক্ষের সঙ্গে হেমনলিনীর এই মিলন, এ যে একেবারে উপন্যাসের মতো— সেও কুলিখিত উপন্যাস। এমনতরো ঠিক উলটা-পালটা মিল করিয়া দেওয়া অদৃষ্টেরই মতো বে-পরোয়া রচয়িতার পক্ষেই সম্ভব— সংসারে সে এমন অদ্ভুত কাণ্ড ঘটায়, যাহা ভীরু লেখক কাল্পনিক উপাখ্যানে লিখিতে সাহস করে না।" কিন্তু রমেশ ভাবিল, এবার সে যখন তাহার জীবনের সমস্যাজাল হইতে মুক্ত হইয়াছে, তখন খুব সম্ভব, অদৃষ্ট এই জটিল উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ে রমেশের পক্ষে নিদারুণ উপসংহার লিখিবে না।

যোগেন্দ্র বিশাইপুর জমিদারবাড়ির নিকটবর্তী একটি একতলা বাড়িতে বাসা পাইয়াছিল— সেখানে রবিবার সকালে খবরের কাগজ পড়িতেছিল, এমন সময় বাজারের একটি লোক তাহার হাতে একখানি চিঠি দিল। খামের উপরকার অক্ষর দেখিয়াই সে আশ্চর্য হইয়া গেল। খুলিয়া দেখিল, রমেশ লিখিয়াছে— সে বিশাইপুরের একটি দোকানে অপেক্ষা করিতেছে, বিশেষ কয়েকটি কথা বলিবার আছে।

যোগেন্দ্র একেবারে চৌকি ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল। রমেশকে যদিও সে একদিন অপমান করিতে বাধ্য হইয়াছিল— তবু সেই বাল্য-বন্ধুকে এই দূরদেশে এতদিন অদর্শনের পরে ফিরাইয়া দিতে পারিল না। এমন কি, তাহার মনের মধ্যে একটা আনন্দই হইল— কৌতূহলও কম হইল না। বিশেষত হেমনলিনী যখন কাছে নাই, তখন রমেশের দ্বারা কোনো অনিষ্টের আশঙ্কা করা যায় না।

পত্রবাহকটিকে সঙ্গে করিয়া যোগেন্দ্র নিজেই রমেশের সন্ধানে চলিল। দেখিল সে একটি মুদির দোকানে একটা শূন্য কেরোসিনের বাক্স খাড়া

করিয়া তাহার উপরে চুপ করিয়া বসিয়া আছে,— মুদি ব্রাহ্মণের হুঁকায় তাহাকে তামাক দিতে প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু চশমা-পরা বাবুটি তামাক খায় না শুনিয়া মুদি তাহাকে শহরজাত কোনো অদ্ভুতশ্রেণীয় পদার্থের মধ্যে গণ্য করিয়াছিল। সেই অবধি পরস্পরের মধ্যে কোনোপ্রকার আলাপ পরিচয়ের চেষ্টা হয় নাই।

যোগেন্দ্র সবেগে আসিয়া একেবারে রমেশের হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া তুলিল— কহিল "তোমার সঙ্গে পারা গেল না। তুমি আপনার দ্বিধা লইয়াই গেলে। কোথায় একেবারে সোজা আমার বাসায় আসিয়া হাজির হইবে, না পথের মধ্যে মুদির দোকানে গুড়ের বাতাসা ও মুড়ির চাকতির মাঝখানে অটল হইয়া বসিয়া আছ।"

রমেশ অপ্রতিভ হইয়া একটুখানি হাসিল। যোগেন্দ্র পথের মধ্যে অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিল, কহিল, "যিনিই যাই বলুন, বিধাতাকে আমরা কেহই চিনিতে পারি নাই। তিনি আমাকে শহরের মধ্যে মানুষ করিয়া এতবড়ো শাহরিক করিয়া তুলিলেন, সে কি এই ঘোর পাড়াগাঁয়ের মধ্যে আমার জীবাত্মাটাকে একেবারে মাঠে মারিবার জন্য।"

রমেশ চারিদিকে তাকাইয়া কহিল, "কেন, জায়গাটি তো মন্দ নয়।"

যোগেন্দ্র। অর্থাৎ ?

রমেশ। অর্থাৎ নির্জন—

যোগেন্দ্র। সেইজন্য আমার মতো আরও একটি জনকে বাদ দিয়া এই নির্জনতা আর-একটু বাড়াইবার জন্য আমি অহরহ ব্যাকুল হইয়া আছি।

রমেশ। যাই বলো, মনের শান্তির পক্ষে—

যোগেন্দ্র। ও-সব কথা আমাকে বলিয়ো না,—কয়দিন প্রচুর মনের

শাস্তি লইয়া আমার প্রাণ একেবারে কণ্ঠাগত হইয়া আসিয়াছে। আমার সাধ্যমতো এই শাস্তি ভাঙিবার জন্য ত্রুটি করি নাই। ইতিমধ্যে সেক্রেটারির সঙ্গে হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইয়াছে। জমিদার-বাবুটিকেও আমার মেজাজের যে প্রকার পরিচয় দিয়াছি, সহজে তিনি আমার উপরে আর হস্তক্ষেপ করিতে আসিবেন না। তিনি আমাকে দিয়া ইংরেজি খবরের কাগজে তাঁহার নকিবি করাইয়া লইতে ইচ্ছুক ছিলেন— কিন্তু আমার ইচ্ছা স্বতন্ত্র, সেটা আমি তাঁকে কিছু প্রবলভাবে বুঝাইয়া দিয়াছি। তবু যে টিঁকিয়া আছি, সে আমার নিজগুণে নয়। এখানকার জয়েণ্টসাহেব আমাকে অত্যন্ত পছন্দ করিয়াছেন— জমিদারটি সেইজন্য ভয়ে আমাকে বিদায় করিতে পারিতেছেন না—যেদিন গেজেটে দেখিব, জয়েণ্ট বদিল হইতেছেন, সেইদিনই বুঝিব, আমার হেডমাস্টারি-সূর্য বিশাইপুরের আকাশ হইতে অস্তমিত হইল। ইতিমধ্যে এখানে আমার একটিমাত্র আলাপী আছে— আমার পাঞ্চকুকুরটি। আর-সকলেই আমার প্রতি যেরূপ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে তাহাকে কোনোমতেই শুভদৃষ্টি বলা চলে না।

যোগেন্দ্রের বাসায় আসিয়া রমেশ একটা চৌকিতে বসিল। যোগেন্দ্র কহিল, "না, বসা নয়। আমি জানি, প্রাতঃস্নান নামে তোমার একটা ঘোরতর কুসংস্কার আছে— সেটা সারিয়া এসো। ইতিমধ্যে আর-একবার গরম জলের কাতলিটা আগুনে চড়াইয়া দিই। আতিথ্যের দোহাই দিয়া আজ দ্বিতীয়বার চা খাইয়া লইব।"

এইরূপে আহার, আলাপ ও বিশ্রামে দিন কাটিয়া গেল। রমেশ যে-বিশেষ কথাটা বলিবার জন্য এখানে আসিয়াছিল, যোগেন্দ্র সমস্ত দিন তাহা কোনোমতেই বলিবার অবকাশ দিল না। সন্ধ্যার পরে আহারান্তে কেরোসিনের আলোকে দুইজনে দুই কেদারা টানিয়া লইয়া

বসিল। অদূরে শৃগাল ডাকিয়া গেল ও বাহিরে অন্ধকার রাত্রি ঝিল্লীর শব্দে স্পন্দিত হইতে লাগিল।

রমেশ কহিল, "যোগেন, তুমি তো জানই, তোমাকে কী কথা বলিতে আমি এখানে আসিয়াছি। একদিন তুমি আমাকে যে-প্রশ্ন করিয়াছিলে, সে-প্রশ্নের উত্তর করিবার সময় তখন উপস্থিত হয় নাই। আজ আর উত্তর দিবার কোনো বাধা নাই।"

এই বলিয়া রমেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার পরে ধীরে ধীরে সে আগাগোড়া সমস্ত ঘটনা বলিয়া গেল। মাঝে মাঝে তাহার স্বর রুদ্ধ হইয়া কণ্ঠ কম্পিত হইল—মাঝে মাঝে কোনো কোনো জায়গায় সে দুই-এক মিনিট চুপ করিয়া রহিল। যোগেন্দ্র কোনো কথা না বলিয়া স্থির হইয়া শুনিল।

যখন বলা হইয়া গেল, তখন যোগেন্দ্র একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "এই সকল কথা যদি সেদিন বলিতে, আমি বিশ্বাস করিতে পারিতাম না।"

রমেশ। বিশ্বাস করার হেতু তখনো যেটুকু ছিল. এখনো তাহাই আছে। সেজন্য তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা যে, আমি যে-গ্রামে বিবাহ করিয়াছিলাম, সে-গ্রামে একবার তোমাকে যাইতে হইবে। তাহার পরে সেখান হইতে কমলার মাতুলালয়েও লইয়া যাইব।

যোগেন্দ্র। আমি কোনোখানে এক পা নড়িব না— আমি এই কেদারাটার উপরে অটল হইয়া বসিয়া তোমার কথার প্রত্যেক অক্ষর বিশ্বাস করিব। তোমার সকল কথাই বিশ্বাস করা আমার চিরকালের অভ্যাস;—জীবনে একবারমাত্র তাহার ব্যত্যয় হইয়াছে, সেজন্য আমি তোমার কাছে মাপ চাই।

এই বলিয়া যোগেন্দ্র চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া রমেশের সম্মুখে আসিল—

রমেশ উঠিয়া দাঁড়াইতেই দুই বাল্যবন্ধু একবার পরস্পর কোলাকুলি করিল। রমেশ রুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লইয়া কহিল, "আমি কোথা হইতে ভাগ্যরচিত এমন একটা দুশ্ছেদ্য মিথ্যার জালে জড়াইয়া পড়িয়াছিলাম যে, তাহার মধ্যেই সম্পূর্ণ ধরা দেওয়া ছাড়া আমি কোনো দিকেই কোনো উপায় দেখিতে পাই নাই। আজ যে আমি তাহা হইতে মুক্ত হইয়াছি, আর যে আমার কাহারো কাছে কিছুই গোপন করিবার নাই, ইহাতে আমি প্রাণ পাইয়াছি। কমলা কী জানিয়া, কী ভাবিয়া আত্মহত্যা করিল, তাহা আমি আজ পর্যন্ত বুঝিতে পারি নাই, আর বুঝিবার কোনো সম্ভাবনাও নাই— কিন্তু ইহা নিশ্চয়, মৃত্যু যদি এমন করিয়া আমাদের দুই জীবনের এই কঠিন গ্রন্থি কাটিয়া না দিত, তবে শেষকালে আমরা দুজনে যে কোন্ দুর্গতির মধ্যে গিয়া দাঁড়াইতাম, তাহা মনে করিলে এখনো আমার হৃৎকম্প হয়। মৃত্যুর গ্রাস হইতে একদিন যে-সমস্যা অকস্মাৎ উঠিয়া আসিয়াছিল, মৃত্যুর গর্ভেই একদিন সেই সমস্যা তেমনি অকস্মাৎ বিলীন হইয়া গেল।"

যোগেন্দ্র। কমলা যে নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করিয়াছে, তাহা অসংশয়ে স্থির করিয়া বসিয়ো না। সে যাই হোক, তোমার এদিকটা তো পরিষ্কার হইয়া গেল, এখন নলিনাক্ষের কথা আমি ভাবিতেছি।

তাহার পরে যোগেন্দ্র নলিনাক্ষকে লইয়া পড়িল। কহিল, "আমি ও-রকম লোকদের ভালো বুঝি না এবং যাহা বুঝি না, তাহা আমি পছন্দও করি না। কিন্তু অনেক লোকের অন্যরকম মতিই দেখি, তাহারা যাহা বোঝে না, তাহাই বেশি পছন্দ করে। তাই হেমের জন্য আমার যথেষ্ট ভয় আছে। যখন দেখিলাম, সে চা ছাড়িয়া দিয়াছে, মাছমাংসও খায় না, এমন কি, ঠাট্টা করিলে পূর্বের মতো তাহার চোখ ছলছল করিয়া আসে না, বরং মৃদুমন্দ হাসে, তখন বুঝিলাম, গতিক ভালো নয়। যাই

হোক, তোমাকে সহায় পাইলে তাহাকে উদ্ধার করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইবে না, তাহাও আমি নিশ্চয় জানি— অতএব প্রস্তুত হও— দুই বন্ধু মিলিয়া সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে হইবে।"

রমেশ হাসিয়া কহিল, "আমি যদিও বীরপুরুষ বলিয়া খ্যাত নই, তবু প্রস্তুত আছি।"

যোগেন্দ্র। রসো, আমার ক্রিস্টমাসের ছুটিটা আসুক।

রমেশ। সে তো দেরি আছে— ততক্ষণ আমি একলা অগ্রসর হই না কেন।

যোগেন্দ্র। না না, সেটি কোনোমতেই হইবে না। তোমাদের বিবাহটি আমিই ভাঙিয়াছিলাম, আমি নিজের হাতে তাহার প্রতিকার করিব। তুমি যে আগেভাগে গিয়া, আমার এই শুভকার্যটি চুরি করিবে, সে আমি ঘটিতে দিব না। ছুটির তো আর দশ দিন বাকি আছে।

রমেশ। তবে ইতিমধ্যে আমি একবার—

যোগেন্দ্র। না না, সে-সব আমি কিছু শুনিতে চাই না— এ-দশদিন তুমি আমার এখানেই আছ। এখানে ঝগড়া করিবার যতগুলা লোক ছিল, সব আমি একটি একটি করিয়া শেষ করিয়াছি— এখন মুখের তার বদলাইবার জন্য একজন বন্ধুর প্রয়োজন হইয়াছে, এ-অবস্থায় তোমাকে ছাড়িবার জো নাই। এতদিন সন্ধ্যাবেলায় কেবলই শেয়ালের ডাক শুনিয়া আসিয়াছি— এখন, এমন কি, তোমার কণ্ঠস্বরও আমার কাছে বীণাবিনিন্দিত বলিয়া মনে হইতেছে, আমার অবস্থা এতই শোচনীয়।

৪৭

চন্দ্রমোহনের কাছে রমেশের খবর পাইয়া অক্ষয়ের মনে অনেকগুলা চিন্তার উদয় হইল। সে ভাবিতে লাগিল, "ব্যাপারখানা কী? রমেশ গাজিপুরে প্র্যাকটিস করিতেছিল— এতদিন নিজেকে যথেষ্ট গোপনেই রাখিয়াছিল— ইতিমধ্যে এমন কী ঘটিল, যাহাতে সে সেখানকার প্র্যাকটিস ছাড়িয়া দিয়া আবার সাহসপূর্বক কলুটোলার গলির মধ্যে আত্ম-প্রকাশ করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছে। অন্নদাবাবুরা যে কাশীতে আছেন কোন্ দিন রমেশ কোথা হইতে সে-খবর পাইবে এবং নিশ্চয়ই সেখানে গিয়া হাজির হইবে।" অক্ষয় স্থির করিল, ইতিমধ্যে গাজিপুরে গিয়া সে সমস্ত সংবাদ জানিবে এবং তাহার পর একবার কাশীতে অন্নদাবাবুর সঙ্গে গিয়া দেখা করিয়া আসিবে।

একদিন অগ্রহায়ণের অপরাহ্নে অক্ষয় তাহার ব্যাগ হাতে করিয়া গাজিপুরে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রথমে বাজারে জিজ্ঞাসা করিল, "রমেশবাবু বলিয়া একটি বাঙালি উকিলের বাসা কোন্ দিকে।" অনেককেই জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, বাজারে রমেশবাবু নামক কোনো ব্যক্তির উকিল বলিয়া কোনো খ্যাতি নাই। তখন সে আদালতে গেল। আদালত তখন ভাঙিয়াছে। শামলা-পরা একটি বাঙালি উকিল গাড়িতে উঠিতে যাইতেছেন, তাঁহাকে অক্ষয় জিজ্ঞাসা করিল, "মশায়, রমেশচন্দ্র চৌধুরি বলিয়া একটি নূতন বাঙালি উকিল গাজিপুরে আসিয়াছেন, তাঁহার বাসা কোথায় জানেন?"

অক্ষয় ইঁহার কাছ হইতে খবর পাইল যে, রমেশ তো এতদিন খুড়ামশায়ের বাড়িতেই ছিল, এখন সে সেখানে আছে, কি কোথাও গেছে, তাহা বলা যায় না। তাহার স্ত্রীকে পাওয়া যাইতেছে না, সম্ভবত তিনি জলে ডুবিয়া মরিয়াছেন।

অক্ষয় খুড়ার বাড়িতে যাত্রা করিল। পথে যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিল, এইবার রমেশের চালটা বুঝা যাইতেছে। স্ত্রী মারা গিয়াছে, এখন সে অসংকোচে হেমনলিনীর কাছে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিবে, তাহার স্ত্রী কোনোকালেই ছিল না। হেমনলিনীর অবস্থা যেরূপ, তাহাতে রমেশের কথা অবিশ্বাস করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইবে। যাহারা ধর্মনীতি লইয়া অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করিয়া বেড়ায়, গোপনে তাহারা যে কী ভয়ানক লোক, অক্ষয় তাহা মনে মনে আলোচনা করিয়া নিজের প্রতি শ্রদ্ধা অনুভব করিতে লাগিল।

খুড়ার কাছে গিয়া তাঁহাকে রমেশের ও কমলার কথা জিজ্ঞাসা করিবামাত্র তিনি শোক সংবরণ করিতে পারিলেন না— তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। তিনি কহিলেন, "আপনি যখন রমেশবাবুর বিশেষ বন্ধু, তখন আমার মা কমলাকে নিশ্চয় আপনি আত্মীয়ের মতোই জানেন; কিন্তু আমি এ-কথা বলিতেছি কয়েকদিনমাত্র তাঁহাকে দেখিয়া আমি আমার নিজের কন্যার সহিত তাঁহার প্রভেদ ভুলিয়া গেছি। দুদিনের জন্য মায়া বাড়াইয়া মা-লক্ষ্মী যে আমাকে এমন বজ্রাঘাত করিয়া ত্যাগ করিয়া যাইবেন, এ কি আমি জানিতাম।"

অক্ষয় মুখ ম্লান করিয়া কহিল, "এমন ঘটনাটা যে কী করিয়া ঘটিল, আমি তো কিছুই বুঝিতে পারি না। নিশ্চয়ই রমেশ কমলার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে নাই।"

খুড়া। আপনি রাগ করিবেন না,— আপনাদের রমেশটিকে আমি আজ পর্যন্ত চিনিতে পারিলাম না। এদিকে বাহিরে তো দিব্য লোকটি, কিন্তু মনের মধ্যে কী ভাবেন, কী করেন, বুঝিবার জো নাই। নহিলে কমলার মতো অমন স্ত্রীকে কী মনে করিয়া যে অনাদর করিতেন, তাহা ভাবিয়া পাওয়া যায় না। কমলা এমন সতী-লক্ষ্মী, আমার মেয়ের সঙ্গে

তার আপন বোনের মতো ভাব হইয়াছিল— তবু কখনো একদিনের জন্যও নিজের স্বামীর বিরুদ্ধে একটি কথাও কহে নাই। আমার মেয়ে মাঝে মাঝে বুঝিতে পারিত যে, সে মনের মধ্যে খুবই কষ্ট পাইতেছে, কিন্তু শেষদিন পর্যন্ত একটি কথা বলাইতে পারে নাই। এমন স্ত্রী যে কী অসহ্য কষ্ট পাইলে এমন কাজ করিতে পারে, তাহা তো আপনি বুঝিতেই পারেন, সে-কথা মনে করিলেও বুক ফাটিয়া যায়। আবার আমার এমনি কপাল, আমি তখন এলাহাবাদে চলিয়া গিয়াছিলাম, নহিলে কি মা কখনো আমাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিতেন।

পরদিন প্রাতে খুড়াকে লইয়া অক্ষয় রমেশের বাংলা ও গঙ্গার তীর ঘুরিয়া আসিল। ঘরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "দেখুন মশায়, কমলা যে গঙ্গায় ডুবিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে, এ-সম্বন্ধে আপনি যতটা নিঃসংশয় হইয়াছেন, আমি ততটা হইতে পারি নাই।"

খুড়া। আপনি কিরূপ মনে করেন?

অক্ষয়। আমার মনে হয়, তিনি গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া গেছেন— তাঁহাকে ভালোরূপ খোঁজ করা উচিত।

খুড়া হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া কহিলেন, "আপনি ঠিক বলিয়াছেন, কথাটা নিতান্তই অসম্ভব নহে।"

অক্ষয়। নিকটেই কাশীতীর্থ। সেখানে আমাদের একটি পরম বন্ধু আছেন— এমনও হইতে পারে, কমলা তাঁহাদের কাছে গিয়া আশ্রয় লইয়াছে।

খুড়া আশান্বিত হইয়া কহিলেন, "কই, তাঁহাদের কথা তো রমেশবাবু আমাদের কখনো বলেন নাই। যদি জানিতাম, তবে কি খোঁজ করিতে বাকি রাখিতাম।"

অক্ষয়। তবে একবার চলুন না, আমরা দুজনেই কাশী যাই—

পশ্চিম-অঞ্চল আপনার সমস্তই জানাশোনা আছে, আপনি ভালো করিয়া খোঁজ করিতে পারিবেন।

খুড়া এ-প্রস্তাবে উৎসাহের সহিত সম্মত হইলেন। অক্ষয় জানিত, তাহার কথা হেমনলিনী সহজে বিশ্বাস করিবে না, এইজন্য প্রামাণিক-সাক্ষীর স্বরূপে খুড়াকে সঙ্গে করিয়া কাশীতে গেল।

৪৮

শহরের বাহিরে ক্যান্টনমেন্টের অধিকারের মধ্যে ফাঁকা জায়গায় অন্নদাবাবুরা একটি বাংলা ভাড়া করিয়া বাস করিতেছেন।

অন্নদাবাবুরা কাশীতে পৌঁছিয়াই খবর পাইলেন, নলিনাক্ষের মাতা ক্ষেমংকরীর সামান্য জ্বরকাশি ক্রমে ন্যুমোনিয়াতে দাঁড়াইয়াছে। জ্বরের উপরেও এই শীতে তিনি নিয়মিত প্রাতঃস্নান বন্ধ করেন নাই বলিয়া তাঁহার অবস্থা এরূপ সংকটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

কয়েকদিন অশ্রান্তযত্নে হেম তাঁহার সেবা করার পর ক্ষেমংকরীর সংকটের অবস্থা কাটিয়া গেল। কিন্তু তখনো তাঁহার অতিশয় দুর্বল অবস্থা। শুচিতা লইয়া অত্যন্ত বিচার করাতে পথ্যজল প্রভৃতি সম্বন্ধে হেমনলিনীর সাহায্য তাঁহার কোনো কাজে লাগিল না। ইতিপূর্বে তিনি স্বপাক আহার করিতেন, এখন নলিনাক্ষ স্বয়ং তাঁহার পথ্য প্রস্তুত করিয়া দিতে লাগিল এবং আহারসম্বন্ধে মাতার সমস্ত সেবা নলিনাক্ষকে স্বহস্তে করিতে হইত। ইহাতে ক্ষেমংকরী সর্বদা আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি তো গেলেই হত, কেবল তোদের কষ্ট দিবার জন্যই আবার বিশ্বেশ্বর আমাকে বাঁচাইলেন।"

ক্ষেমংকরী নিজের সম্বন্ধে কঠোরতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু

তাঁহার চারিদিকে পারিপাট্য ও সৌন্দর্যবিন্যাসের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত দৃষ্টি ছিল। হেমনলিনী সে-কথা নলিনাক্ষের কাছ হইতে শুনিয়াছিল। এইজন্য সে বিশেষ যত্নে চারিদিক পরিপাটি করিয়া এবং ঘরদুয়ার সাজাইয়া রাখিত এবং নিজেও যত্ন করিয়া সাজিয়া ক্ষেমংকরীর কাছে আসিত। অন্নদা ক্যাণ্টনমেণ্টে যে বাগান ভাড়া করিয়াছিলেন, সেখান হইতে প্রত্যহ ফুল তুলিয়া আনিয়া দিতেন, হেমনলিনী ক্ষেমংকরীর রোগশয্যার কাছে সেই ফুলগুলি নানারকম করিয়া সাজাইয়া রাখিত।

নলিনাক্ষ মাতার সেবার জন্য দাসী রাখিতে অনেকবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের হস্ত হইতে সেবাগ্রহণ করিতে কোনোমতেই তাঁহার অভিরুচি হইত না। অবশ্য, জলতোলা প্রভৃতির জন্য চাকর-চাকরানী ছিল বটে, কিন্তু তাঁহার একান্ত নিজের কাজগুলিতে বেতনভুক কোনো চাকরের হস্তক্ষেপ তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। যে হরির মা ছেলেবেলায় তাঁহাকে মানুষ করিয়াছিল, সে মারা গিয়া অবধি অতিবড়ো রোগের সময়েও কোনো দাসীকে তিনি পাখা করিতে বা গায়ে হাত বুলাইতে দেন নাই।

সুন্দর ছেলে, সুন্দর মুখ তিনি বড়ো ভালোবাসিতেন। দশাশ্বমেধ-ঘাটে প্রাতঃস্নান সারিয়া পথে প্রত্যেক শিবলিঙ্গে ফুল ও গঙ্গাজল দিয়া বাড়ি ফিরিবার সময় এক-একদিন কোথা হইতে হয়তো একটি সুন্দর খোট্টার ছেলেকে অথবা কোনো ফুটফুটে হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণকন্যাকে বাড়িতে আনিয়া উপস্থিত করিতেন। পাড়ার দুটি-একটি সুন্দর ছেলেকে তিনি খেলনা দিয়া, পয়সা দিয়া, খাবার দিয়া বশ করিয়াছিলেন; তাহারা যখন-তখন তাঁহার বাড়ির যেখানে-সেখানে উপদ্রব করিয়া খেলিয়া বেড়াইত; ইহাতে তিনি বড়ো আনন্দ পাইতেন। তাঁহার আর একটি বাতিক ছিল; ছোটোখাটো কোনো একটি সুন্দর জিনিস দেখিলেই তিনি না

কিনিয়া থাকিতে পারিতেন না। এ-সমস্ত তাঁহার নিজের কোনো কাজেই লাগিত না ;— কিন্তু কোন্ জিনিসটি কে পাইলে খুশি হইবে, তাহা মনে করিয়া উপহার পাঠাইতে তাঁহার বিশেষ আনন্দ ছিল। অনেক সময় তাঁহার দূর আত্মীয়-পরিচিতারাও এইরূপ একটা কোনো জিনিস ডাকযোগে পাইয়া আশ্চর্য হইয়া যাইত। তাহার একটি বড়ো আবলুস কাঠের কালো সিন্দুকের মধ্যে এইরূপ অনাবশ্যক সুন্দর শৌখিন জিনিস-পত্র, রেশমের কাপড়চোপড় অনেক সঞ্চিত ছিল। তিনি মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন, নলিনের বউ যখন আসিবে, তখন এগুলি সমস্ত তাহারই হইবে। নলিনের একটি পরমাসুন্দরী বালিকাবধূ তিনি মনে মনে কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিলেন— সে তাঁহার ঘর উজ্জ্বল করিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে— তাহাকে তিনি সাজাইতেছেন পরাইতেছেন, এই সুখ-চিন্তায় তাঁহার অনেক দিনের অনেক অবসর কাটিয়াছে।

তিনি নিজে তপস্বিনীর মতো ছিলেন,— স্নানাহ্নিকপূজায় প্রায় দিন কাটিয়া গেলে একবেলা ফলদুধমিষ্ট খাইয়া থাকিতেন, কিন্তু নিয়মসংযমে নলিনাক্ষের এতটা নিষ্ঠা তাঁহার ঠিক মনের মধ্যে ভালো লাগিত না। তিনি বলিতেন, "পুরুষমানুষের আবার অত আচারবিচারের বাড়াবাড়ি কেন।" পুরুষমানুষদিগকে তিনি বৃহৎবালকদের মতো মনে করিতেন— খাওয়াদাওয়া চালচলনে উহাদের পরিমাণবোধ বা কর্তব্যবোধ না থাকিলে সেটা যেন তিনি সস্নেহ প্রশ্রয়বুদ্ধির সহিত সংগত মনে করিতেন— ক্ষমার সহিত বলিতেন, "পুরুষমানুষ কঠোরতা করিতে পারিবে কেন।" অবশ্য, ধর্ম সকলকেই রক্ষা করিতে হইবে, কিন্তু আচার পুরুষমানুষের জন্য নহে, ইহাই তিনি মনে মনে ঠিক করিয়াছিলেন। নলিনাক্ষ যদি অন্যান্য সাধারণ পুরুষের মতো কিঞ্চিৎ পরিমাণে অবিবেচক ও স্বেচ্ছাচারী হইত, সতর্কতার মধ্যে কেবলমাত্র তাঁহার পূজার ঘরে প্রবেশ

এবং অসময়ে তাঁহাকে স্পর্শকরাটুকু বাঁচাইয়া চলিত, তাহা হইলে তিনি খুশিই হইতেন।

ব্যামো হইতে যখন সারিয়া উঠিলেন, ক্ষেমংকরী দেখিলেন, হেমনলিনী নলিনাক্ষের উপদেশ অনুসারে নানাপ্রকার নিয়মপালনে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এমন কি, বৃদ্ধ অন্নদাবাবুও নলিনাক্ষের সকল কথা প্রবীণ গুরুবাক্যের মতো বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত অবধান করিয়া শুনিতেছেন।

ইহাতে ক্ষেমংকরীর অত্যন্ত কৌতুক বোধ হইল। তিনি একদিন হেমনলিনীকে ডাকিয়া হাসিয়া কহিলেন, "মা, তোমরা দেখিতেছি, নলিনকে আরও খ্যাপাইয়া তুলিবে। ওর ও-সমস্ত পাগলামির কথা তোমরা শোন কেন। তোমরা সাজগোজ করিয়া হাসিয়া-খেলিয়া আমোদ-আহ্লাদে বেড়াইবে,— তোমাদের কি এখন সাধন করিবার বয়স। যদি বল তুমি কেন বরাবর এই সব লইয়া আছ? তার একটু কথা আছে। আমার বাপ-মা বড়ো নিষ্ঠাবান ছিলেন। ছেলেবেলা হইতে আমরা ভাইবোনেরা এই সকল শিক্ষার মধ্যেই মানুষ হইয়া উঠিয়াছি। এ যদি আমরা ছাড়ি তো আমাদের দ্বিতীয় কোনো আশ্রয় থাকে না। কিন্তু তোমরা তো সে-রকম নও— তোমাদের শিক্ষাদীক্ষা তো সমস্তই আমি জানি। তোমরা এ যা-কিছু করিতেছ, এ কেবল জোর করিয়া করিতেছ— তাহাতে লাভ কী মা। যে যাহা পাইয়াছে, সে তাহাই ভালো করিয়া রক্ষা করিয়া চলুক, আমি তো এই বলি। না না, ও-সব কিছু নয়—ও-সমস্ত ছাড়ো। তোমাদের আবার নিরামিষ খাওয়া কী, যোগতপই বা কিসের! আর নলিনই বা এতবড়ো গুরু হইয়া উঠিল কবে। ও এ-সকলের কী জানে। ও তো সেদিন পর্যন্ত যা-খুশি-তাই করিয়া বেড়াইয়াছে, শাস্ত্রের কথা শুনিলে একেবারে

মারমূর্তি ধরিত। আমাকে খুশি করিবার জন্ম এই সমস্ত আরম্ভ করিল, শেষকালে দেখিতেছি, কোন্ দিন পুরা সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইবে। আমি ওকে বার বার করিয়া বলি, 'ছেলেবেলা হইতে তোর যা বিশ্বাস ছিল, তুই তাই লইয়াই থাক্,—সে তো মন্দ কিছু নয়, আমি তাহাতে সন্তুষ্ট বই অসন্তুষ্ট হইব না।' শুনিয়া নলিন হাসে— ওই ওর একটি স্বভাব—সকল কথাই চুপ করিয়া শুনিয়া যায়— গাল দিলেও উত্তর করে না।"

অপরাহ্ণে পাঁচটার পর হেমনলিনীর চুল বাঁধিয়া দিতে দিতে এই সমস্ত আলোচনা চলিত। হেমের খোঁপা-বাঁধা ক্ষেমংকরীর পছন্দ হইত না। তিনি বলিতেন, "তুমি বুঝি মনে কর মা, আমি নিতান্তই সেকেলে, এখনকার কালের ফ্যাশান কিছুই জানি না। কিন্তু আমি যতরকম চুলবাঁধা জানি, এত তোমরাও জান না বাছা। একটি বেশ ভালো মেম পাইয়াছিলাম, সে আমাকে সেলাই শেখাইতে আসিত, সেই সঙ্গে কতরকম চুলবাঁধাও শিখিয়াছিলাম। সে চলিয়া গেলে আবার আমাকে স্নান করিয়া কাপড় ছাড়িতে হইত। কী করিব মা, সংস্কার, উহার ভালোমন্দ জানি না—না করিয়া থাকিতে পারি না। তোমাদের লইয়াও যে এতটা ছুঁই-ছুঁই করি, কিছু মনে করিয়ো না মা। ওটা মনের ঘৃণা নয়, ও কেবল একটা অভ্যাস। নলিনদের বাড়িতে যখন অন্যরূপ মত হইল, হিন্দুয়ানি ঘুচিয়া গেল, তখন তো আমি অনেক সহ্য করিয়াছি, কোনো কথাই বলি নাই—আমি কেবল এই কথাই বলিয়াছি যে, যাহা ভালো বোঝ করো— আমি মেয়েমানুষ, এতকাল যাহা করিয়া আসিলাম, তাহা ছাড়িতে পারিব না।" বলিতে বলিতে ক্ষেমংকরী চোখের এক ফোঁটা জল তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়া মুছিয়া ফেলিলেন।

এমনি করিয়া, হেমনলিনীর খোঁপা খুলিয়া ফেলিয়া তাহার সুদীর্ঘ কেশগুচ্ছ লইয়া প্রত্যহ নূতন-নূতন রকম বিনানি করিতে ক্ষেমংকরীর ভারি ভালো লাগিত। এমনও হইয়াছে, তিনি তাঁহার সেই আবলুস কাঠের সিন্দুক হইতে নিজের পছন্দসই রঙের কাপড় বাহির করিয়া তাহাকে পরাইয়া দিয়াছেন। মনের মতো করিয়া সাজাইতে তাঁহার বড়ো আনন্দ। প্রায়ই প্রতিদিন হেমনলিনী তাহার সেলাই আনিয়া ক্ষেমংকরীর কাছে দেখাইয়া লইয়া যাইত— ক্ষেমংকরী তাহাকে নূতন-নূতন-রকমের সেলাই সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। এ-সমস্তই তাঁহার সন্ধ্যার সময়কার কাজ ছিল। বাংলা মাসিকপত্র এবং গল্পের বই পড়িতেও উৎসাহ অল্প ছিল না। হেমনলিনীর কাছে যাহা-কিছু বই এবং কাগজ ছিল, সমস্তই সে ক্ষেমংকরীর কাছে আনিয়া দিয়াছিল। কোনো কোনো প্রবন্ধ ও বই সম্বন্ধে ক্ষেমংকরীর আলোচনা শুনিয়া হেম আশ্চর্য হইয়া যাইত—ইংরেজি না শিখিয়া যে এমন বুদ্ধিবিচারের সহিত চিন্তা করা যায়, হেমের তাহা ধারণাই ছিল না। নলিনাক্ষের মাতার কথাবার্তা এবং সংস্কার-আচরণ সমস্তটা লইয়া হেমনলিনীর তাঁহাকে বড়োই আশ্চর্য স্ত্রীলোক বলিয়া বোধ হইল। সে যাহা মনে করিয়া আসিয়াছিল, তাহার কিছুই নয়, সমস্তই অপ্রত্যাশিত।

৪৯

ক্ষেমংকরী পুনর্বার জ্বরে পড়িলেন। এবারকার জ্বর অল্পের উপর দিয়া কাটিয়া গেল। সকালবেলায় নলিনাক্ষ প্রণাম করিয়া তাঁহার পায়ের ধুলা লইবার সময় বলিল, "মা, তোমাকে কিছুকাল রোগীর নিয়মে থাকিতে হইবে। দুর্বল শরীরের উপর কঠোরতা সহ্য হয় না।"

ক্ষেমংকরী কহিলেন, "আমি রোগীর নিয়মে থাকিব, আর তুমিই যোগীর নিয়মে থাকিবে। নলিন, তোমার ও-সমস্ত আর বেশিদিন চলিবে না। আমি আদেশ করিতেছি, তোমাকে এবার বিবাহ করিতেই হইবে।"

নলিনাক্ষ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ক্ষেমংকরী কহিলেন, "দেখো বাছা, আমার এ শরীর আর গড়িবে না— এখন তোমাকে আমি সংসারী দেখিয়া যাইতে পারিলে মনের সুখে মরিতে পারিব। আগে মনে করিতাম, একটি ছোটো ফুটফুটে বউ আমার ঘরে আসিবে, আমি তাহাকে নিজের হাতে শিখাইয়া-পড়াইয়া মানুষ করিয়া তুলিব, তাহাকে সাজাইয়া-গুজাইয়া মনের সুখে থাকিব। কিন্তু এবার ব্যামোর সময় ভগবান আমাকে চৈতন্য দিয়াছেন। নিজের আয়ুর উপরে এতটা বিশ্বাস রাখা চলে না, আমি কবে আছি, কবে নাই, তার ঠিকানা কী। একটি ছোটো মেয়েকে তোমার ঘাড়ের উপর ফেলিয়া গেলে সে আরও বেশি মুশকিল হইবে। তার চেয়ে তোমাদের নিজেদের মতে বড়ো-বয়সের মেয়েই বিবাহ করো। জ্বরের সময় এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে আমার রাত্রে ঘুম হইত না। আমি বেশ বুঝিয়াছি, এই আমার শেষ কাজ বাকি আছে— এইটি সম্পন্ন করিবার অপেক্ষাতেই আমাকে বাঁচিতে হইবে, নহিলে আমি শান্তি পাইব না।"

নলিনাক্ষ। আমাদের সঙ্গে মিশ খাইবে এমন পাত্রী পাইব কোথায়?

ক্ষেমংকরী কহিলেন, "আচ্ছা, সে আমি ঠিক করিয়া তোমাকে বলিব এখন, সেজন্য তোমাকে ভাবিতে হইবে না।"

আজ পর্যন্ত ক্ষেমংকরী অন্নদাবাবুর সম্মুখে বাহির হন নাই। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে প্রাত্যহিক নিয়মানুসারে বেড়াইতে বেড়াইতে অন্নদাবাবু যখন নলিনাক্ষের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন ক্ষেমংকরী

অন্নদাবাবুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহাকে কহিলেন, "আপনার মেয়েটি বড়ো লক্ষ্মী— তাহার 'পরে আমার বড়োই স্নেহ পড়িয়াছে। আমার নলিনকে তো আপনারা জানেন, সে-ছেলের কোনো দোষ কেহ দিতে পারিবে না— ডাক্তারিতেও তাহার বেশ নাম আছে। আপনার মেয়ের জন্য এমনতরো সম্বন্ধ কি শীঘ্র খুঁজিয়া পাইবেন।"

অন্নদাবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "বলেন কী। এমনতরো কথা আশা করিতেও আমার সাহস হয় নাই। নলিনাক্ষের সঙ্গে আমার মেয়ের যদি বিবাহ হয়, তবে তার অপেক্ষা সৌভাগ্য আমার কী হইতে পারে। কিন্তু তিনি কি—"

ক্ষেমংকরী কহিলেন, "নলিন আপত্তি করিবে না। সে এখনকার ছেলেদের মতো নয়, সে আমার কথা মানে। আর, এর মধ্যে পীড়াপীড়ির কথাই বা কী আছে। আপনার মেয়েটিকে পছন্দ না করিবে কে। কিন্তু এই কাজটি আমি অতি শীঘ্রই সারিতে চাই। আমার শরীরের গতিক আমি ভালো বুঝিতেছি না।"

সে-রাত্রে অন্নদাবাবু উৎফুল্ল হইয়া বাড়িতে গেলেন। সেই রাত্রেই তিনি হেমনলিনীকে ডাকিয়া কহিলেন, "মা, আমার বয়স যথেষ্ট হইয়াছে, আমার শরীরও ইদানীং ভালো চলিতেছে না। তোমার একটা স্থিতি না করিয়া যাইতে পারিলে আমার মনে সুখ নাই। হেম, আমার কাছে লজ্জা করিলে চলিবে না; তোমার মা নাই, এখন তোমার সমস্ত ভার আমারই উপরে।"

হেমনলিনী উৎকণ্ঠিত হইয়া তাহার পিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

অন্নদাবাবু কহিলেন, "মা, তোমার জন্য এমন একটি সম্বন্ধ আসিয়াছে যে, মনের আনন্দ আমি আর রাখিতে পারিতেছি না।

আমার কেবলই ভয় হইতেছে, পাছে কোনো বিঘ্ন ঘটে। আজ নলিনাক্ষের মা নিজে আমাকে ডাকিয়া তাঁহার পুত্রের সঙ্গে তোমার বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছেন।"

হেমনলিনী মুখ লাল করিয়া অত্যন্ত সংকুচিত হইয়া কহিল, "বাবা, তুমি কী বল! না না, এ কখনো হইতেই পারে না।"

নলিনাক্ষকে যে কখনো বিবাহ করা যাইতে পারে, এ-সম্ভাবনার সন্দেহমাত্র হেমনলিনীর মাথায় আসে নাই— হঠাৎ পিতার মুখে এই প্রস্তাব শুনিয়া তাহাকে লজ্জায়-সংকোচে অস্থির করিয়া তুলিল।

অন্নদাবাবু প্রশ্ন করিলেন, "কেন হইতে পারে না।"

হেমনলিনী কহিল, "নলিনাক্ষবাবু! এও কি কখনো হয়।" এরূপ উত্তরকে ঠিক যুক্তি বলা চলে না— কিন্তু যুক্তির অপেক্ষা ইহা অনেকগুণে প্রবল।

হেম আর থাকিতে পারিল না— সে বারান্দায় চলিয়া গেল।

অন্নদাবাবু অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। তিনি এরূপ বাধার কথা কল্পনাও করেন নাই। বরঞ্চ তাঁহার ধারণা ছিল, নলিনাক্ষের সহিত বিবাহের প্রস্তাবে হেম মনে মনে খুশিই হইবে। হতবুদ্ধি বৃদ্ধ বিষণ্ণমুখে কেরোসিনের আলোর দিকে চাহিয়া স্ত্রীপ্রকৃতির অচিন্তনীয় রহস্য ও হেমনলিনীর জননীর অভাব মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

হেম অনেকক্ষণ বারান্দার অন্ধকারে বসিয়া রহিল। তাহার পরে ঘরের দিকে চাহিয়া তাহার পিতার নিতান্ত হতাশ মুখের ভাব চোখে পড়িতেই তাহার মনে বাজিল। তাড়াতাড়ি তাহার পিতার চৌকির পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তাঁহার মাথায় অঙ্গুলিসঞ্চালন করিতে করিতে কহিল, "বাবা চলো, অনেকক্ষণ খাবার দিয়াছে, খাবার ঠাণ্ডা হইয়া গেল।"

অন্নদাবাবু যন্ত্রচালিতবৎ উঠিয়া খাবারের জায়গায় গেলেন, কিন্তু

ভালো করিয়া খাইতেই পারিলেন না। হেমনলিনী সম্বন্ধে সমস্ত দুর্যোগ কাটিয়া গেল মনে করিয়া তিনি বড়োই আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু হেমনলিনীর দিক হইতেই যে এতবড়ো ব্যাঘাত আসিল, ইহাতে তিনি অত্যন্ত দমিয়া গেছেন। আবার তিনি ব্যাকুল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে ভাবিলেন, "হেম তবে এখনো রমেশকে ভুলিতে পারে নাই।"

অন্যদিন আহারের পরেই অন্নদাবাবু শুইতে যাইতেন, আজ বারান্দায় ক্যামবিসের কেদারার উপরে বসিয়া বাড়ির বাগানের সম্মুখবর্তী ক্যাণ্টনমেণ্টের নির্জন রাস্তার দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন। হেমনলিনী আসিয়া স্নিগ্ধস্বরে কহিল, "বাবা, এখানে বড়ো ঠাণ্ডা, শুইতে চলো।"

অন্নদা কহিলেন, "তুমি শুইতে যাও, আমি একটু পরে যাইতেছি।" হেমনলিনী চুপ করিয়া তাঁহার পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। আবার খানিক বাদেই কহিল, "বাবা, তোমার ঠাণ্ডা লাগিতেছে, না হয় বসিবার ঘরেই চলো।"

তখন অন্নদাবাবু চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া কিছু না বলিয়া শুইতে গেলেন।

পাছে তাহার কর্তব্যের ক্ষতি হয় বলিয়া হেমনলিনী রমেশের কথা মনে মনে আন্দোলন করিয়া নিজেকে পীড়িত হইতে দেয় না। এজন্য এ-পর্যন্ত সে নিজের সঙ্গে অনেক লড়াই করিয়া আসিতেছে। কিন্তু বাহির হইতে যখন টান পড়ে, তখন ক্ষতস্থানের সমস্ত বেদনা জাগিয়া উঠে। হেমনলিনীর ভবিষ্যৎ জীবনটা যে কী ভাবে চলিবে, তাহা এ-পর্যন্ত সে পরিষ্কার কিছুই ভাবিয়া পাইতেছিল না— এই কারণেই একটা সুদৃঢ় কোনো অবলম্বন খুঁজিয়া অবশেষে নলিনাক্ষকে গুরু মানিয়া তাহার উপদেশ অনুসারে চলিতে প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু যখনি

বিবাহের প্রস্তাবে তাহাকে তাহার হৃদয়ের গভীরতম দেশের আশ্রয়সূত্র হইতে টানিয়া আনিতে চাহে, তখনি সে বুঝিতে পারে, সে-বন্ধন কী কঠিন। তাহাকে কেহ ছিন্ন করিতে আসিলেই হেমনলিনীর সমস্ত মন ব্যাকুল হইয়া সেই বন্ধনকে দ্বিগুণবলে আঁকড়িয়া ধরিতে চেষ্টা করে।

৫০

এদিকে ক্ষেমংকরী নলিনাক্ষকে ডাকিয়া কহিলেন, "আমি তোমার পাত্রী ঠিক করিয়াছি।"

নলিনাক্ষ একটু হাসিয়া কহিল, "একেবারে ঠিক করিয়া ফেলিয়াছ?"

ক্ষেমংকরী। তা নয় তো কী। আমি কি চিরকাল বাঁচিয়া থাকিব। তা শোনো, আমি হেমনলিনীকেই পছন্দ করিয়াছি— অমন মেয়ে আর পাইব না। রংটা তেমন ফরসা নয় বটে, কিন্তু—

নলিনাক্ষ। দোহাই মা, আমি রং ফরসার কথা ভাবিতেছি না। কিন্তু হেমনলিনীর সঙ্গে কেমন করিয়া হইবে। সে কি কখনো হয়।

ক্ষেমংকরী। ও আবার কী কথা। না হইবার তো কোনো কারণ দেখি না।

নলিনাক্ষের পক্ষে ইহার জবাব দেওয়া বড়ো মুশকিল। কিন্তু হেমনলিনী— এতদিন যাহাকে কাছে লইয়া অসংকোচে গুরুর মতো উপদেশ দিয়া আসিয়াছে— হঠাৎ তাহার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাবে নলিনাক্ষকে যেন লজ্জা আঘাত করিল।

নলিনাক্ষকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া ক্ষেমংকরী কহিলেন, "এবারে আমি তোমার কোনো আপত্তি শুনিব না। আমার জন্য তুমি যে এইবয়সে সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া কাশীবাসী হইয়া তপস্যা করিতে

থাকিবে, সে আমি আর কিছুতেই সহ্য করিব না। এইবারে যে-দিন শুভদিন আসিবে, সে-দিন ফাঁক যাইবে না, এ আমি বলিয়া রাখিতেছি।"

নলিনাক্ষ কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া কহিল, "তবে একটা কথা তোমাকে বলি মা।— কিন্তু আগে হইতে বলিয়া রাখিতেছি, তুমি অস্থির হইয়া পড়িয়ো না। যে-ঘটনার কথা বলিতেছি, সে আজ নয়-দশ মাস হইয়া গেল, এখন তাহা লইয়া উতলা হইবার কোনো প্রয়োজন নাই। কিন্তু তোমার যে-রকম স্বভাব মা, একটা অমঙ্গল কাটিয়া গেলেও তাহার ভয় তোমাকে কিছুতেই ছাড়িতে চায় না। এইজন্যই কতদিন তোমাকে বলিব-বলিব করিয়াও বলিতে পারি নাই। আমার গ্রহ-শান্তির জন্য যত খুশি স্বস্ত্যয়ন করাইতে চাও করাইয়ো, কিন্তু অনাবশ্যক মনকে পীড়িত করিয়ো না।"

ক্ষেমংকরী উদ্‌বিগ্ন হইয়া কহিলেন, "কী জানি বাছা, কী বলিবে, কিন্তু তোমার ভূমিকা শুনিয়া আমার মন আরও অস্থির হয়। যতদিন পৃথিবীতে আছি, নিজেকে অত করিয়া ঢাকিয়া রাখা চলে না। আমি তো দূরে থাকিতে চাই, কিন্তু মন্দকে তো খুঁজিয়া বাহির করিতে হয় না; সে আপনিই ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়ে। তা ভালো হোক মন্দ হোক, বলো তোমার কথাটা শুনি।"

নলিনাক্ষ কহিল, "এই মাঘ মাসে আমি রংপুরে আমার সমস্ত জিনিসপত্র বিক্রি করিয়া আমার বাগানবাড়িটা ভাড়ার বন্দোবস্ত করিয়া ফিরিয়া আসিতেছিলাম। সাঁড়ায় আসিয়া আমার কী বাতিক গেল, মনে করিলাম রেলে না চড়িয়া নৌকা করিয়া কলিকাতা পর্যন্ত আসিব। সাঁড়ায় একখানা বড়ো দেশী নৌকা ভাড়া করিয়া যাত্রা করিলাম। দু-দিনের পথ আসিয়া একটা চরের কাছে নৌকা বাঁধিয়া স্নান করিতেছি, এমন সময় হঠাৎ দেখি, আমাদের ভূপেন এক বন্দুক হাতে করিয়া

উপস্থিত। আমাকে দেখিয়াই তো সে লাফাইয়া উঠিল, কহিল, 'শিকার খুঁজিতে আসিয়া খুব বড়ো শিকারটাই মিলিয়াছে।' সে ওই দিকেই কোথায় ডেপুটিম্যাজিস্ট্রেটি করিতেছিল—তাঁবুতে মফস্বল ভ্রমণে বাহির হইয়াছে। অনেকদিন পরে দেখা, আমাকে তো কোনোমতেই ছাড়িবে না, সঙ্গে সঙ্গে ঘুরাইয়া বেড়াইতে লাগিল। ধোপাপুকুর বলিয়া একটা জায়গায় একদিন তাহার তাঁবু পড়িল। বৈকালে আমরা গ্রামে বেড়াইতে বাহির হইয়াছি— নিতান্তই গণ্ডগ্রাম— একটি বৃহৎ খেতের ধারে একটা প্রাচীর-দেওয়া চালাঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম। ঘরের কর্তা উঠানে আমাদের বসিবার জন্য দুটি মোড়া আনিয়া দিলেন। তখন দাওয়ার উপরে ইস্কুল চলিতেছে। প্রাইমারি ইস্কুলের পণ্ডিত একটা কাঠের চৌকিতে বসিয়া ঘরের একটা খুঁটির গায়ে দুই পা তুলিয়া দিয়াছে। নিচে মাটিতে বসিয়া স্লেট-হাতে ছেলেরা মহা কোলাহল করিতে করিতে বিদ্যালাভ করিতেছে। বাড়ির কর্তাটির নাম তারিণী চাটুজ্জে। ভূপেনের কাছে তিনি তন্ন তন্ন করিয়া আমার পরিচয় লইলেন। তাঁবুতে ফিরিয়া আসিতে আসিতে ভূপেন বলিল, 'ওহে, তোমার কপাল ভালো— তোমার একটা বিবাহের সম্বন্ধ আসিতেছে।' আমি বলিলাম, 'সে কী-রকম?' ভূপেন কহিল, 'ওই তারিণী চাটুজ্জে লোকটি মহাজনী করে, এতবড়ো কৃপণ জগতে নাই। ওই যে ইস্কুলটি বাড়িতে স্থান দিয়াছে, সেজন্য নূতন ম্যাজিস্ট্রেট আসিলেই নিজের লোকহিতৈষিতা লইয়া বিশেষ আড়ম্বর করে। কিন্তু ইস্কুলের পণ্ডিতটাকে কেবলমাত্র বাড়িতে খাইতে দিয়া রাত দশটা পর্যন্ত সুদের হিসাব কষাইয়া লয়, মাইনেটা গবর্মেণ্টের সাহায্য এবং ইস্কুলের বেতন হইতে উঠিয়া যায়। উহার একটি বোনের স্বামিবিয়োগ হইলে পর সে-বেচারা কোথাও আশ্রয় না পাইয়া ইহারই কাছে আসে। সে তখন

গর্ভিণী ছিল। এখানে আসিয়া একটি কন্যা প্রসব করিয়া নিতান্ত অচিকিৎসাতেই সে মারা যায়। আর-একটি বিধবা বোন ঘরকন্নার সমস্ত কাজ করিয়া ঝি রাখিবার খরচ বাঁচাইত, সে এই মেয়েটিকে মায়ের মতো মানুষ করে। মেয়েটি কিছু বড়ো হইতেই তাহারও মৃত্যু হইল। সেই অবধি মামা ও মামীর দাসত্ব করিয়া অহরহ ভর্ৎসনা সহিয়া মেয়েটি বাড়িয়া উঠিতেছে। বিবাহের বয়স যথেষ্ট হইয়াছে, কিন্তু এমন অনাথার পাত্র জুটিবে কোথায়? বিশেষত উহার মা-বাপকে এখানকার কেহ জানিত না, পিতৃহীন অবস্থায় উহার জন্ম, ইহা লইয়া পাড়ার ঘোঁটকর্তারা যথেষ্ট সংশয়প্রকাশ করিয়া থাকেন। তারিণী চাটুজ্জের অগাধ টাকা আছে সকলেই জানে, লোকের ইচ্ছা এই মেয়ের বিবাহ উপলক্ষ্যে কন্যাসম্বন্ধে খোঁটা দিয়া উহাকে বেশ একটু দোহন করিয়া লয়। ও তো আজ চার বছর ধরিয়া এই মেয়েটির বয়স দশ বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিতেছে। অতএব, হিসাব মতো তার বয়স এখন অন্তত চৌদ্দ হইবে। কিন্তু যাই বল, মেয়েটি নামেও কমলা,— সকল বিষয়েই একেবারে লক্ষ্মীর প্রতিমা। এমন সুন্দর মেয়ে আমি তো দেখি নাই। এ-গ্রামে বিদেশের কোনো ব্রাহ্মণযুবক উপস্থিত হইলেই তারিণী তাহাকে বিবাহের জন্য হাতে-পায়ে ধরে। যদি বা কেহ রাজি হয়, গ্রামের লোকে ভাংচি দিয়া তাড়ায়। অতএব এবারে নিশ্চয় তোমার পালা।' জান তো মা, আমার মনের অবস্থাটা তখন একরকম মরিয়া গোছের ছিল— আমি কিছু চিন্তা না করিয়াই বলিলাম, 'এ-মেয়েটিকে আমিই বিবাহ করিব।' ইহার পূর্বেই আমি স্থির করিয়াছিলাম, একটি হিন্দু ঘরের মেয়ে বিবাহ করিয়া আনিয়া আমি তোমাকে চমৎকৃত করিয়া দিব— আমি জানিতাম, বড়ো বয়সের ব্রাহ্মমেয়ে আমাদের এ-ঘরে আনিলে তাহাতে সকল পক্ষই অসুখী হইবে। ভূপেন তো একেবারে আশ্চর্য হইয়া গেল।

সে বলিল, 'কী বল!' আমি বলিলাম, 'বলাবলি নয় আমি একেবারেই মন স্থির করিয়াছি।' ভূপেন কহিল, 'পাকা?' আমি কহিলাম, 'পাকা।' সেই সন্ধ্যাবেলাতেই স্বয়ং তারিণী চাটুজ্জে আমাদের তাঁবুতে আসিয়া উপস্থিত। ব্রাহ্মণ হাতে পইতা জড়াইয়া জোড়হাত করিয়া কহিলেন, 'আমাকে উদ্ধার করিতেই হইবে। মেয়েটি স্বচক্ষে দেখুন, যদি পছন্দ না হয় তো অন্য কথা—কিন্তু শত্রুপক্ষের কথা শুনিবেন না।' আমি বলিলাম, 'দেখিবার দরকার নাই, দিন স্থির করুন।' তারিণী কহিলেন, 'পরশু দিন ভালো আছে, পরশুই হইয়া যাক।' তাড়াতাড়ির দোহাই দিয়া বিবাহে যথাসাধ্য খরচ বাঁচাইবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল। বিবাহ তো হইয়া গেল।"

ক্ষেমংকরী চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, "বিবাহ হইয়া গেল— বল কী নলিন।"

নলিনাক্ষ। হাঁ, হইয়া গেল। বধূ লইয়া নৌকাতেও উঠিলাম। যে-দিন বৈকালে উঠিলাম, সেইদিনই ঘণ্টা-দুয়েক বাদে সূর্যাস্তের এক দণ্ড পরে হঠাৎ সেই অকালে ফাল্গুন মাসে কোথা হইতে অত্যন্ত গরম একটা ঘূর্ণিবাতাস আসিয়া এক মুহূর্তে আমাদের নৌকা উলটাইয়া কী করিয়া দিল, কিছু যেন বোঝা গেল না।

ক্ষেমংকরী বলিলেন, "মধুসূদন।" তাঁহার সর্বশরীরে কাঁটা দিয়া উঠিল।

নলিনাক্ষ। ক্ষণকাল পরে যখন বুদ্ধি ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিলাম, আমি নদীতে একজায়গায় সাঁতার দিতেছি কিন্তু নিকটে কোনো নৌকা বা আরোহীর কোনো চিহ্ন নাই। পুলিসে খবর দিয়া খোঁজ অনেক হইয়াছিল, কিন্তু কোনো ফল হইল না।

ক্ষেমংকরী পাংশুবর্ণ মুখ করিয়া কহিলেন, "যাক, যা হইয়া গেছে তা

গেছে, ও-কথা আমার কাছে আর-কখনো বলিসনে— মনে করিতেই আমার বুক কাঁপিয়া উঠিতেছে।"

নলিনাক্ষ। এ-কথা আমি কোনোদিনই তোমার কাছে বলিতাম না কিন্তু বিবাহের কথা লইয়া তুমি নিতান্তই জেদ করিতেছ বলিয়াই বলিতে হইল।

ক্ষেমংকরী কহিলেন, "একবার একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল বলিয়া তুই ইহজীবনে কখনো বিবাহই করিবি না?"

নলিনাক্ষ কহিল, "সেজন্য নয় মা, যদি সে-মেয়ে বাঁচিয়া থাকে?"

ক্ষেমংকরী। পাগল হইয়াছিস? বাঁচিয়া থাকিলে তোকে খবর দিত না?

নলিনাক্ষ। আমার খবর সে কী জানে। আমার চেয়ে অপরিচিত তাহার কাছে কে আছে। বোধ হয় সে আমার মুখও দেখে নাই। কাশীতে আসিয়া তারিণী চাটুজ্জেকে আমার ঠিকানা জানাইয়াছি— তিনিও কমলার কোনো খোঁজ পান নাই বলিয়া আমাকে চিঠি লিখিয়াছেন।

ক্ষেমংকরী। তবে আবার কী।

নলিনাক্ষ। আমি মনে মনে ঠিক করিয়াছি, পুরা একটি বৎসর অপেক্ষা করিয়া তবে তাহার মৃত্যু স্থির করিব।

ক্ষেমংকরী। তোমার সকল বিষয়েই বাড়াবাড়ি। আবার এক বৎসর অপেক্ষা করা কিসের জন্য।

নলিনাক্ষ। মা, এক বৎসরের আর দেরিই বা কিসের। এখন অঘ্রান; পৌষে বিবাহ হইতে পারিবে না—তাহার পরে মাঘটা কাটাইয়া ফাল্গুন।

ক্ষেমংকরী। আচ্ছা বেশ। কিন্তু পাত্রী ঠিক রহিল। হেমনলিনীর বাপকে আমি কথা দিয়াছি।

নলিনাক্ষ কহিল, "মা, মানুষ তো কেবল কথাটুকুমাত্রই দিতে পারে, সে-কথার সফলতা দেওয়া যাঁহার হাতে, তাঁহারই প্রতি নির্ভর করিয়া থাকিব।"

ক্ষেমংকরী। যাই হোক বাছা, তোমার এই ব্যাপারটা শুনিয়া এখনো আমার গা কাঁপিতেছে।

নলিনাক্ষ। সে তো আমি জানি মা, তোমার এই মন সুস্থির হইতে অনেকদিন লাগিবে। তোমার মনটা একবার একটু নাড়া পাইলেই তাহার আন্দোলন কিছুতেই আর থামিতে চায় না। সেইজন্যই তো মা, তোমাকে এ-রকম সব খবর দিতেই চাই না।

ক্ষেমংকরী। ভালোই কর বাছা,— আজকাল আমার কী হইয়াছে জানি না,— একটা মন্দ-কিছু শুনিলেই তার ভয় কিছুতেই ঘোচে না। আমার একটা ডাকের চিঠি খুলিতে ভয় করে,— পাছে তাহাতে কোনো কুসংবাদ থাকে। আমিও তো তোমাদের বলিয়া রাখিয়াছি, আমাকে কোনো খবর দিবার কোনো দরকার নাই;— আমি তো মনে করি, এ-সংসারে আমি মরিয়াই গেছি, এখানকার আঘাত আমার উপরে আর কেন।

৫১

কমলা যখন গঙ্গাতীরে গিয়া পৌঁছিল, শীতের সূর্য তখন রশ্মিচ্ছটাহীন ম্লান পশ্চিমাকাশের প্রান্তে নামিয়াছেন। কমলা আসন্ন অন্ধকারের সম্মুখীন সেই অস্তগামী সূর্যকে প্রণাম করিল। তাহার পরে মাথায় গঙ্গাজলের ছিটা দিয়া নদীর মধ্যে কিছুদূর নামিল এবং জোড়করপুটে গঙ্গায় জলগণ্ডূষ অঞ্জলি দান করিয়া ফুল ভাসাইয়া দিল। তার পর সমস্ত

গুরুজনদের উদ্দেশ করিয়া প্রণাম করিল। প্রণাম করিয়া মাথা তুলিতেই আর-একটি প্রণম্য ব্যক্তির কথা সে মনে করিল। কোনোদিন মুখ তুলিয়া তাঁহার মুখের দিকে সে চাহে নাই— যখন একদিন রাত্রে সে তাঁহার পাশে বসিয়াছিল, তখন তাঁহার পায়ের দিকেও তাহার চোখ পড়ে নাই— বাসরঘরে অন্য মেয়েদের সঙ্গে তিনি যে দুই-চারিটি কথা কহিয়াছিলেন, তাহাও সে যেন ঘোমটার মধ্য দিয়া, লজ্জার মধ্য দিয়া তেমন সুস্পষ্ট করিয়া শুনিতে পায় নাই। তাঁহার সেই কণ্ঠস্বর স্মরণে আনিবার জন্য আজ এই জলের ধারে দাঁড়াইয়া সে একান্তমনে চেষ্টা করিল, কিন্তু কোনোমতেই মনে আসিল না।

অনেক রাত্রে তাহার বিবাহের লগ্ন ছিল, নিতান্ত শ্রান্ত শরীরে সে যে কখন কোথায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তাহাও মনে নাই— সকালে জাগিয়া দেখিল, তাহাদের প্রতিবেশীর বাড়ির একটি বধূ তাহাকে ঠেলিয়া জাগাইয়া খিল খিল করিয়া হাসিতেছে— বিছানায় আর-কেহই নাই। জীবনের এই শেষমুহূর্তে জীবনেশ্বরকে স্মরণ করিবার সম্বল তাহার কিছুমাত্র নাই। সে-দিকে একেবারে অন্ধকার— কোনো মূর্তি নাই, কোনো বাক্য নাই, কোনো চিহ্ন নাই। যে লাল চেলিটির সঙ্গে তাঁহার চাদরের গ্রন্থি বাঁধা হইয়াছিল— তারিণীচরণের প্রদত্ত সেই নিতান্ত অল্পদামের চেলির মূল্য তো কমলা জানিত না— সে চেলিখানিও সে যত্ন করিয়া রাখে নাই।

রমেশ হেমনলিনীকে যে-চিঠি লিখিয়াছিল, সেখানি কমলার আঁচলের প্রান্তে বাঁধা ছিল—সেই চিঠি খুলিয়া বালুতটে বসিয়া তাহার একটি অংশ গোধূলির আলোকে পড়িতে লাগিল। সেই অংশে তাহার স্বামীর পরিচয় ছিল,—বেশি কথা নয়, কেবল তাঁহার নাম নলিনাক্ষ চট্টোপাধ্যায়, আর তিনি যে রংপুরে ডাক্তারি করিতেন ও এখন সেখানে তাঁহার খোঁজ

পাওয়া যায় না— এইটুকুমাত্র। চিঠির বাকি অংশ সে অনেক সন্ধান করিয়াও পায় নাই। "নলিনাক্ষ" এই নামটি তাহার মনের মধ্যে সুধাবর্ষণ করিতে লাগিল,— এই নামটি তাহার সমস্ত বুকের ভিতরটা যেন ভরিয়া তুলিল, এই নামটি যেন এক বস্তুহীন দেহ লইয়া তাহাকে আবিষ্ট করিয়া ধরিল— তাহার চোখ দিয়া অবিশ্রাম ধারা বাহিয়া জল পড়িয়া তাহার হৃদয়কে স্নিগ্ধ করিয়া দিল— মনে হইল, তাহার অসহ্য দুঃখদাহ যেন জুড়াইয়া গেল। কমলার অন্তঃকরণ বলিতে লাগিল, "এ তো শূন্যতা নয়, এ তো অন্ধকার নয়— আমি দেখিতেছি, সে যে আছে, সে আমারই আছে।" তখন কমলা প্রাণপণ বলে বলিয়া উঠিল, "আমি যদি সতী হই, তবে এই জীবনেই আমি তাঁহার পায়ের ধুলা লইব, বিধাতা আমাকে কখনোই বাধা দিতে পারিবেন না। আমি যখন আছি, তখন তিনি কখনোই যান নাই, তাঁহারই সেবা করিবার জন্য ভগবান আমাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন।"

এই বলিয়া সে তাহার রুমালে বাঁধা চাবির গোছা সেইখানেই ফেলিল এবং হঠাৎ তাহার মনে পড়িল, রমেশের দেওয়া একটা ব্রোচ তাহার কাপড়ে বেঁধানো আছে। সেটা তাড়াতাড়ি খুলিয়া জলের মধ্যে ফেলিয়া দিল। তাহার পরে পশ্চিমে মুখ করিয়া সে চলিতে আরম্ভ করিল— কোথায় যাইবে, কী করিবে, তাহা তাহার মনে স্পষ্ট ছিল না। কেবল সে জানিয়াছিল, তাহাকে চলিতেই হইবে, এখানে তাহার এক মুহূর্ত দাঁড়াইবার স্থান নাই।

শীতের দিনান্তের আলোটুকু নিঃশেষ হইয়া যাইতে বিলম্ব হইল না। অন্ধকারের মধ্যে সাদা বালুতট অস্পষ্টভাবে ধু ধু করিতে লাগিল, হঠাৎ এক জায়গায় কে যেন বিচিত্র রচনাবলীর মাঝখান হইতে সৃষ্টির খানিকটা চিত্রলেখা একেবারে মুছিয়া ফেলিয়াছে। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার

রাত্রি তাহার সমস্ত নির্নিমেষ তারা লইয়া এই জনশূন্য নদীতীরের উপর অতি ধীরে নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল।

কমলা সম্মুখে গৃহহীন অনন্ত অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইল না, কিন্তু সে জানিল, তাহাকে চলিতেই হইবে— কোথাও পৌঁছিবে কি না, তাহা ভাবিবার সামর্থ্যও তাহার নাই।

বরাবর নদীর ধার দিয়া সে চলিবে, এই সে স্থির করিয়াছে— তাহা হইলে কাহাকেও পথ জিজ্ঞাসা করিতে হইবে না এবং যদি বিপদ তাহাকে আক্রমণ করে, তবে মুহূর্তের মধ্যেই মা গঙ্গা তাহাকে আশ্রয় দিবেন।

আকাশে কুহেলিকার লেশমাত্র ছিল না। অনাবিল অন্ধকার কমলাকে আবৃত করিয়া রাখিল, কিন্তু তাহার দৃষ্টিকে বাধা দিল না।

রাত্রি বাড়িতে লাগিল। যবের খেতের প্রান্ত হইতে শৃগাল ডাকিয়া গেল। কমলা বহুদূর চলিতে চলিতে বালুর চর শেষ হইয়া মাটির ডাঙা আরম্ভ হইল। নদীর ধারেই একটা গ্রাম দেখা গেল। কমলা কম্পিতবক্ষে গ্রামের কাছে আসিয়া দেখিল, গ্রামটি সুষুপ্ত। ভয়ে ভয়ে গ্রামটি পার হইয়া চলিতে চলিতে তাহার শরীরে আর শক্তি রহিল না। অবশেষে এক জায়গায় এমন একটা ভাঙাতটের কাছে আসিয়া পৌঁছিল, যেখানে সম্মুখে আর-কোনো পথ পাইল না। নিতান্ত অশক্ত হইয়া একটা বটগাছের তলায় শুইয়া পড়িল, শুইবামাত্রই কখন নিদ্রা আসিল, জানিতেও পারিল না।

প্রত্যুষেই চোখ মেলিয়া দেখিল, কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের আলোকে অন্ধকার ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে এবং একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, "তুমি কে গা? শীতের রাত্রে এই গাছের তলায় কে শুইয়া?"

কমলা চকিত হইয়া উঠিয়া বসিল। দেখিল, তাহার অদূরে ঘাটে

দুখানা বজরা বাঁধা রহিয়াছে— এই প্রৌঢ়াটি লোক উঠিবার পূর্বেই স্নান সারিয়া লইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন।

প্রৌঢ়া কহিলেন, "হাঁ গা, তোমাকে যে বাঙালির মতো দেখিতেছি।"

কমলা কহিল, "আমি বাঙালি।"

প্রৌঢ়া। এখানে পড়িয়া আছ যে?

কমলা। আমি কাশীতে যাইব বলিয়া বাহির হইয়াছি। রাত অনেক হইল, ঘুম আসিল, এইখানেই শুইয়া পড়িলাম।

প্রৌঢ়া। ওমা, সে কী কথা। হাঁটিয়া কাশী যাইতেছ? আচ্ছা চলো, ওই বজরায় চলো, আমি স্নান সারিয়া আসিতেছি।

স্নানের পর এই স্ত্রীলোকটির সহিত কমলার পরিচয় হইল।

গাজিপুরে যে-সিদ্ধেশ্বরবাবুদের বাড়িতে খুব ঘটা করিয়া বিবাহ হইতেছিল, তাঁহারা ইঁহাদের আত্মীয়। এই প্রৌঢ়াটির নাম নবীনকালী এবং ইঁহার স্বামীর নাম মুকুন্দলাল দত্ত— কিছুকাল কাশীতেই বাস করিতেছেন। ইঁহারা আত্মীয়ের বাড়ি নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে পারেন নাই, অথচ পাছে তাঁহাদের বাড়িতে থাকিতে বা খাইতে হয়, এইজন্য বোটে করিয়া গিয়াছিলেন। বিবাহবাড়ির কর্ত্রী ক্ষোভপ্রকাশ করাতে নবীনকালী বলিয়াছিলেন, "জানই তো ভাই, কর্তার শরীর ভালো নয়। আর ছেলেবেলা হইতে উঁহাদের অভ্যাসই একরকম। বাড়িতে গোরু রাখিয়া দুধ হইতে মাখন তুলিয়া সেই মাখনমারা ঘিয়ে উঁহার লুচি তৈরি হয়,— আবার সে-গোরুকে যা-তা খাওয়াইলে চলিবে না"— ইত্যাদি ইত্যাদি।

নবীনকালী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কী।"

কমলা কহিল, "আমার নাম কমলা।"

নবীনকালী। তোমার হাতে লোহা দেখিতেছি, স্বামী আছে বুঝি?

কমলা কহিল, "বিবাহের পরদিন হইতেই স্বামী নিরুদ্দেশ হইয়া গেছেন।"

নবীনকালী। ওমা সে কী কথা। তোমার বয়স তো বড়ো বেশি বোধ হয় না।

তাহাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "পনরোর বেশি হইবে না।"

কমলা কহিল, "বয়স ঠিক জানি না, বোধ করি, পনরোই হইবে।"

নবীনকালী। তুমি ব্রাহ্মণের মেয়ে বটে?

কমলা কহিল, "হাঁ।"

নবীনকালী কহিলেন, "তোমাদের বাড়ি কোথায়?"

কমলা। কখনো শ্বশুরবাড়ি যাই নাই, আমার বাপের বাড়ি বিশুখালি।

কমলার পিত্রালয় বিশুখালিতেই ছিল, তাহা সে জানিত।

নবীনকালী। তোমার বাপ-মা—

কমলা। আমার বাপ-মা কেহই নাই।

নবীনকালী। হরি বলো! তুমি কী করিবে?

কমলা। কাশীতে যদি কোনো ভদ্র গৃহস্থ আমাকে বাড়িতে রাখিয়া দু-বেলা দুটি খাইতে দেন, তবে আমি কাজ করিব। আমি রাঁধিতে পারি।

নবীনকালী বিনা-বেতনে পাচিকা ব্রাহ্মণী লাভ করিয়া মনে মনে ভারি খুশি হইলেন। কহিলেন, "আমাদের তো দরকার নাই— বামুন-চাকর সমস্তই আমাদের সঙ্গে আছে। আমাদের আবার যে-সে বামুন হইবার জো নাই—কর্তার খাবারের একটু এদিক-ওদিক হইলে আর কি রক্ষা আছে। বামুনকে মাইনে দিতে হয় চৌদ্দ টাকা তার উপরে

ভাত-কাপড় আছে। তা হোক, ব্রাহ্মণের মেয়ে, তুমি বিপদে পড়িয়াছ,—তা চলো, আমাদের ওখানেই চলো। কত লোক খাচ্ছে-দাচ্ছে, কত ফেলা ছড়া যায়, আর-একজন বাড়িলে কেহ জানিতেও পারিবে না। আমাদের কাজও তেমন বেশি নয়। এখানে কেবল কর্তা আর আমি আছি। মেয়েগুলির সব বিবাহ দিয়াছি; তা তাহারা বেশ বড়োঘরেই পড়িয়াছে। আমার একটিমাত্র ছেলে, সে হাকিম, এখন সেরাজগঞ্জে আছে, লাটসাহেবের ওখান হইতে দু-মাস অন্তর তাহার নামে চিঠি আসে, আমি কর্তাকে বলি, আমাদের নোটোর তো অভাব কিছুই নাই, কেন তাহার এই গেরো। এতবড়ো হাকিমি সকলের ভাগ্যে জোটে না তা জানি, কিন্তু বাছাকে তবু তো সেই বিদেশে পড়িয়া থাকিতে হয়। কেন। দরকার কী। কর্তা বলেন, 'ওগো সেজন্য নয়, সেজন্য নয়। তুমি মেয়েমানুষ, বোঝ না। আমি কি রোজগারের জন্য নোটোকে চাকরিতে দিয়াছি। আমার অভাব কিসের। তবে কি না, হাতে একটা কাজ থাকা চাই, নহিলে অল্প বয়স, কী জানি কখন কী মতি হয়।"

পালে বাতাসের জোর ছিল, কাশী পৌঁছিতে দীর্ঘকাল লাগিল না। শহরের ঠিক বাহিরেই অল্প-একটু বাগানওয়ালা একটি দোতলা বাড়িতে সকলে গিয়া উঠিলেন।

সেখানে চৌদ্দ টাকা বেতনের বামুনের কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না— একটা উড়ে বামুন ছিল, অনতিকাল পরেই নবীনকালী তাহার উপরে একদিন হঠাৎ অত্যন্ত আগুন হইয়া উঠিয়া বিনা বেতনে তাহাকে বিদায় করিয়া দিলেন। ইতিমধ্যে চৌদ্দ টাকা বেতনের অতি দুর্লভ দ্বিতীয় একটি পাচক জুটিবার অবকাশে কমলাকেই সমস্ত রাঁধাবাড়ার ভার লইতে হইল।

নবীনকালী কমলাকে বার বার সতর্ক করিয়া কহিলেন, "দেখো বাছা, কাশী শহর ভালো জায়গা নয়। তোমার অল্প বয়স। বাড়ির বাহিরে কখনো বাহির হইয়ো না। গঙ্গাস্নান বিশ্বেশ্বরদর্শনে আমি যখন যাইব, তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইব।"

কমলা পাছে দৈবাৎ হাতছাড়া হইয়া যায়, নবীনকালী এজন্য তাহাকে অত্যন্ত সাবধানে রাখিলেন। বাঙালি মেয়েদের সঙ্গেও তাহাকে বড়ো-একটা আলাপের অবসর দিতেন না। দিনের বেলা তো কাজের অভাব ছিল না, সন্ধ্যার পরে একবার কিছুক্ষণ নবীনকালী তাঁহার যে ঐশ্বর্য, যে গহনাপত্র, যে সোনারুপার বাসন, যে মখমল-কিংখাবের গৃহসজ্জা চোরের ভয়ে কাশীতে আনিতে পারেন নাই, তাহারই আলোচনা করিতেন। "কাঁসার থালায় খাওয়া তো কর্তার কোনোকালেই অভ্যাস নাই, তাই প্রথম-প্রথম এ লইয়া তিনি অনেক বকাবকি করিতেন। তিনি বলিতেন, 'না হয় দু-চারখানা চুরি যায়, সেও ভালো, আবার গড়াইতে কতক্ষণ।' কিন্তু টাকা আছে বলিয়াই যে লোকসান করিতে হইবে, সে আমি কোনোমতে সহ্য করিতে পারি না। তার চেয়ে বরঞ্চ কিছুকাল কষ্ট করিয়া থাকাও ভালো। এই দেখো না, দেশে আমাদের মস্ত বাড়ি, সেখানে লোক-লশকর যতই থাক্‌ আসে-যায় না, তাই বলিয়া কি এখানে সাত গণ্ডা চাকর আনা চলে। কর্তা বলেন, 'কাছাকাছি না হয় আরও একটা বাড়ি ভাড়া করা যাইবে।' আমি বলিলাম, 'না, সে আমি পারিব না—কোথায় এখানে একটু আরাম করিব, না কতকগুলো লোকজন বাড়িঘর লইয়া দিনরাত্রি ভাবনার অন্ত থাকিবে না।'" ইত্যাদি।

৫২

নবীনকালীর আশ্রয়ে কমলার প্রাণটা যেন অল্পজল এঁদো-পুকুরের মাছের মতো ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। এখান হইতে বাহির হইতে পারিলে সে বাঁচে, কিন্তু বাহিরে গিয়া দাঁড়াইবে কোথায়? সেদিনকার রাত্রে গৃহহীন বাহিরের পৃথিবীকে সে জানিয়াছে; সেখানে অন্ধভাবে আত্মসমর্পণ করিতে আর তাহার সাহস হয় না।

নবীনকালী যে কমলাকে ভালোবাসিতেন না তাহা নহে, কিন্তু সে-ভালোবাসার মধ্যে রস ছিল না। দুই-এক দিন অসুখ-বিসুখের সময় তিনি কমলাকে যত্নও করিয়াছিলেন, কিন্তু সে-যত্ন কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করা বড়ো কঠিন। বরঞ্চ সে কাজকর্মের মধ্যে থাকিত ভালো, কিন্তু যে-সময়টা নবীনকালীর সখিত্বে তাহাকে যাপন করিতে হইত, সেইটেই তার পক্ষে সবচেয়ে দুঃসময়।

একদিন সকালবেলা নবীনকালী কমলাকে ডাকিয়া কহিলেন, "ওগো, ও বামুনঠাকরুন, আজ কর্তার শরীর বড়ো ভালো নাই, আজ ভাত হইবে না, আজ রুটি। কিন্তু তাই বলিয়া একরাশ ঘি লইয়ো না। জানি তো তোমার রান্নার শ্রী, উহাতে এত ঘি কেমন করিয়া খরচ হইবে, তাহা তো বুঝিতে পারি না। এর চেয়ে সেই যে উড়ে বামুনটা ছিল ভালো—সে ঘি লইত বটে, কিন্তু রান্নায় ঘিয়ের স্বাদ একটু-আধটু পাওয়া যাইত।"

কমলা এ-সমস্ত কথার কোনো জবাবই করিত না—যেন শুনিতে পায় নাই, এমনিভাবে নিঃশব্দে সে কাজ করিয়া যাইত।

আজ অপমানের গোপনভারে আক্রান্তহৃদয় হইয়া কমলা চুপ করিয়া তরকারি কুটিতেছিল— সমস্ত পৃথিবী বিরস এবং জীবনটা দুঃসহ বোধ

হইতেছিল, এমন সময় গৃহিণীর ঘর হইতে একটা কথা তাহার কানে আসিয়া কমলাকে একেবারে চকিত করিয়া তুলিল। নবীনকালী তাঁহার চাকরকে ডাকিয়া বলিতেছিলেন, "ওরে তুলসী, যা তো, শহর হইতে নলিনাক্ষ ডাক্তারকে শীঘ্র ডাকিয়া আন্। বল্, কর্তার শরীর বড়ো খারাপ।"

নলিনাক্ষ ডাক্তার! কমলার চোখের উপরে সমস্ত আকাশের আলো আহত বীণার স্বর্ণতন্ত্রীর মতো কাঁপিতে লাগিল। সে তরকারি-কোটা ফেলিয়া দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তুলসী নিচে নামিয়া আসিতেই কমলা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাইতেছিস তুলসী।" সে কহিল, "নলিনাক্ষ ডাক্তারকে ডাকিতে যাইতেছি।"

কমলা কহিল, "সে আবার কোন্ ডাক্তার?"

তুলসী কহিল, "তিনি এখানকার একটি বড়ো ডাক্তার বটে।"

কমলা। তিনি থাকেন কোথায়?

তুলসী কহিল, "শহরেই থাকেন, এখান হইতে আধ ক্রোশটাক হইবে।"

আহারের সামগ্রী অল্পস্বল্প যাহা-কিছু বাঁচাইতে পারিত কমলা তাহাই বাড়ির চাকরবাকরদের ভাগ করিয়া দিত। এজন্য সে ভর্ৎসনা অনেক সহিয়াছে, কিন্তু এ-অভ্যাস ছাড়িতে পারে নাই। বিশেষত গৃহিণীর কড়া আইন অনুসারে এ-বাড়ির লোকজনদের খাবার কষ্ট অত্যন্ত বেশি। তা ছাড়া কর্তা-গৃহিণীর খাইতে বেলা হইত— ভৃত্যেরা তাহার পরে খাইতে পাইত। তাহারা যখন আসিয়া কমলাকে জানাইত, "বামুনঠাকরুন, বড়ো ক্ষুধা পাইয়াছে", তখন সে তাহাদিগকে কিছু-কিছু না খাইতে দিয়া কোনোমতেই থাকিতে পারিত না। এমনি করিয়া বাড়ির চাকরবাকর দুই দিনেই কমলার একান্ত বশ মানিয়াছে।

উপর হইতে রব আসিল, "রান্নাঘরের দরজার কাছে দাঁড়াইয়া কিসের পরামর্শ চলিতেছে রে তুলসী। আমার বুঝি চোখ নাই মনে করিস। শহরে যাইবার পথে একবার বুঝি রান্নাঘর না মাড়াইয়া গেলে চলে না। এমনি করিয়াই জিনিসপত্রগুলো সরাইতে হয় বটে। বলি বামুনঠাকরুন, রাস্তায় পড়িয়াছিলে, দয়া করিয়া তোমাকে আশ্রয় দিলাম, এমনি করিয়াই তাহার শোধ তুলিতে হয় বুঝি।"

সকলেই তাঁহার জিনিসপত্র চুরি করিতেছে, এই সন্দেহ নবীনকালীকে কিছুতেই ত্যাগ করে না। যখন প্রমাণের লেশমাত্রও না থাকে, তখনো তিনি আন্দাজে ভৎর্সনা করিয়া লন। তিনি স্থির করিয়াছেন যে, অন্ধকারে ঢেলা মারিলেও অধিকাংশ ঢেলা ঠিক্ জায়গায় গিয়া পড়ে, আর তিনি যে সর্বদা সতর্ক আছেন ও তাঁহাকে ফাঁকি দিবার জো নাই, ভৃত্যেরা ইহা বুঝিতে পারে।

আজ নবীনকালীর তীব্রবাক্য কমলার মনেও বাজিল না। সে আজ কেবল কলের মতো কাজ করিতেছে, তাহার মনটা যে কোন্‌খানে উধাও হইয়া গেছে, তাহার ঠিকানা নাই।

নিচে রান্নাঘরের দরজার কাছে কমলা দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। এমন সময় তুলসী ফিরিয়া আসিল, কিন্তু সে একা আসিল। কমলা জিজ্ঞাসা করিল, "তুলসী, কই, ডাক্তারবাবু আসিলেন না।"

তুলসী কহিল, "না, তিনি আসিলেন না।"

কমলা। কেন।

তুলসী। তাঁহার মার অসুখ করিয়াছে।

কমলা। মার অসুখ? ঘরে আর কি কেহ নাই।

তুলসী। না, তিনি তো বিবাহ করেন নাই।

কমলা। বিবাহ করেন নাই, তুই কেমন করিয়া জানিলি ?

তুলসী। চাকরদের মুখে তো শুনি, তাঁহার স্ত্রী নাই।

কমলা। হয়তো তাঁহার স্ত্রী মারা গেছে।

তুলসী। তা হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার চাকর ব্রজ বলে, তিনি যখন রংপুরে ডাক্তারি করিতেন, তখনো তাঁহার স্ত্রী ছিল না।

উপর হইতে ডাক পড়িল, "তুলসী।" কমলা তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল এবং তুলসী উপরে চলিয়া গেল।

নলিনাক্ষ— রংপুরে ডাক্তারি করিতেন— কমলার মনে আর তো কোনো সন্দেহ নাই। তুলসী নামিয়া আসিলে পুনর্বার কমলা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "দেখ্ তুলসী, ডাক্তারবাবুর নামে আমার একটি আত্মীয় আছেন— বল্ দেখি, উনি ব্রাহ্মণ তো বটেন?"

তুলসী। হাঁ, ব্রাহ্মণ, চাটুজ্জে।

গৃহিণীর দৃষ্টিপাতের ভয়ে তুলসী বামুনঠাকরুনের সঙ্গে অধিকক্ষণ কথাবার্তা কহিতে সাহস করিল না— সে চলিয়া গেল।

কমলা নবীনকালীর নিকটে গিয়া কহিল, "কাজকর্ম সমস্ত সারিয়া আজ আমি একবার দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান করিয়া আসিব।"

নবীনকালী। তোমার সকল অনাসৃষ্টি। কর্তার আজ অসুখ,— আজ কখন কী দরকার হয়, তাহা বলা যায় না— আজ তুমি গেলে চলিবে কেন।

কমলা কহিল, "আমার একটি আপনার লোক কাশীতে আছেন খবর পাইয়াছি, তাঁহাকে একবার দেখিতে যাইব।"

নবীনকালী। এ-সব ভালো কথা নয়। আমার যথেষ্ট বয়স হইয়াছে, আমি এ-সব বুঝি। খবর তোমাকে কে আনিয়া দিল। তুলসী বুঝি? ও-ছোঁড়াটাকে আর রাখা নয়। শোনো বলি বামুনঠাকরুন, আমার

কাছে যতদিন আছ, ঘাটে একলা স্নান করিতে যাওয়া, আত্মীয়ের সন্ধানে শহরে বাহির হওয়া, ও-সমস্ত চলিবে না, তাহা বলিয়া রাখিতেছি।

দরোয়ানের উপর হুকুম হইয়া গেল, তুলসীকে এই দণ্ডে দূর করিয়া দেওয়া হয়, সে যেন এ-বাড়িমুখো হইতে না পারে।

গৃহিণীর শাসনে অন্যান্য চাকরেরা কমলার সংস্রব যথাসম্ভব পরিত্যাগ করিল।

নলিনাক্ষ সম্বন্ধে যতদিন কমলা নিশ্চিত ছিল না, ততদিন তাহার ধৈর্য ছিল; এখন তাহার পক্ষে ধৈর্যরক্ষা করা: দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। এই নগরেই তাহার স্বামী রহিয়াছেন, অথচ সে এক মুহূর্তও যে অন্যের ঘরে আশ্রয় লইয়া থাকিবে, ইহা তাহার পক্ষে অসহ্য হইল। কাজকর্মে তাহার পদে পদে ত্রুটি হইতে লাগিল।

নবীনকালী কহিলেন, "বলি বামুনঠাকরুন, তোমার গতিক তো ভালো দেখি না। তোমাকে কি ভূতে পাইয়াছে। তুমি নিজে তো খাওয়াদাওয়া বন্ধ করিয়াছ, আমাদিগকেও কি উপোস করাইয়া মারিবে। আজকাল তোমার রান্না যে আর মুখে দেবার জো নাই।"

কমলা কহিল, "আমি এখানে আর কাজ করিতে পারিতেছি না— আমার কোনোমতে মন টিঁকিতেছে না। আমাকে বিদায় দিন।"

নবীনকালী ঝংকার দিয়া বলিলেন, "বটেই তো। কলিকালে কাহারো ভালো করিতে নাই। তোমাকে দয়া করিয়া আশ্রয় দিবার জন্যে আমার এতকালের অমন ভালো বামুনটাকে ছাড়াইয়া দিলাম, একবারও খবর লইলাম না— তুমি সত্যি বামুনের মেয়ে কি না। আজ উনি বলেন কিনা, আমাকে বিদায় দিন। যদি পালাইবার চেষ্টা কর তো পুলিসে খবর দিব না! আমার ছেলে হাকিম— তার হুকুমে কত লোক ফাঁসি গেছে— আমার কাছে তোমার চালাকি খাটিবে না। শুনেইছ

তো— গদা কর্তার মুখের উপর জবাব দিতে গিয়াছিল, সে-বেটা এমনি জব্দ হইয়াছে, আজো সে জেল খাটিতেছে। আমাদের তুমি যেমন-তেমন পাও নাই।"

কথাটা মিথ্যা নহে— গদা চাকরকে ঘড়িচুরির অপবাদ দিয়া জেলে পাঠানো হইয়াছে বটে।

কমলা কোনো উপায় খুঁজিয়া পাইল না। তাহার চিরজীবনের সার্থকতা যখন হাত বাড়াইলেই পাওয়া যায়, তখন সেই হাতে বাঁধন পড়ার মতো এমন নিষ্ঠুর আর কী হইতে পারে। কমলা আপনার কাজের মধ্যে, ঘরের মধ্যে কিছুতেই আর তো বদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে না। তাহার রাত্রের কাজ শেষ হইয়া গেলে পর সে শীতে একখানা র‍্যাপার মুড়ি দিয়া বাগানে বাহির হইয়া পড়িত। প্রাচীরের ধারে দাঁড়াইয়া যে-পথ শহরের দিকে চলিয়া গেছে, সেই পথের দিকে চাহিয়া থাকিত। তাহার যে-তরুণহৃদয়খানি সেবার জন্য ব্যাকুল, ভক্তিনিবেদনের জন্য ব্যগ্র,—সেই হৃদয়কে কমলা এই রজনীর নির্জন পথ বাহিয়া নগরের মধ্যে কোন্ এক অপরিচিত গৃহের উদ্দেশে প্রেরণ করিত— তাহার পর অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া তাহার শয়নকক্ষের মধ্যে ফিরিয়া আসিত।

কিন্তু এইটুকু সুখ, এইটুকু স্বাধীনতাও কমলার বেশিদিন রহিল না। রাত্রির সমস্ত কাজ শেষ হইয়া গেলেও একদিন কী কারণে নবীনকালী কমলাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বেহারা আসিয়া খবর দিল, "বামুন-ঠাকরুনকে দেখিতে পাইলাম না।"

নবীনকালী ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া কহিলেন, "সে কী রে, তবে পালাইল নাকি।"

নবীনকালী নিজে সেই রাত্রে আলো ধরিয়া ঘরে ঘরে খোঁজ করিয়া

আসিলেন, কোথাও কমলাকে দেখিতে পাইলেন না। মুকুন্দবাবু অর্ধনিমীলিতনেত্রে গুড়গুড়ি টানিতেছিলেন— তাঁহাকে গিয়া কহিলেন, "ওগো শুনছ, বামুনঠাকরুন বোধ করি পালাইল।"

ইহাতেও মুকুন্দবাবুর শান্তিভঙ্গ করিল না। তিনি কেবল আলস্য-জড়িতকণ্ঠে কহিলেন, "তখনি তো বারণ করিয়াছিলাম— জানাশোনা লোক নয়। কিছু সরাইয়াছে নাকি।"

গৃহিণী কহিলেন, "সে-দিন তাহাকে যে শীতের কাপড়খানা পরিতে দিয়াছিলাম, সেটা তো ঘরে নাই, এ-ছাড়া আর কী গিয়াছে এখনো দেখি নাই।"

কর্তা অবিচলিত গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "পুলিসে খবর দেওয়া যাক।"

একজন চাকর লণ্ঠন লইয়া পথে বাহির হইল। ইতিমধ্যে কমলা তাহার ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, নবীনকালী সে-ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র তন্ন-তন্ন করিয়া দেখিতেছেন। কোনো জিনিস চুরি গেছে কি না, তাহাই তিনি সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এমন সময় কমলাকে হঠাৎ দেখিয়া নবীনকালী বলিয়া উঠিলেন, "বলি কী কাণ্ডটাই করিলে। কোথায় যাওয়া হইয়াছিল?"

কমলা কহিল, "কাজ শেষ করিয়া আমি একটুখানি বাগানে বেড়াইতেছিলাম।"

নবীনকালীর মুখে যাহা আসিল, তাহাই বলিয়া গেলেন। বাড়ির সমস্ত চাকরবাকর দরজার কাছে আসিয়া জড়ো হইল।

কমলা কোনোদিন নবীনকালীর কোনো ভৎসনায় তাঁহার সম্মুখে অশ্রুবর্ষণ করে নাই। আজও সে কাঠের মূর্তির মতো স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নবীনকালীর বাক্যবর্ষণ একটুখানি ক্ষান্ত হইবামাত্র কমলা কহিল,

"আমার প্রতি আপনারা অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, আমাকে বিদায় করিয়া দিন।"

নবীনকালী। বিদায় তো করিবই। তোমার মতো অকৃতজ্ঞকে চিরদিন ভাতকাপড় দিয়া পুষিব, এমন কথা মনেও করিয়ো না। কিন্তু কেমন লোকের হাতে পড়িয়াছ, সেটা আগে ভালো করিয়া জানাইয়া তবে বিদায় দিব।

ইহার পর হইতে কমলা বাহিরে যাইতে আর সাহস করিত না। সে ঘরের মধ্যে দ্বার রুদ্ধ করিয়া মনে মনে এই কথা বলিল, "যে-লোক এত দুঃখ সহ্য করিতেছে, ভগবান নিশ্চয় তাহার একটা গতি করিয়া দিবেন।"

মুকুন্দবাবু তাঁহার দুইটি চাকর সঙ্গে লইয়া গাড়ি করিয়া হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছেন। বাড়িতে প্রবেশের দরজায় ভিতর হইতে হুড়কা বন্ধ। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে।

দ্বারের কাছে রব উঠিল, "মুকুন্দবাবু ঘরে আছেন কি।"

নবীনকালী চকিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওই গো, নলিনাক্ষ ডাক্তার আসিয়াছেন। বুধিয়া, বুধিয়া।"

বুধিয়া-নামধারিণীর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। তখন নবীনকালী কহিলেন, "বামুনঠাকরুন, যাও তো, শীঘ্র দরজা খুলিয়া দাও গে। ডাক্তারবাবুকে বলো, কতা হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছেন, এখনি আসিবেন— একটু অপেক্ষা করিতে হইবে।"

কমলা লণ্ঠন লইয়া নিচে নামিয়া গেল,— তাহার পা কাঁপিতেছে, তাহার বুকের ভিতর গুড় গুড় করিতেছে, তাহার করতল ঠাণ্ডা হিম হইয়া গেল। তাহার ভয় হইতে লাগিল, পাছে এই বিষম ব্যাকুলতায় সে চোখে ভালো করিয়া দেখিতে না পায়।

কমলা ভিতর হইতে হুড়কা খুলিয়া দিয়া ঘোমটা টানিয়া কপাটের অন্তরালে দাঁড়াইল।

নলিনাক্ষ জিজ্ঞাসা করিল, "কর্তা ঘরে আছেন কি।"

কমলা কোনোমতে কহিল, "না, আপনি আসুন।"

নলিনাক্ষ বসিবার ঘরে আসিয়া বসিল। ইতিমধ্যে বুধিয়া আসিয়া কহিল, কর্তাবাবু বেড়াইতে গেছেন, এখনি আসিবেন, আপনি একটু বসুন।"

কমলার নিশ্বাস প্রবল হইয়া তাহার বুকের মধ্যে কষ্ট হইতেছিল। যেখান হইতে নলিনাক্ষকে স্পষ্ট দেখা যাইবে, অন্ধকার বারান্দায় এমন-একটা জায়গা সে আশ্রয় করিল, কিন্তু দাঁড়াইতে পারিল না। বিক্ষুব্ধ বক্ষকে শান্ত করিবার জন্য তাহাকে সেইখানে বসিয়া পড়িতে হইল। তাহার হৃৎপিণ্ডের চাঞ্চল্যের সঙ্গে শীতের হাওয়া যোগ দিয়া তাহাকে থরথর করিয়া কাঁপাইয়া তুলিল।

নলিনাক্ষ কেরোসিন-আলোর পাশে বসিয়া স্তব্ধ হইয়া কী ভাবিতেছিল। অন্ধকারের ভিতর হইতে বেপথুমতী কমলা নলিনাক্ষের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। চাহিতে চাহিতে তাহার দুই চক্ষে বার বার জল আসিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি জল মুছিয়া ফেলিয়া সেই তাহার একাগ্রদৃষ্টির দ্বারা নলিনাক্ষকে যেন আপনার অন্তঃকরণের গভীরতম অভ্যন্তরদেশে আকর্ষণ করিয়া লইল। ওই যে উন্নতললাট স্তব্ধ মুখখানির উপরে দীপালোক মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছে, ওই মুখ যতই কমলার অন্তরের মধ্যে মুদ্রিত ও পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল, ততই তাহার সমস্ত শরীর যেন ক্রমে অবশ হইয়া চারিদিকের আকাশের সহিত মিলাইয়া যাইতে লাগিল;— বিশ্বজগতের মধ্যে আর কিছুই রহিল না,

কেবল ওই আলোকিত মুখখানি রহিল— যাহার সম্মুখে রহিল, সেও ওই মুখের সহিত সম্পূর্ণভাবে মিশিয়া গেল।

এইরূপে কিছুক্ষণ কমলা সচেতন কি অচেতন ছিল, তাহা বলা যায় না— এমন সময় হঠাৎ সে চকিত হইয়া দেখিল, নলিনাক্ষ চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং মুকুন্দবাবুর সঙ্গে কথা কহিতেছে।

এখনি পাছে উঁহারা বারান্দায় বাহির হইয়া আসেন এবং কমলা ধরা পড়ে, এই ভয়ে কমলা বারান্দা ছাড়িয়া নিচে তাহার রান্নাঘরে গিয়া বসিল। রান্নাঘরটি প্রাঙ্গণের এক ধারে, এবং এই প্রাঙ্গণটি বাড়ির ভিতর হইতে বাহির হইয়া যাইবার পথ।

কমলা সর্বাঙ্গমনে পুলকিত হইয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল, "আমার মতো হতভাগিনীর এমন স্বামী! দেবতার মতো এমন সৌম্যনির্মল প্রসন্ন-সুন্দর মূর্তি! ওগো ঠাকুর, আমার সকল দুঃখ সার্থক হইয়াছে।"

বলিয়া বার বার করিয়া ভগবানকে প্রণাম করিল।

সিঁড়ি দিয়া নিচে নামিবার পদশব্দ শোনা গেল। কমলা তাড়াতাড়ি অন্ধকারে দ্বারের পাশে দাঁড়াইল। বুধিয়া আলো ধরিয়া আগে আগে চলিল, তাহার অনুসরণ করিয়া নলিনাক্ষ বাহির হইয়া গেল।

কমলা মনে মনে কহিল, "তোমার শ্রীচরণের সেবিকা হইয়া এইখানে পরের দ্বারে দাসত্বে আবদ্ধ হইয়া আছি, সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেলে, তবু জানিতেও পারিলে না।"

মুকুন্দবাবু অন্তঃপুরে আহার করিতে গেলে কমলা আস্তে আস্তে সেই বসিবার ঘরে গেল। যে-চৌকিতে নলিনাক্ষ বসিয়াছিল, তাহার সম্মুখে ভূমিতে ললাট ঠেকাইয়া সেখানকার ধূলি চুম্বন করিল। সেবা করিবার কোনো অবকাশ না পাইয়া অবরুদ্ধ ভক্তিতে কমলার হৃদয় কাতর হইয়া উঠিয়াছিল।

পরদিন কমলা সংবাদ পাইল, বায়ুপরিবর্তনের জন্য ডাক্তারবাবু কর্তাকে সুদূর পশ্চিমে কাশীর চেয়ে স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইতে উপদেশ করিয়াছেন। তাই আজ হইতে যাত্রার আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে।

কমলা নবীনকালীকে গিয়া কহিল, "আমি তো কাশী ছাড়িয়া যাইতে পারিব না।"

নবীনকালী। আমরা পারিব আর তুমি পারিবে না! বড়ো ভক্তি দেখিতেছি।

কমলা। আপনি যাহাই বলুন, আমি এখানেই থাকিব।

নবীনকালী। আচ্ছা, তা কেমন থাক, দেখা যাইবে।

কমলা কহিল, "আমাকে দয়া করুন, আমাকে এখান হইতে লইয়া যাইবেন না।"

নবীনকালী। তুমি তো বড়ো ভয়ানক লোক দেখিতেছি। ঠিক যাবার সময় বাহানা ধরিলে। আমরা এখন তাড়াতাড়ি লোক কোথায় খুঁজিয়া পাই। আমাদের কাজ চলিবে কী করিয়া।

কমলার অনুনয়-বিনয় সমস্ত ব্যর্থ হইল—কমলা তাহার ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া ভগবানকে ডাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

৫৩

যে-দিন সন্ধ্যার সময় নলিনাক্ষের সহিত বিবাহ লইয়া হেমনলিনীর সঙ্গে অন্নদাবাবুর আলোচনা হইয়াছিল, সেইদিন রাত্রেই অন্নদাবাবুর আবার সেই শূলবেদনা দেখা দিল।

রাত্রিটা কষ্টে কাটিয়া গেল। প্রাতঃকালে তাঁহার বেদনার উপশম হইলে তিনি তাঁহার বাড়ির বাগানে রাস্তার নিকটে শীতপ্রভাতের

তরুণ সূর্যালোকে সম্মুখে একটি টিপাই লইয়া বসিয়াছেন— হেমনলিনী সেইখানেই তাঁহাকে চা খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিতেছে। গত রাত্রের কষ্টে অন্নদাবাবুর মুখ বিবর্ণ ও শীর্ণ হইয়া গেছে, তাঁহার চোখের নিচে কালি পড়িয়াছে, মনে হইতেছে, যেন এক রাত্রির মধ্যেই তাঁহার বয়স অনেক বাড়িয়া গেছে।

যখনি অন্নদাবাবুর এই ক্লিষ্ট মুখের প্রতি হেমনলিনীর চোখ পড়িতেছে, তখনি তাহার বুকের মধ্যে যেন ছুরি বিঁধিতেছে। নলিনাক্ষের সহিত বিবাহে হেমনলিনীর অসম্মতিতেই যে বৃদ্ধ ব্যথিত হইয়াছেন, আর তাঁহার সেই মনোবেদনাই যে তাঁহার পীড়ার অব্যবহিত কারণ, ইহা হেমনলিনীর পক্ষে একান্ত পরিতাপের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে; সে যে কী করিবে, কী করিলে বৃদ্ধ পিতাকে সান্ত্বনা দিতে পারিবে, তাহা বার বার করিয়া ভাবিয়া কোনোমতেই স্থির করিতে পারিতেছিল না।

এমন সময় হঠাৎ খুড়াকে লইয়া অক্ষয় সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। হেমনলিনী তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই অক্ষয় কহিল, "আপনি যাইবেন না, ইনি গাজিপুরের চক্রবর্তীমহাশয়, ইহাকে পশ্চিম-অঞ্চলের সকলেই জানে— আপনাদের সঙ্গে ইহার বিশেষ কথা আছে।"

সেই জায়গাটাতে বাঁধানো চাতালের মতো ছিল— সেইখানে খুড়া আর অক্ষয় বসিলেন।

খুড়া কহিলেন, "শুনিলাম, রমেশবাবুর সঙ্গে আপনাদের বিশেষ বন্ধুত্ব আছে— আমি তাই জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি, তাঁহার স্ত্রীর খবর কি আপনারা কিছু পাইয়াছেন।"

অন্নদাবাবু ক্ষণকাল অবাক হইয়া রহিলেন, তাহার পরে কহিলেন, "রমেশবাবুর স্ত্রী!"

হেমনলিনী চক্ষু নত করিয়া রহিল। চক্রবর্তী কহিলেন, "মা, তোমরা আমাকে বোধ করি নিতান্ত সেকেলে অসভ্য মনে করিতেছ। একটু ধৈর্য ধরিয়া সমস্ত কথা শুনিলেই বুঝিতে পারিবে, আমি খামকা গায়ে পড়িয়া পরের কথা লইয়া তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করিতে আসি নাই। রমেশবাবু পূজার সময় তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া স্টীমারে করিয়া যখন পশ্চিমে যাত্রা করিয়াছিলেন, সেই সময়ে সেই স্টীমারেই তাঁহাদের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। আপনারা তো জানেন, কমলাকে যে একবার দেখিয়াছে, সে তাহাকে কখনো পর বলিয়া মনে করিতে পারে না। আমার এই বুড়াবয়সে অনেক শোকতাপ পাইয়া হৃদয় কঠিন হইয়া গেছে, কিন্তু আমার সেই মা-লক্ষ্মীকে তো কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছি না। রমেশবাবু কোথায় যাইবেন, কিছুই ঠিক করেন নাই— কিন্তু এই বুড়াকে দুই দিন দেখিয়াই মা কমলার এমনি স্নেহ জন্মিয়া গিয়াছিল যে, তিনি রমেশবাবুকে গাজিপুরে আমার বাড়িতেই উঠিতে রাজি করেন। সেখানে কমলা, আমার মেজো মেয়ে শৈলর কাছে আপন বোনের চেয়ে যত্নে ছিল। কিন্তু কী যে হইল, কিছুই বলিতে পারি না— মা যে কেন আমাদের সকলকে এমন করিয়া কাঁদাইয়া হঠাৎ চলিয়া গেলেন, তাহা আজ পর্যন্ত ভাবিয়া পাইলাম না। সেই অবধি শৈলর চোখের জল আর কিছুতেই শুকাইতেছে না।"

বলিতে বলিতে চক্রবর্তীর দুই চোখ বাহিয়া জল পড়িতে লাগিল। অন্নদাবাবু ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন— কহিলেন, "তাঁহার কী হইল, তিনি কোথায় গেলেন?"

খুড়া কহিলেন, "অক্ষয়বাবু, আপনি তো সকল কথা শুনিয়াছেন, আপনিই বলুন। বলিতে গেলে আমার বুক ফাটিয়া যায়।"

অক্ষয় আদ্যোপান্ত সমস্ত ব্যাপারটি বিস্তারিত করিয়া বর্ণনা করিল।

নিজে কোনোপ্রকার টীকা করিল না, কিন্তু তাহার বর্ণনায় রমেশের চরিত্রটি রমণীয় হইয়া ফুটিয়া উঠিল না।

অন্নদাবাবু বার বার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমরা তো এ-সমস্ত কথা কিছুই শুনি নাই। রমেশ যে-দিন হইতে কলিকাতার বাহির হইয়াছেন, তাঁহার একখানি পত্রও পাই নাই।"

অক্ষয় সেই সঙ্গে যোগ দিল— "এমন কি, তিনি যে কমলাকে বিবাহ করিয়াছেন, এ-কথাও আমরা নিশ্চয় জানিতাম না। আচ্ছা চক্রবর্তী-মহাশয়, আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, কমলা রমেশের স্ত্রী তো বটেন? ভগ্নী বা আর কোনো আত্মীয়া তো নহেন?"

চক্রবর্তী কহিলেন, "আপনি বলেন কী অক্ষয়বাবু। স্ত্রী নহেন তো কী। এমন সতীলক্ষ্মী স্ত্রী কয়জনের ভাগ্যে জোটে?"

অক্ষয় কহিল, "কিন্তু আশ্চর্য এই যে, স্ত্রী যত ভালো হয়, তাহার অনাদরও তত বেশি হইয়া থাকে। ভগবান ভালো লোকদিগকেই বোধ করি সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষায় ফেলেন।" এই বলিয়া অক্ষয় একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

অন্নদা তাঁহার বিরল কেশরাজির মধ্যে অঙ্গুলিচালনা করিতে করিতে বলিলেন, "বড়ো দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু যাহা হইবার তা তো হইয়াই গেছে, এখন আর বৃথা শোক করিয়া ফল কী।"

অক্ষয় কহিল, "আমার মনে সন্দেহ হইল, যদি এমন হয়, কমলা আত্মহত্যা না করিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়া থাকেন। তাই চক্রবর্তীমহাশয়কে লইয়া কাশীতে একবার সন্ধান করিতে আসিলাম। বেশ বুঝা যাইতেছে, আপনারা কোনো খবরই পান নাই। যাহা হউক দু-চার দিন এখানে তল্লাশ করিয়া দেখা যাক।"

অন্নদাবাবু কহিলেন, "রমেশ এখন কোথায় আছেন?"

খুড়া কহিলেন, “তিনি তো আমাদিগকে কিছু না বলিয়াই চলিয়া গেছেন।”

অক্ষয় কহিল, “আমার সঙ্গে দেখা হয় নাই, কিন্তু লোকের মুখে শুনিলাম, তিনি কলিকাতাতেই গেছেন। বোধ করি আলিপুরে প্র্যাকটিস করিবেন। মানুষ তো আর অনন্তকাল শোক করিয়া কাটাইতে পারে না, বিশেষত তাঁহার অল্পবয়স। চক্রবর্তীমহাশয়, চলুন, শহরে একবার ভালো করিয়া খোঁজ করিয়া দেখা যাক।”

অন্নদাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “অক্ষয়, তুমি তো এইখানেই আসিতেছ?”

অক্ষয় কহিল, “ঠিক বলিতে পারি না। আমার মনটা বড়োই খারাপ হইয়া আছে অন্নদাবাবু। যতদিন কাশীতে আছি, আমাকে এই খোঁজেই থাকিতে হইবে। বলেন কী, ভদ্রলোকের মেয়ে, যদিই তিনি মনের দুঃখে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়া থাকেন, তবে আজ কী বিপদেই পড়িয়াছেন বলুন দেখি। রমেশবাবু দিব্য নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু আমি তো পারি না।”

খুড়াকে সঙ্গে লইয়া অক্ষয় চলিয়া গেল।

অন্নদাবাবু অত্যন্ত উদ্‌বিগ্ন হইয়া একবার হেমনলিনীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। হেমনলিনী প্রাণপণে নিজেকে সংযত করিয়া বসিয়াছিল। সে জানিত, তাহার পিতা মনে মনে তাহার জন্য আশঙ্কা অনুভব করিতেছেন।

হেমনলিনী কহিল, “বাবা, আজ একবার ডাক্তারকে দিয়া তোমার শরীরটা ভালো করিয়া পরীক্ষা করাও। একটুতেই তোমার স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায়, ইহার একটা প্রতিকার করা উচিত।”

অন্নদাবাবু মনে মনে অত্যন্ত আরাম অনুভব করিলেন। রমেশকে

লইয়া এতবড়ো আলোচনাটার পর হেমনলিনী যে তাঁহার পীড়া লইয়া উদ্‌বেগ প্রকাশ করিল, ইহাতে তাঁহার মনের মধ্য হইতে একটা ভার নামিয়া গেল। অন্য সময় হইলে তিনি নিজের পীড়ার প্রসঙ্গ উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিতেন— আজ কহিলেন, "সে তো বেশ কথা। শরীরটা না হয় পরীক্ষা করানোই যাক। তাহা হইলে আজ না হয় একবার নলিনাক্ষকে ডাকিতে পাঠাই। কী বল।"

নলিনাক্ষ সম্বন্ধে হেমনলিনী একটুখানি সংকোচে পড়িয়া গেছে। পিতার সম্মুখে তাহার সহিত পূর্বের ন্যায় সহজভাবে মেলা তাহার পক্ষে কঠিন হইবে, তবু সে বলিল, "সেই ভালো, তাঁহাকে ডাকিতে লোক পাঠাইয়া দিই।"

অন্নদাবাবু হেমের অবিচলিত ভাব দেখিয়া ক্রমে সাহস পাইয়া কহিলেন, "হেম, রমেশের এই সমস্ত কাণ্ড—"

হেমনলিনী তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বাধা দিয়া কহিল, "বাবা, রৌদ্রের ঝাঁজ বাড়িয়া উঠিয়াছে— চলো, এখন ঘরে চলো।" বলিয়া তাঁহাকে আপত্তি করিবার অবসর না দিয়া হাত ধরিয়া ঘরে টানিয়া লইয়া গেল। সেখানে তাঁহাকে আরামকেদারায় বসাইয়া তাঁহার গায়ে বেশ করিয়া গরম কাপড় জড়াইয়া দিয়া তাঁহার হাতে একখানি খবরের কাগজ দিল এবং চশমার খাপ্‌ হইতে চশমাটি বাহির করিয়া নিজে তাঁহার চোখে পরাইয়া দিয়া কহিল, "কাগজ পড়ো, আমি আসিতেছি।"

অন্নদাবাবু সুবাধ্য বালকের মতো হেমনলিনীর আদেশ পালন করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোনোমতেই মনোনিবেশ করিতে পারিলেন না। হেমনলিনীর জন্য তাঁহার মন উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে এক সময় কাগজ রাখিয়া হেমের খোঁজ করিতে গেলেন— দেখিলেন, সেই প্রাতে অসময়ে তাহার ঘরের দরজা বন্ধ।

কিছু না বলিয়া অন্নদাবাবু বারান্দায় পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে আবার একবার হেমনলিনীকে খুঁজিতে গিয়া দেখিলেন, তখনো তাহার দরজা বন্ধ রহিয়াছে। তখন শ্রান্ত অন্নদাবাবু ধপ করিয়া তাঁহার চৌকিটার উপর বসিয়া পড়িয়া মুহুর্মুহু মাথার চুলগুলাকে করসঞ্চালনদ্বারা উচ্ছৃঙ্খল করিয়া তুলিতে লাগিলেন।

নলিনাক্ষ আসিয়া অন্নদাবাবুকে পরীক্ষা করিয়া দেখিল এবং যথাকর্তব্য বলিয়া দিল, এবং হেমকে জিজ্ঞাসা করিল, "অন্নদাবাবুর মনে কি বিশেষ কোনো উদ্‌বেগ আছে।" হেম কহিল, "তা থাকিতে পারে।"

নলিনাক্ষ কহিল, "যদি সম্ভব হয়, উঁহার মনের সম্পূর্ণ বিশ্রাম আবশ্যক; আমার মার সম্বন্ধেও ওই এক মুশকিলে পড়িয়াছি— তিনি একটুতেই এমনি ব্যস্ত হইয়া পড়েন যে, তাঁহার শরীর সুস্থ রাখা শক্ত হইয়া পড়িয়াছে। সামান্য কী-একটা চিন্তা লইয়া কাল বোধ হয় সমস্ত রাত্রি তিনি ঘুমাইতে পারেন নাই। আমি চেষ্টা করি যাহাতে তিনি কিছুমাত্র বিচলিত না হন, কিন্তু সংসারে থাকিতে গেলে তাহা কোনো-মতেই সম্ভবপর হয় না।"

হেমনলিনী কহিল, "আপনাকেও আজ তেমন ভালো দেখাইতেছে না।"

নলিনাক্ষ। না, আমি বেশ ভালোই আছি। মন্দ থাকা আমার অভ্যাস নয়। তবে কাল বোধ হয় কিছু রাত জাগিতে হইয়াছিল বলিয়া আজ আমাকে তাজা দেখাইতেছে না।

হেমনলিনী। আপনার মাকে সেবা করিবার জন্য সর্বদা যদি একটি স্ত্রীলোক তাঁহার কাছে থাকিত, তবে বোধ হয় ভালো হইত।

আপনি একলা, আপনার কাজকর্ম আছে, কী করিয়া আপনি উঁহার শুশ্রূষা করিয়া উঠিবেন।

এ-কথাটা হেমনলিনী সহজভাবেই বলিয়াছিল, কথাটা সংগত, সে-বিষয়েও কোনো সন্দেহ নাই— কিন্তু বলার পরেই হঠাৎ তাহাকে লজ্জা আক্রমণ করিল, তাহার মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল— তাহার সহসা মনে হইল, নলিনাক্ষবাবু যদি কিছু মনে করেন। অকস্মাৎ হেমনলিনীর এই লজ্জার আবির্ভাব দেখিয়া নলিনাক্ষও তাহার মার প্রস্তাবের কথা মনে না করিয়া থাকিতে পারিল না।

হেমনলিনী তাড়াতাড়ি সারিয়া লইয়া কহিল, "উঁহার কাছে একজন ঝি রাখিলে ভালো হয় না?"

নলিনাক্ষ কহিল, "অনেকবার চেষ্টা করিয়াছি, মা কিছুতেই রাজি হন না। তিনি শুদ্ধাচার সম্বন্ধে অত্যন্ত সতর্ক বলিয়া মাহিনা-করা লোকের কাজে তাঁহার শ্রদ্ধা হয় না। তা ছাড়া, তাঁহার স্বভাব এমন যে, কেহ যে দায়ে পড়িয়া তাঁহার সেবা করিতেছে, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারেন না।"

ইহার পরে এ-সম্বন্ধে হেমনলিনীর আর-কোনো কথা চলিল না। সে একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "আপনার উপদেশমতে চলিতে চলিতে মাঝে মাঝে এক-একবার বাধা আসিয়া উপস্থিত হয়, আবার আমি পিছাইয়া পড়ি। আমার ভয় হয়, আমার যেন কোনো আশা নাই। আমার কি কোনোদিন মনের একটা স্থিতি হইবে না— আমাকে কি কেবলই বাহিরের আঘাতে অস্থির হইয়া বেড়াইতে হইবে।"

হেমনলিনীর এই কাতর আবেদনে নলিনাক্ষ একটু চিন্তিত হইয়া

কহিল, "দেখুন, বিঘ্ন আমাদের হৃদয়ের সমস্ত শক্তিকে জাগ্রত করিয়া দিবার জন্যই উপস্থিত হয়। আপনি হতাশ হইবেন না।"

হেমনলিনী কহিল, "কাল সকালে আপনি একবার আসিতে পারিবেন? আপনার সহায়তা পাইলে আমি অনেকটা বল লাভ করি।"

নলিনাক্ষের মুখে এবং কণ্ঠস্বরে যে একটি অবিচলিত শান্তির ভাব আছে, তাহাতে হেমনলিনী যেন একটা আশ্রয় পায়। নলিনাক্ষ চলিয়া গেল, কিন্তু হেমনলিনীর মনের মধ্যে একটা সান্ত্বনার স্পর্শ রাখিয়া গেল। সে তাহার শয়নগৃহের সম্মুখের বারান্দায় দাঁড়াইয়া একবার শীত-রৌদ্রালোকিত বাহিরের দিকে চাহিল। তাহার চারিদিকে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে সেই রমণীয় মধ্যাহ্নে কর্মের সহিত বিরাম, শক্তির সহিত শান্তি, উদ্‌যোগের সহিত বৈরাগ্য একসঙ্গে বিরাজ করিতেছিল, সেই বৃহৎ ভাবের ক্রোড়ে সে আপনার ব্যথিত হৃদয়কে সমর্পণ করিয়া দিল—তখন সূর্যালোক এবং উন্মুক্ত উজ্জ্বল নীলাম্বর তাহার অন্তঃকরণের মধ্যে জগতের নিত্য-উচ্চারিত সুগভীর আশীর্বচন প্রেরণ করিবার অবকাশ লাভ করিল।

হেমনলিনী নলিনাক্ষের মার কথা ভাবিতে লাগিল। কী চিন্তা লইয়া তিনি ব্যাপৃত আছেন, তিনি কেন যে রাত্রে ঘুমাইতে পারিতেছেন না, তাহা হেমনলিনী বুঝিতে পারিল। নলিনাক্ষের সহিত তাহার বিবাহ-প্রস্তাবের প্রথম আঘাত, প্রথম সংকোচ কাটিয়া গেছে। নলিনাক্ষের প্রতি হেমনলিনীর একান্ত নির্ভরপর ভক্তি ক্রমেই বাড়িয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু ইহার মধ্যে ভালোবাসার বিদ্যুৎসঞ্চারময়ী বেদনা নাই— তা নাই থাকিল। ওই আত্মপ্রতিষ্ঠ নলিনাক্ষ যে কোনো স্ত্রীলোকের ভালোবাসার অপেক্ষা রাখে, তাহা তো মনেই হয় না। তবু

সেবার প্রয়োজন তো সকলেরই আছে। নলিনাক্ষের মাতা পীড়িত এবং প্রাচীন— নলিনাক্ষকে কে দেখিবে। এ-সংসারে নলিনাক্ষের জীবন তো অনাদরের সামগ্রী নহে— এমন লোকের সেবা ভক্তির সেবাই হওয়া চাই।

আজ প্রভাতে হেমনলিনী রমেশের জীবন-ইতিবৃত্তের যে একাংশ শুনিয়াছে, তাহাতে তাহার মর্মের মাঝখানে এমন একটা প্রচণ্ড আঘাত লাগিয়াছে যে, এই নিদারুণ আঘাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তাহার সমস্ত মনের সমস্ত শক্তি আজ উদ্যত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ এমন অবস্থা আসিয়াছে যে, রমেশের জন্য বেদনা বোধ করা তাহার পক্ষে লজ্জাকর। সে রমেশকে বিচার করিয়া অপরাধী করিতেও চায় না। পৃথিবীতে কত শতসহস্র লোক ভালোমন্দ কত কী কাজে লিপ্ত রহিয়াছে, সংসারচক্র চলিতেছে— হেমনলিনী তাহার বিচারভার লয় নাই। রমেশের কথা হেমনলিনী মনেও আনিতে ইচ্ছা করে না। মাঝে মাঝে আত্মঘাতিনী কমলার কথা কল্পনা করিয়া তাহার শরীর শিহরিয়া উঠে— তাহার মনে হইতে থাকে, এই হতভাগিনীর আত্মহত্যার সঙ্গে আমার কি কোনো সংস্রব আছে। তখন লজ্জায়, ঘৃণায়, করুণায় তাহার সমস্ত হৃদয় মথিত হইতে থাকে। সে জোড়হাত করিয়া বলে, "হে ঈশ্বর, আমি তো অপরাধ করি নাই, তবে আমি কেন এমন করিয়া জড়িত হইলাম। আমার এ-বন্ধন মোচন করো, একেবারে ছিন্ন করিয়া দাও। আমি আর-কিছুই চাই না, আমাকে তোমার এই জগতে সহজভাবে বাঁচিয়া থাকিতে দাও।"

রমেশ ও কমলার ঘটনা শুনিয়া হেমনলিনী কী মনে করিতেছে, তাহা জানিবার জন্য অন্নদাবাবু উৎসুক হইয়া আছেন— অথচ কথাটা স্পষ্ট করিয়া পাড়িতে তাঁহার সাহস হইতেছে না। হেমনলিনী বারান্দায়

চুপ করিয়া বসিয়া সেলাই করিতেছিল, সেখানে এক-একবার গিয়া হেমনলিনীর চিন্তারত মুখের দিকে চাহিয়া তিনি ফিরিয়া আসিয়াছেন।

সন্ধ্যার সময় ডাক্তারের উপদেশমতো অন্নদাবাবুকে জারকচূর্ণমিশ্রিত দুগ্ধ পান করাইয়া হেমনলিনী তাঁহার কাছে বসিল।

অন্নদাবাবু কহিলেন, "আলোটা চোখের সামনে হইতে সরাইয়া দাও।"

ঘর একটু অন্ধকার হইলে অন্নদাবাবু কহিলেন, "সকালবেলায় যে-বৃদ্ধটি আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া বেশ সরল বোধ হইল।"

হেমনলিনী এই প্রসঙ্গ লইয়া কোনো কথা কহিল না— চুপ করিয়া রহিল। অন্নদাবাবু আর অধিক ভূমিকা বানাইতে পারিলেন না। তিনি কহিলেন, "রমেশের ব্যাপার শুনিয়া আমি কিন্তু আশ্চর্য হইয়া গেছি— লোকে তাহার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছে,— আমি আজ পর্যন্ত তাহা বিশ্বাস করি নাই— কিন্তু আর তো—"

হেমনলিনী কাতর কণ্ঠে কহিল, "বাবা, ও-সকল কথার আলোচনা থাক্।"

অন্নদাবাবু কহিলেন, "মা, আলোচনা করিতে তো ইচ্ছা করেই না। কিন্তু বিধির বিপাকে অকস্মাৎ এক-একজন লোকের সঙ্গে আমাদের সুখদুঃখ জড়িত হইয়া যায়, তখন তাহার কোনো আচরণকে আর উপেক্ষা করিবার জো থাকে না।"

হেমনলিনী সবেগে বলিয়া উঠিল, "না না, সুখদুঃখের গ্রন্থি অমন করিয়া যেখানে-সেখানে কেন জড়িত হইতে দিব। বাবা, আমি বেশ আছি— আমার জন্য বৃথা উদ্‌বিগ্ন হইয়া আমাকে লজ্জা দিয়ো না।"

অন্নদাবাবু কহিলেন, "মা হেম, আমার বয়স হইয়াছে, এখন তোমার

একটা স্থিতি না করিয়া তো আমার মন স্থির হইতে পারে না। তোমাকে এমন তপস্বিনীর মতো কি আমি রাখিয়া যাইতে পারি।"

হেমনলিনী চুপ করিয়া রহিল। অন্নদাবাবু কহিলেন, "দেখো মা, পৃথিবীতে একটা আশা চূর্ণ হইল বলিয়াই যে আর-সমস্ত দুর্মূল্য জিনিসকে অগ্রাহ্য করিতে হইবে, এমন কোনো কথা নাই। তোমার জীবন কিসে সুখী হইবে, সার্থক হইবে আজ হয়তো মনের ক্ষোভে তাহা তুমি না জানিতেও পার— কিন্তু আমি নিয়ত তোমার মঙ্গলচিন্তা করি—আমি জানি তোমার কিসে সুখ, কিসে মঙ্গল, আমার প্রস্তাবটাকে একেবারে উপেক্ষা করিয়ো না।"

হেমনলিনী দুই চোখ ছলছল করিয়া বলিয়া উঠিল, "অমন কথা বলিয়ো না, আমি তোমার কোনো কথাই উপেক্ষা করি না। তুমি যাহা আদেশ করিবে, আমি নিশ্চয় তাহা পালন করিব, কেবল একবার অন্তঃকরণটা পরিষ্কার করিয়া একবার ভালোরকম করিয়া প্রস্তুত হইয়া লইতে চাই।"

অন্নদাবাবু সেই অন্ধকারে একবার হেমনলিনীর অশ্রুসিক্ত মুখে হাত বুলাইয়া তাহার মস্তক স্পর্শ করিলেন। আর-কোনো কথা কহিলেন না।

পরদিন সকালে যখন অন্নদাবাবু হেমনলিনীকে লইয়া বাহিরে গাছের তলায় চা খাইতে বসিয়াছেন, তখন অক্ষয় আসিয়া উপস্থিত হইল। অন্নদাবাবু নীরব প্রশ্নের সহিত তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। অক্ষয় কহিল, "এখনো কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না।" এই বলিয়া এক পেয়ালা চা লইয়া সে সেখানে বসিয়া গেল।

আস্তে আস্তে কথা তুলিল, "রমেশবাবু ও কমলার জিনিসপত্র কিছু-কিছু চক্রবর্তীমহাশয়ের ওখানে রহিয়া গেছে, সেগুলি তিনি কোথায়

কাহার কাছে পাঠাইবেন, তাই ভাবিতেছেন। রমেশবাবু নিশ্চয়ই আপনাদের ঠিকানা বাহির করিয়া শীঘ্রই এখানে আসিবেন, তাই আপনাদের এখানে যদি—"

অন্নদাবাবু হঠাৎ অত্যন্ত রাগ করিয়া উঠিয়া কহিলেন, "অক্ষয়, তোমার কাণ্ডজ্ঞান কিছুমাত্র নাই। রমেশ আমার এখানেই বা কেন আসিবে, আর তাহার জিনিসপত্র আমিই বা কেন রাখিতে যাইব।"

অক্ষয় কহিল, "যা হোক, অন্যায় করুন আর ভুল করুন, রমেশবাবু এখন নিশ্চয়ই অনুতপ্ত হইয়াছেন, এ-সময়ে কি তাঁহাকে সান্ত্বনা দেওয়া তাঁহার পুরাতন বন্ধুদের কর্তব্য নয়। তাঁহাকে কি একেবারেই পরিত্যাগ করিতে হইবে।"

অন্নদাবাবু কহিলেন, "অক্ষয়, তুমি কেবল আমাদের পীড়ন করিবার জন্য এই কথাটা লইয়া বার বার আন্দোলন করিতেছ। আমি তোমাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতেছি, এ-প্রসঙ্গ তুমি আমাদের কাছে কখনোই তুলিয়ো না।"

হেমনলিনী স্নিগ্ধস্বরে বলিল, "বাবা, তুমি রাগ করিয়ো না, তোমার অসুখ করিবে— অক্ষয়বাবু যাহা বলিতে চান, বলুন না, তাহাতে দোষ কী।"

অক্ষয় কহিল, "না না, আমাকে মাপ করিবেন, আমি ঠিক বুঝিতে পারি নাই।"

৫৪

মুকুন্দবাবু সপরিজনে কাশী ত্যাগ করিয়া মিরাটে যাইবেন, স্থির হইয়া গেছে। জিনিসপত্র বাঁধা হইয়াছে, কাল প্রভাতেই ছাড়িতে হইবে।

কমলা নিতান্ত আশা করিয়াছিল, ইতিমধ্যে এমন একটা-কিছু ঘটনা ঘটিবে, যাহাতে তাহাদের যাওয়া বন্ধ হইবে। ইহাও সে একান্তমনে আশা করিয়াছিল যে নলিনাক্ষ ডাক্তার হয়তো আর দুই-একবার তাঁহার রোগীকে দেখিতে আসিবেন। কিন্তু দুয়ের কোনোটাই ঘটিল না।

পাছে বামুনঠাকরুন যাত্রার উদ্‌যোগের গোলেমালে পালাইয়া যাইবার অবকাশ পায়, এই আশঙ্কায় নবীনকালী তাহাকে কয়দিন সর্বদাই কাছে কাছে রাখিয়াছেন—তাহাকে দিয়াই জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদার অনেক কাজ করাইয়া লইয়াছেন।

কমলা একান্তমনে কামনা করিতে লাগিল, আজ রাত্রির মধ্যে তাহার এমন একটা কঠিন পীড়া হয় যে, তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাওয়া নবীনকালীর পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে। সেই গুরুতর পীড়ার চিকিৎসাভার কোন্ ডাক্তারের উপর পড়িবে, তাহাও সে মনে মনে ভাবে নাই, এমন নহে। এই পীড়ায় যদি অবশেষে তাহার মৃত্যু ঘটে, তবে আসন্ন মৃত্যুকালে সেই চিকিৎসকের পায়ের ধুলা লইয়া সে মরিতে পারিবে, ইহাও সে চোখ বুজিয়া কল্পনা করিতেছিল।

রাত্রে নবীনকালী কমলাকে আপনার ঘরে লইয়া শুইলেন। পরদিন স্টেশনে যাইবার সময় নিজের গাড়ির মধ্যে তুলিয়া লইলেন। কর্তা মুকুন্দবাবু রেলগাড়িতে সেকেণ্ড ক্লাসে উঠিলেন— নবীনকালী বামুন-ঠাকরুনকে লইয়া ইণ্টারমীডিয়েটে স্ত্রীকক্ষে আশ্রয়লাভ করিলেন।

অবশেষে গাড়ি কাশী স্টেশন ছাড়িল— মত্ত হস্তী যেমন করিয়া লতা ছিঁড়িয়া লয়, তেমনি করিয়া রেলগাড়ি গর্জন করিতে করিতে কমলাকে ছিঁড়িয়া লইয়া চলিয়া গেল। কমলা ক্ষুধিত চক্ষে জানলা হইতে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। নবীনকালী কহিলেন, "বামুনঠাকরুন, পানের ডিপেটা কোথায় রাখিলে ?"

কমলা পানের ডিপেটা বাহির করিয়া দিল। ডিপে খুলিয়া নবীন-কালী কহিলেন, "এই দেখো, যা ভাবিয়াছিলাম, তাই হইয়াছে। চুনের কৌটোটা ফেলিয়া আসিয়াছ? এখন আমি করি কী। যেটি আমি নিজে না দেখিব, সেটিতে একটা-না-একটা গলদ হইয়া আছেই। এ কিন্তু বামুনঠাকরুন তুমি শয়তানি করিয়া করিয়াছ। কেবল আমাকে জব্দ করিবার মতলবে। ইচ্ছা করিয়া আমাদের হাড় জ্বালাইতেছ। আজ তরকারিতে নুন নাই, কাল পায়সে ধরাগন্ধ— মনে করিতেছ, এ-সমস্ত চালাকি আমরা বুঝি না। আচ্ছা, চলো মিরাটে, তারপরে দেখা যাইবে তুমিই বা কে, আর আমিই বা কে।"

গাড়ি যখন পুলের উপর দিয়া চলিল, কমলা জানলা হইতে মুখ বাড়াইয়া গঙ্গা-তীরবর্তী কাশী শহরটা একবার দেখিয়া লইল— ওই শহরের মধ্যে কোন্ দিকে যে নলিনাক্ষের বাড়ি, তাহা সে কিছুই জানে না। এইজন্য রেলগাড়ির দ্রুতধাবনের মধ্যে ঘাট, বাড়ি, মন্দিরচূড়া, যাহা-কিছু তাহার চক্ষে পড়িল, সমস্তই নলিনাক্ষের আবির্ভাবের দ্বারা মণ্ডিত হইয়া তাহার হৃদয়কে স্পর্শ করিল।

নবীনকালী কহিলেন, "ওগো, অত করিয়া ঝুঁকিয়া দেখিতেছ কী। তুমি তো পাখি নও— তোমার ডানা নাই যে উড়িয়া যাইবে।"

কাশীনগরীর চিত্র কোথায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। কমলা স্থিরনীরব হইয়া বসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল।

অবশেষে গাড়ি মোগলসরাইয়ে থামিল। কমলার কাছে স্টেশনের গোলমাল, লোকজনের ভিড়, সমস্তই ছায়ার মতো, স্বপ্নের মতো বোধ হইতে লাগিল। সে কলের পুতুলির মতো এক গাড়ি হইতে অন্য গাড়িতে উঠিল।

গাড়ি ছাড়িবার সময় হইয়া আসিতেছে, এমন সময় কমলা হঠাৎ

চমকিয়া উঠিয়া শুনিতে পাইল, তাহাকে কে পরিচিত কণ্ঠে "মা" বলিয়া ডাকিয়া উঠিয়াছে। কমলা প্ল্যাটফর্মের দিকে মুখ ফিরাইয়া দেখিল, উমেশ।

কমলার সমস্ত মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—কহিল, "কী রে উমেশ।"

উমেশ গাড়ির দরজা খুলিয়া দিল এবং মুহূর্তের মধ্যে কমলা নামিয়া পড়িল। উমেশ তৎক্ষণাৎ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া কমলার পায়ের ধুলা মাথায় তুলিয়া লইল। তাহার সমস্ত মুখ আকর্ণপ্রসারিত হাসিতে ভরিয়া গেল।

পরক্ষণেই গার্ড কামরার দরজা বন্ধ করিয়া দিল। নবীনকালী চেঁচামেচি করিতে লাগিলেন, "বামুনঠাকরুন করিতেছ কী। গাড়ি ছাড়িয়া দেয় যে। ওঠো, ওঠো।"

কমলার কানে সে-কথা পৌঁছিলই না। গাড়িও বাঁশি ফুঁকিয়া দিয়া গসগস শব্দে স্টেশন হইতে বাহির হইয়া গেল।

কমলা জিজ্ঞাসা করিল, "উমেশ, তুই কোথা হইতে আসিতেছিস।"

উমেশ কহিল, "গাজিপুর হইতে।"

কমলা জিজ্ঞাসা করিল, "সেখানে সকলে ভালো আছেন তো। খুড়ামশায়ের কী খবর।"

উমেশ কহিল, "তিনি ভালো আছেন।"

কমলা। আমার দিদি কেমন আছেন।

উমেশ। মা, তিনি তোমার জন্য কাঁদিয়া অনর্থ করিতেছেন।

তৎক্ষণাৎ কমলার দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিল, "উমি কেমন আছে রে। সে তার মাসীকে কি মাঝে মাঝে মনে করে।"

উমেশ কহিল, "তুমি তাহাকে যে একজোড়া গহনা দিয়া

আসিয়াছিলে, সেইটে না পরাইলে তাহাকে কোনোমতে দুধ খাওয়ানো যায় না। সেইটে পরিয়া সে দুই হাত ঘুরাইয়া বলিতে থাকে, 'মাসী গ-গ গেছে,' আর তার মার চোখ দিয়া জল পড়িতে থাকে।"

কমলা জিজ্ঞাসা করিল, "তুই এখানে কী করিতে আসিলি।"

উমেশ কহিল, "আমার গাজিপুরে ভালো লাগিতেছিল না, তাই আমি চলিয়া আসিয়াছি।"

কমলা। যাবি কোথায়।

উমেশ কহিল, "মা, তোমার সঙ্গে যাইব।"

কমলা কহিল, "আমার কাছে একটি পয়সাও নাই।"

উমেশ কহিল, "আমার কাছে আছে।"

কমলা। তুই কোথায় পেলি ?

উমেশ। সেই যে তুমি আমাকে পাঁচটা টাকা দিয়াছিলে, সে তো আমার খরচ হয় নাই।

বলিয়া গাঁট হইতে পাঁচটা টাকা বাহির করিয়া দেখাইল।

কমলা। তবে চল্ উমেশ, আমরা কাশী যাই, কী বলিস। তুই তো টিকিট করিতে পারিবি ?

উমেশ কহিল, "পারিব।" বলিয়া তখনি টিকিট কিনিয়া আনিল। গাড়ি প্রস্তুত ছিল, গাড়িতে কমলাকে উঠাইয়া দিল— কহিল, "মা, আমি পাশের কামরাতেই রহিলাম।"

কাশী স্টেশনে নামিয়া কমলা উমেশকে জিজ্ঞাসা করিল, "উমেশ, এখন কোথায় যাই বল্ দেখি।"

উমেশ কহিল, "মা, তুমি কিছুই ভাবিয়ো না— আমি তোমাকে ঠিক জায়গায় লইয়া যাইতেছি।"

কমলা। ঠিক জায়গা কী রে। তুই এখানকার কী জানিস বল্ দেখি।

উমেশ কহিল, "সব জানি। দেখো তো কোথায় লইয়া যাই।"

বলিয়া কমলাকে একটা ভাড়াটে গাড়িতে তুলিয়া দিয়া সে কোচ-বাক্সে চড়িয়া বসিল। একটা বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়াইলে উমেশ কহিল, "মা, এইখানে নামো।"

কমলা গাড়ি হইতে নামিয়া উমেশের অনুসরণ করিয়া বাড়িতে প্রবেশ করিতেই উমেশ ডাকিয়া উঠিল, "দাদামহাশয়, বাড়ি আছ তো?"

পাশের একটা ঘর হইতে সাড়া আসিল, "কে ও, উমেশ না কি। তুই কোথা থেকে এলি।"

পরক্ষণেই হুঁকা-হাতে স্বয়ং চক্রবর্তী-খুড়া আসিয়া উপস্থিত। উমেশ সমস্ত মুখ পরিপূর্ণ করিয়া নীরবে হাসিতে লাগিল। বিস্মিত কমলা ভূমিষ্ঠ হইয়া চক্রবর্তীকে প্রণাম করিল। খুড়ার খানিকক্ষণ মুখে আর কথা সরিল না; তিনি কী যে বলিবেন, হুঁকাটা কোন্খানে রাখিবেন, কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না। অবশেষে কমলার চিবুক ধরিয়া তাহার লজ্জিত নতমুখ একটুখানি উঠাইয়া কহিলেন, "মা আমার ফিরে এল, চলো চলো উপরে চলো।"

"ও শৈল, শৈল। দেখে যা কে এসেছে।"

শৈলজা তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় সিঁড়ির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কমলা তাহার পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিল। শৈল তাড়াতাড়ি তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া তাহার ললাট চুম্বন করিল। চোখের জলে দুই কপোল ভাসাইয়া দিয়া কহিল, "মা গো মা! আমাদের এমন করিয়াও কাঁদাইয়া যাইতে হয়।"

খুড়া কহিলেন, "ও-সব কথা থাক্ শৈল, এখন উহার নাওয়া খাওয়া সমস্ত ঠিক করিয়া দাও।"

এমন সময় উমা 'মাসী মাসী' করিয়া দুই হাত তুলিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। কমলা তৎক্ষণাৎ তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া বুকে চাপিয়া ধরিয়া চুমা খাইয়া খাইয়া, অস্থির করিয়া দিল।

শৈলজা কমলার রুক্ষ কেশ ও মলিন বস্ত্র দেখিয়া থাকিতে পারিল না। তাহাকে টানিয়া লইয়া গিয়া যত্ন করিয়া স্নান করাইল— নিজের ভালো কাপড় একখানি বাহির করিয়া তাহাকে পরাইয়া দিল। কহিল, "কাল রাত্রে বুঝি ভালো করিয়া ঘুম হয় নাই। চোখ বসিয়া গেছে যে। ততক্ষণ তুই বিছানায় একটু গড়াইয়া নে। আমি রান্না সারিয়া আসিতেছি।"

কমলা কহিল, "না দিদি, তোমার সঙ্গে, চলো, আমিও রান্নাঘরে যাই।"

দুই সখীতে একত্রে রাঁধিতে গেল।

চক্রবর্তী-খুড়া অক্ষয়ের পরামর্শে যখন কাশীতে আসিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন শৈলজা ধরিয়া পড়িল, "বাবা, আমিও তোমাদের সঙ্গে কাশী যাইব।"

খুড়া কহিলেন, "বিপিনের তো এখন ছুটি নাই।"

শৈল কহিল, "তা হোক, আমি একলাই যাইব। মা আছেন, উহার অসুবিধা হইবে না।"

স্বামীর সহিত এরূপ বিচ্ছেদের প্রস্তাব শৈল পূর্বে কোনোদিন করে নাই।

খুড়াকে রাজি হইতে হইল। গাজিপুর হইতে যাত্রা করিলেন।

কাশী স্টেশনে নামিয়া দেখেন, উমেশও গাড়ি হইতে নামিতেছে—

"আরে তুই এলি কেন রে।" সকলে যে কারণে আসিয়াছেন, তাহারও সেই একই কারণ। কিন্তু উমেশ আজকাল খুড়ার গৃহকার্যে নিযুক্ত হইয়াছে— সে এরূপ অকস্মাৎ চলিয়া আসিলে গৃহিণী অত্যন্ত রাগ করিবেন জানিয়া সকলে মিলিয়া অনেক চেষ্টা করিয়া উমেশকে গাজিপুরে ফিরাইয়া পাঠান। তাহার পরে কী ঘটিয়াছে, তাহা সকলেই জানেন। সে গাজিপুরে কোনোমতেই টিকিতে পারিল না। গৃহিণী তাহাকে বাজার করিতে পাঠাইয়াছিলেন, সেই বাজারের পয়সা লইয়া সে একেবারে গঙ্গা পার হইয়া স্টেশনে আসিয়া উপস্থিত। চক্রবর্তী-গৃহিণী সেদিন এই ছোকরাটির জন্য বৃথা অপেক্ষা করিয়াছিলেন।

৫৫

দিনের মধ্যে অক্ষয় এক সময় চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল। তিনি তাহাকে কমলার প্রত্যাবর্তনসম্বন্ধে কোনো কথাই বলিলেন না। রমেশের প্রতি অক্ষয়ের যে বিশেষ বন্ধুভাব নাই, তাহা খুড়া বুঝিতে পারিয়াছেন।

কমলা কেন চলিয়া গিয়াছিল, কোথায় চলিয়া গিয়াছিল, এ-সম্বন্ধে বাড়ির কেহ কোনো প্রশ্নই করিল না— কমলা যেন ইহাদের সঙ্গেই কাশী বেড়াইতে আসিয়াছে, এমনি ভাবে দিন কাটিয়া গেল। উমির দাই লছমনিয়া স্নেহমিশ্রিত ভর্ৎসনার ছলে কিছু বলিতে গিয়াছিল, খুড়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে আড়ালে ডাকিয়া শাসন করিয়া দিয়াছিলেন।

রাত্রে শৈলজা কমলাকে আপনার বিছানায় লইয়া শুইল। তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইল এবং দক্ষিণ হস্ত দিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। এই কোমল হস্তস্পর্শ

নীরব প্রশ্নের মতো কমলাকে তাহার গোপন বেদনার কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

কমলা কহিল, "দিদি, তোমরা কী মনে করিয়াছিলে। আমার উপরে রাগ কর নাই।"

শৈল কহিল, "আমাদের কি বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু নাই। আমরা কি এটা বুঝি নাই, সংসারে তোর যদি কোনো পথ থাকিত, তবে তুই এই ভয়ানক পথ লইতিস না। আমরা কেবল এই বলিয়া কাঁদিয়াছি, ভগবান তোকে কেন এমন সংকটে ফেলিলেন। যে-লোক কোনো অপরাধ করিতে জানে না, সেও দণ্ড পায়।"

কমলা কহিল, "দিদি, আমার সব কথা তুমি শুনিবে?"

শৈল স্নিগ্ধস্বরে কহিল, "শুনিব না তো কী বোন।"

কমলা। তখন যে তোমাকে কেন বলিতে পারি নাই, তাহা জানি না। তখন আমার কোনো কথা ভাবিয়া দেখিবার সময় ছিল না। হঠাৎ মাথায় এমন বজ্রাঘাত হইয়াছিল যে, লজ্জায় তোমাদের কাছে মুখ দেখাইতে পারিতেছিলাম না। সংসারে আমার মা-বোন কেহ নাই, দিদি, তুমি আমার মা-বোন দুই—তাই তোমার কাছে সব কথা বলিতেছি, নহিলে আমার যে-কথা, তাহা কাহারো কাছে বলিবার নয়।

কমলা আর শুইয়া থাকিতে পারিল না, উঠিয়া বসিল। শৈলও উঠিয়া তাহার সম্মুখে বসিল। সেই অন্ধকার বিছানার মধ্যে বসিয়া কমলা বিবাহ হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার জীবনের কাহিনী বলিতে লাগিল।

কমলা যখন বলিল, বিবাহের পূর্বে বা বিবাহের রাত্রে সে তাহার স্বামীকে দেখে নাই, তখন শৈল কহিল, "তোর মতো বোকা মেয়ে তো আমি দেখি নাই। তোর চেয়ে কম বয়সে আমার বিবাহ

হইয়াছিল— তুই কি মনে করিস, লজ্জায় আমি আমার বরকে কোনো সুযোগে দেখিয়া লই নাই।"

কমলা কহিল, "লজ্জা নয় দিদি। আমার বিবাহের বয়স প্রায় পার হইয়া গিয়াছিল। এমন সময়ে হঠাৎ যখন আমার বিবাহের কথা স্থির হইয়া গেল, তখন আমার সমস্ত সঙ্গিনীরা আমাকে বড়োই খ্যাপাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। অধিক বয়সে বরকে পাইয়া আমি যে সাত রাজার ধন মানিক পাই নাই, ইহাই দেখাইবার জন্য আমি তাঁহার দিকে দৃকপাতমাত্র করি নাই। এমন কি, তাঁহার জন্য কিছুমাত্র আগ্রহ মনের মধ্যেও অনুভব করা আমি নিতান্ত লজ্জার বিষয়, অগৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। আজ তাহারই শোধ দিতেছি।"

এই বলিয়া কমলা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পরে আরম্ভ করিল, "বিবাহের পর নৌকাডুবি হইয়া আমরা কী করিয়া রক্ষা পাইলাম, সে-কথা তো তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি। কিন্তু যখন বলিয়াছিলাম, তখনো জানিতাম না যে, মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়া যাঁহার হাতে পড়িলাম, যাঁহাকে স্বামী বলিয়া জানিলাম, তিনি আমার স্বামী নহেন।"

শৈলজা চমকিয়া উঠিল—তাড়াতাড়ি কমলার কাছে আসিয়া তাহার গলা ধরিয়া কহিল, "হায় রে পোড়াকপাল— ও তাই বটে। এতক্ষণে সব কথা বুঝিলাম। এমন সর্বনাশও ঘটে।"

কমলা কহিল, "বল্ দেখি দিদি, যখন মরিলেই চুকিয়া যাইত, তখন বিধাতা এমন বিপদ ঘটাইলেন কেন।"

শৈলজা জিজ্ঞাসা করিল, "রমেশবাবুও কিছু জানিতে পারেন নাই।"

কমলা কহিল, "বিবাহের কিছুকাল পরে তিনি একদিন আমাকে সুশীলা বলিয়া ডাকিতেছিলেন, আমি তাঁহাকে কহিলাম, 'আমার নাম

কমলা, তবু তোমরা সকলেই আমাকে সুশীলা বলিয়া ডাক কেন।' আমি এখন বুঝিতে পারিতেছি, সেইদিন তাঁহার ভুল ভাঙিয়াছিল। কিন্তু দিদি, সে-সকল দিনের কথা মনে করিতেও আমার মাথা হেঁট হইয়া যায়।" এই বলিয়া কমলা চুপ করিয়া রহিল।

শৈলজা একটু একটু করিয়া কথায় কথায় সমস্ত বৃত্তান্ত আগাগোড়া বাহির করিয়া লইল। সমস্ত কথা শোনা হইলে সে কহিল, "বোন্, তোর দুঃখের কপাল, কিন্তু আমি এই কথা ভাবিতেছি, ভাগ্যে তুই রমেশবাবুর হাতে পড়িয়াছিলি। যাই বলিস, বেচারা রমেশবাবুর কথা মনে করিলে বড়ো দুঃখ হয়। আজ রাত অনেক হইল, কমল, তুই আজ ঘুমো। ক-দিন রাত জাগিয়া কাঁদিয়া মুখ কালি হইয়া গেছে। এখন কী করিতে হইবে, কাল সব ঠিক করা যাইবে।"

রমেশের লিখিত সেই চিঠি কমলার কাছে ছিল। পরদিন সেই চিঠিখানি লইয়া শৈলজা তাহার পিতাকে নিভৃত ঘরে ডাকিয়া পাঠাইল এবং চিঠি তাঁহার হাতে দিল। খুড়া চশমা চোখে তুলিয়া অত্যন্ত ধীরে ধীরে পাঠ করিলেন, তাহার পরে চিঠি মুড়িয়া চশমা খুলিয়া কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাই তো, এখন কী কর্তব্য।"

শৈল কহিল, "বাবা, উমির কয়দিন হইতে সর্দিকাসি করিয়াছে, একবার নলিনাক্ষ ডাক্তারকে ডাকিয়া আনাও না। কাশীতে তাঁহার আর তাঁর মার তো খুব নাম শোনা যায়। একবার তাঁকে দেখিই না।"

রোগীকে দেখিবার জন্য ডাক্তার আসিল এবং ডাক্তারকে দেখিবার জন্য শৈল ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কহিল, "কমল, আয়, শীঘ্র আয়।"

নবীনকালীর বাড়ি যে-কমলা নলিনাক্ষকে দেখিবার ব্যগ্রতায় প্রায় আত্মবিস্মৃত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই কমলা আজ লজ্জায় উঠিতে চায় না।

শৈল কহিল, "দেখ্ পোড়ারমুখী, আমি তোকে বেশিক্ষণ সাধিব না, তা আমি বলিয়া রাখিতেছি— আমার সময় নাই— উমির ব্যামো কেবল নামমাত্র, ডাক্তার বেশিক্ষণ থাকিবে না— তোকে সাধাসাধি করিতে গিয়া মাঝে হইতে আমার দেখা হইবে না।"

এই বলিয়া কমলাকে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া শৈলজা দ্বারের অন্তরালে আসিয়া দাঁড়াইল। নলিনাক্ষ উমার বুক-পিঠ ভালো করিয়া পরীক্ষা করিয়া ওষুধ লিখিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

শৈল কমলাকে কহিল, "কমল, বিধাতা তোকে যতই দুঃখ দিন, তোর ভাগ্য ভালো। এখন দুই-একদিন বোন তোকে একটু ধৈর্য ধরিয়া থাকিতে হইবে— আমরা একটা ব্যবস্থা করিয়া দিতেছি। ইতিমধ্যে উমির জন্যে ঘন ঘন ডাক্তারের প্রয়োজন হইবে, অতএব নিতান্ত তোকে বঞ্চিত হইতে হইবে না।"

খুড়া একদিন এমন সময় বাছিয়া ডাক্তার ডাকিতে গেলেন, যখন নলিনাক্ষ বাড়িতে থাকে না। চাকর কহিল, "ডাক্তারবাবু নাই।" খুড়া কহিলেন, "মাঠাকরুন তো আছেন, তাঁহাকে একবার খবর দাও। বলো, একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহার সহিত দেখা করিতে চায়।"

উপরে ডাক পড়িল। খুড়া গিয়া কহিলেন, "মা, আপনার নাম কাশীতে বিখ্যাত। তাই আপনাকে দেখিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিতে আসিলাম। আমার আর-কোনো কামনা নাই। আমার একটি দৌহিত্রীর অসুখ, আপনার ছেলেকে ডাকিতে আসিয়াছিলাম, তিনি বাড়ি নাই— তাই মনে করিলাম, শুধু-শুধু ফিরিব না, একবার আপনাকে দর্শন করিয়া যাইব।"

ক্ষেমংকরী কহিলেন, "নলিন এখনি আসিবে, আপনি ততক্ষণ একটু

বসুন। বেলা নিতান্ত কম হয় নাই— আপনার জন্য কিছু জলখাবার আনাইয়া দিই।”

খুড়া কহিলেন, “আমি জানিতাম, আপনি আমাকে না খাওয়াইয়া ছাড়িবেন না— আমার যে ভোজনে বেশ একটুখানি শখ আছে, তাহা আমাকে দেখিলেই লোকে টের পায়— এবং সকলেই এ-বিষয়ে আমাকে একটু দয়াও করে।”

ক্ষেমংকরী খুড়াকে জল খাওয়াইয়া বড়ো খুশি হইলেন। কহিলেন, “কাল আমার এখানে আপনার মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ রহিল— আজ প্রস্তুত ছিলাম না, আপনাকে ভালো করিয়া খাওয়াইতে পারিলাম না।”

খুড়া কহিলেন, “যখনি প্রস্তুত হইবেন, এই ব্রাহ্মণকে স্মরণ করিবেন। আপনাদের বাড়ি হইতে আমি বেশি দূরে থাকি না। বলেন তো আপনার চাকরটাকে লইয়া আমার বাড়ি দেখাইয়া আসিব।”

এমনি করিয়া খুড়া দুই-চারিদিনের যাতায়াতেই নলিনাক্ষের বাড়িতে বেশ একটু জমাইয়া লইলেন।

ক্ষেমংকরী নলিনাক্ষকে ডাকিয়া কহিলেন, “ও নলিন, তুই চক্রবর্তী মশায়ের কাছ থেকে ভিজিট নিসনে যেন।”

খুড়া হাসিয়া কহিলেন, “মাতৃ-আজ্ঞা উনি পাইবার পূর্ব হইতেই পালন করিয়া আসিতেছেন— আমার কাছ হইতে উনি কিছুই নেন নাই। যাঁহারা দাতা, তাঁহারা গরিবকে দেখিলেই চিনিতে পারেন।”

দিন-দুয়েক পিতায় ও কন্যায় পরামর্শ চলিল। তাহার পরে একদিন সকালে খুড়া কমলাকে কহিল, “চলো মা, আমরা দশাশ্বমেধে স্নান করিতে যাই।”

কমলা শৈলকে কহিল, “দিদি, তুমিও চলো না।”

শৈল কহিল, “না ভাই, উমির শরীর তেমন ভালো নাই।”

খুড়া যে-পথ দিয়া স্নানের ঘাটে গেলেন, স্নানান্তে সে-পথ দিয়া না ফিরিয়া অন্য-এক রাস্তায় চলিলেন। কিছুদূর গিয়াই দেখিলেন, একটি প্রবীণা স্নান সারিয়া পট্টবস্ত্র পরিয়া ঘটিতে গঙ্গাজল লইয়া ধীরে ধীরে আসিতেছেন।

কমলাকে সম্মুখে আনিয়া খুড়া কহিলেন, "মা, ইহাকে প্রণাম করো, ইনি ডাক্তারবাবুর মাতা।"

কমলা শুনিয়া চকিত হইয়া উঠিয়া তৎক্ষণাৎ ক্ষেমংকরীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পায়ের ধুলা লইল।

ক্ষেমংকরী কহিলেন, "তুমি কে গা। দেখি দেখি, কী রূপ। যেন লক্ষ্মীটির প্রতিমা।" বলিয়া কমলার ঘোমটা সরাইয়া তাহার নতনেত্র মুখখানি ভালো করিয়া দেখিলেন। কহিলেন, "তোমার নাম কী বাছা।"

কমলা উত্তর করিবার পূর্বেই খুড়া কহিলেন, "ইহার নাম হরিদাসী। ইনি আমার দূরসম্পর্কের ভ্রাতুষ্পুত্রী। ইহার মা-বাপ কেহ নাই— আমার উপরেই নির্ভর।"

ক্ষেমংকরী কহিলেন, "আসুন না চক্রবর্তীমশায়, আমার বাড়িতেই আসুন।"

বাড়িতে লইয়া গিয়া ক্ষেমংকরী একবার নলিনাক্ষকে ডাকিলেন। নলিনাক্ষ তখন বাহির হইয়া গেছেন।

খুড়া আসন গ্রহণ করিলেন—কমলা মেজের উপরে বসিল। খুড়া কহিলেন, "দেখুন, আমার এই ভাইঝির ভাগ্য বড়ো মন্দ। বিবাহের পরদিনই ইহার স্বামী সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইয়া গেছেন— ইহার সঙ্গে আর দেখা-সাক্ষাৎ নাই। হরিদাসীর ইচ্ছা ধর্মকর্ম লইয়া তীর্থবাস করে —ধর্ম ছাড়া উহার সান্ত্বনার সামগ্রী আর তো কিছুই নাই। এখানে

আমার বাড়ি নয়, আমার চাকরি আছে— উপার্জন করিয়া আমাকে সংসার চালাইতে হয়। আমি যে এখানে আসিয়া ইহাকে লইয়া থাকিব, আমার এমন সুবিধা নাই। তাই আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। এটিকে আপনার মেয়ের মতো যদি কাছে রাখেন, তবে আমি বড়ো নিশ্চিন্ত হই। যখনি অসুবিধা বোধ করিবেন, গাজিপুরে আমার কাছে পাঠাইয়া দিবেন। কিন্তু আমি বলিতেছি, দুদিন ইহাকে কাছে রাখিলেই মেয়েটি কী রত্ন, তাহা বুঝিতে পারিবেন— তখন মুহূর্তের জন্য ছাড়িতে চাহিবেন না।”

ক্ষেমংকরী খুশি হইয়া কহিলেন, “আহা, এ তো ভালো কথা। এমন মেয়েটিকে আপনি যে আমার কাছে রাখিয়া যাইতেছেন—এ তো আমার মস্ত লাভ। আমি কতদিন রাস্তা হইতে পরের মেয়েকে বাড়িতে আনিয়া খাওয়াইয়া পরাইয়া আনন্দ করি, কিন্তু তাহাদের তো রাখিতে পারি না। তা হরিদাসী আমারই হইল—আপনি ইহার জন্য কিছুমাত্র ভাবিবেন না। আমার ছেলের কথা অবশ্য আপনারা পাঁচজনের কাছে শুনিয়া থাকিবেন— নলিনাক্ষ— সে বড়ো ভালো ছেলে। সে ছাড়া বাড়িতে আর-কেহ নাই।”

খুড়া কহিলেন, “নলিনাক্ষবাবুর নাম সকলেই জানে। তিনি এখানে আপনার কাছে থাকেন জানিয়া আমি আরও নিশ্চিন্ত। আমি শুনিয়াছি, বিবাহের পর দুর্ঘটনায় তাঁহার স্ত্রী জলে ডুবিয়া মারা যাওয়াতে তিনি সেই অবধি একরকম ব্রহ্মচারীর মতোই আছেন।”

ক্ষেমংকরী কহিলেন, “সে যাহা হইয়াছে হইয়াছে—ও-কথা আর তুলিবেন না—মনে করিলেও আমার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে।”

খুড়া কহিলেন, “যদি অনুমতি করেন, তবে মেয়েটিকে আপনার কাছে রাখিয়া এখন বিদায় হই। মাঝে মাঝে আসিয়া দেখিয়া যাইব।

ইহার একটি বড়ো বোন আছে— সেও আপনাকে প্রণাম করিতে আসিবে।”

খুড়া চলিয়া গেলে ক্ষেমংকরী কমলাকে কাছে টানিয়া লইয়া কহিলেন, “এসো তো মা, দেখি। তোমার বয়স তো বেশি নয়। আহা, তোমাকে ফেলিয়া যাইতে পারে, জগতে এমন পাষাণও আছে। আমি আশীর্বাদ করিতেছি, সে আবার ফিরিয়া আসিবে। বিধাতা এত রূপ কখনও বৃথা নষ্ট করিবার জন্য গড়েন নাই।” বলিয়া কমলার চিবুক স্পর্শ করিয়া অঙ্গুলির দ্বারা চুম্বন গ্রহণ করিলেন।

ক্ষেমংকরী কহিলেন, “এখানে তোমার সমবয়সী সঙ্গিনী কেহ নাই — একলা আমার কাছে থাকিতে পারিবে তো?”

কমলা তাহার তুই বড়ো বড়ো স্নিগ্ধ চক্ষে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করিয়া কহিল, “পারিব মা।”

ক্ষেমংকরী কহিলেন, “তোমার দিন কাটিবে কী করিয়া, আমি তাই ভাবিতেছি।”

কমলা কহিল, “আমি তোমার কাজ করিব।”

ক্ষেমংকরী। পোড়াকপাল। আমার আবার কাজ। সংসারে ওই তো আমার একটিমাত্র ছেলে— সেও সন্ন্যাসীর মতো থাকে— কখনো যদি বলিত ‘মা, এইটে আমার দরকার আছে, আমি এইটে খেতে চাই, আমি এইটে ভালোবাসি’, তবে আমি কত খুশি হইতাম— তাও কখনো বলে না। রোজগার ঢের করে, হাতে কিছুই রাখে না— কত সৎকাজে যে কতদিকে খরচ করে, তাহা কাহাকে জানিতেও দেয় না। দেখো বাছা, আমার কাছে যখন তোমাকে চব্বিশ ঘণ্টা থাকিতে হইবে, তখন এ-কথা আগে হইতেই বলিয়া রাখিতেছি, আমার মুখে আমার

ছেলের গুণগান বারবার শুনিয়া তোমার বিরক্ত ধরিবে— কিন্তু ওইটে তোমাকে সহ্য করিয়া যাইতে হইবে।

কমলা পুলকিতচিত্তে চক্ষু নত করিল।

ক্ষেমংকরী কহিলেন, "আমি তোমাকে কী কাজ দিব, তাই ভাবিতেছি। সেলাই করিতে জান ?"

কমলা কহিল, "ভালো জানি না, মা।"

ক্ষেমংকরী কহিলেন, "আচ্ছা, আমি তোমাকে সেলাই শিখাইয়া দিব।"

ক্ষেমংকরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "পড়িতে জান তো।"

কমলা কহিল, "হাঁ, জানি।"

ক্ষেমংকরী কহিলেন, "সে হইল ভালো। চোখে তো আর চশমা নহিলে দেখিতে পাই না— তুমি আমাকে পড়িয়া শুনাইতে পারিবে।"

কমলা কহিল, "আমি রাঁধাবাড়া-ঘরকন্নার কাজ সমস্ত শিখিয়াছি।"

ক্ষেমংকরী কহিলেন, "অমন অন্নপূর্ণার মতো চেহারা, তুমি যদি রাঁধাবাড়ার কাজ না জানিবে তো কে জানিবে। আজ পর্যন্ত নলিনকে আমি নিজে রাঁধিয়া খাওয়াইয়াছি— আমার অসুখ হইলে বরঞ্চ স্বপাক রাঁধিয়া খায়, তবু আর-কাহারও হাতে খায় না। এবার হইতে তোমার কল্যাণে তাহার স্বপাক খাওয়া আমি ঘোচাইব। আর অক্ষম হইয়া পড়িলে আমাকেও যদি চারটিখানি হবিষ্যান্ন রাঁধিয়া খাওয়াও তো আমার তাহাতে অনভিরুচি হইবে না। চলো মা, তোমাকে আমার ভাঁড়ার-ঘর, রান্নাঘর সমস্ত দেখাইয়া আনি।"

এই বলিয়া ক্ষেমংকরী তাঁহার ক্ষুদ্র ঘরকন্নার সমস্ত নেপথ্যগৃহ কমলাকে দেখাইলেন। কমলা ইতিমধ্যে একটা অবকাশ বুঝিয়া আস্তে

আস্তে আপনার দরখাস্ত জারি করিল। কহিল "মা,আমাকে আজকে রাঁধিতে দাও না।"

ক্ষেমংকরী একটুখানি হাসিলেন। কহিলেন, "গৃহিণীর রাজত্ব ভাঁড়ারে আর রান্নাঘরে— জীবনে অনেক জিনিস ছাড়িতে হইয়াছে— তবু ওটুকু সঙ্গে সঙ্গে লাগিয়াই আছে। তা মা, আজকের মতো তুমিই রাঁধো— দুই-চারিদিন যাক— ক্রমে সমস্ত ভার আপনিই তোমার হাতে পড়িবে— আমিও ভগবানে মন দিবার সময় পাইব। বন্ধন একেবারেই তো কাটে না— এখনো দুই-চারিদিন মন চঞ্চল হইয়া থাকিবে— ভাঁড়ার-ঘরের সিংহাসনটি কম নয়।"

এই বলিয়া ক্ষেমংকরী, কী রাঁধিতে হইবে, কী করিতে হইবে, কমলাকে সমস্ত উপদেশ দিয়া পূজাগৃহে চলিয়া গেলেন। ক্ষেমংকরীর কাছে আজ কমলার ঘরকন্নার পরীক্ষা আরম্ভ হইল।

কমলা তাহার স্বাভাবিক তৎপরতার সহিত রন্ধনের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত করিয়া, কোমরে আঁচল জড়াইয়া, মাথায় এলোচুল ঝুঁটি করিয়া লইয়া রাঁধিতে প্রবৃত্ত হইল।

নলিনাক্ষ বাহির হইতে বাড়িতে ফিরিলেই প্রথমে তাহার মাকে দেখিতে যাইত। তাহার মাতার স্বাস্থ্যসম্বন্ধে চিন্তা তাহাকে কখনোই ছাড়িত না। আজ বাড়িতে প্রবেশ করিবামাত্র রান্নাঘরের শব্দ এবং গন্ধ তাহাকে আক্রমণ করিল। মা এখন রান্নায় প্রবৃত্ত আছেন মনে করিয়া নলিনাক্ষ রান্নাঘরের দরজার সামনে আসিয়া উপস্থিত হইল।

পদশব্দে চকিত কমলা পিছন ফিরিয়া চাহিতেই একেবারে নলিনাক্ষের সহিত তাহার চোখে চোখে সাক্ষাৎ হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি হাতাটা রাখিয়া ঘোমটা টানিয়া দিবার বৃথা চেষ্টা করিল— কোমরে আঁচল জড়ানো ছিল— টানাটানি করিয়া ঘোমটা যখন মাথার কিনারায়

উঠিল, বিস্মিত নলিনাক্ষ তখন সেখান হইতে চলিয়া গেছে। তাহার পর কমলা যখন হাতা তুলিয়া লইল, তখন তাহার হাত কাঁপিতেছে।

পূজা সকাল-সকাল সারিয়া ক্ষেমংকরী যখন রান্নাঘরে গেলেন, দেখিলেন, রান্না সারা হইয়া গেছে। ঘর ধুইয়া কমলা পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছে— কোথাও পোড়াকাঠ বা তরকারির খোসা বা কোনো প্রকার অপরিচ্ছন্নতা নাই। দেখিয়া ক্ষেমংকরী মনে মনে খুশি হইলেন, কহিলেন, "মা, তুমি ব্রাহ্মণের মেয়ে বটে।"

নলিনাক্ষ আহারে বসিলে ক্ষেমংকরী তাহার সম্মুখে বসিলেন— আর-একটি সংকুচিত প্রাণী কান পাতিয়া দ্বারের আড়ালে দাঁড়াইয়া ছিল— উঁকি মারিতে সাহস করিতেছিল না—ভয়ে মরিয়া যাইতেছিল— পাছে তাহার রান্না খারাপ হইয়া থাকে।

ক্ষেমংকরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "নলিন, আজ রান্নাটা কেমন হইয়াছে।"

নলিনাক্ষ ভোজ্যপদার্থসম্বন্ধে সমজদার ছিল না, তাই ক্ষেমংকরী এরূপ অনাবশ্যক প্রশ্ন কখনো তাহাকে করিতেন না—আজ বিশেষ কৌতূহলবশতই জিজ্ঞাসা করিলেন।

নলিনাক্ষ যে অন্ধকার রান্নাঘরের নূতন রহস্যের পরিচয় পাইয়াছে তাহা তাহার মা জানিতেন না। ইদানীং মাতার শরীর খারাপ হওয়াতে নলিনাক্ষ রাঁধিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিতে মাকে অনেক পীড়াপীড়ি করিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে রাজি করিতে পারে নাই। আজ নূতন লোককে রন্ধনে নিযুক্ত দেখিয়া সে মনে মনে খুশি হইয়াছে। রান্না কিরূপ হইয়াছে, তাহা সে বিশেষ মনোযোগ করে নাই—কিন্তু উৎসাহের সহিত কহিল, "রান্না চমৎকার হইয়াছে মা।"

আড়াল হইতে এই উৎসাহবাক্য শুনিয়া কমলা আর স্থির হইয়া

দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। সে দ্রুতপদে পাশের একটা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আপনার চঞ্চল বক্ষকে দুই বাহুর দ্বারা পীড়ন করিয়া ধরিল।

আহারান্তে নলিনাক্ষ আপনার মনের মধ্যে কী-একটা অস্পষ্টতাকে স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে করিতে প্রাত্যহিক অভ্যাস অনুসারে নিভৃত অধ্যয়নে চলিয়া গেল।

বৈকালে ক্ষেমংকরী কমলাকে লইয়া নিজে তাহার চুল বাঁধিয়া সীমন্তে সিঁদুর পরাইয়া দিলেন— তাহার মুখ একবার এ-পাশে একবার ও-পাশে ফিরাইয়া ভালো করিয়া দেখিলেন— কমলা লজ্জায় চক্ষু নত করিয়া বসিয়া রহিল। ক্ষেমংকরী মনে মনে কহিলেন, "আহা, আমি যদি এই রকমের একটি বউ পাইতাম।"

সেই রাত্রেই ক্ষেমংকরীর আবার জ্বর আসিল। নলিনাক্ষ উদ্‌বিগ্ন হইয়া উঠিল। কহিল, "মা, তোমাকে আমি কিছুদিন কাশী হইতে অন্য কোথাও লইয়া যাইব। এখানে তোমার শরীর ভালো থাকিতেছে না।"

ক্ষেমংকরী কহিলেন, "সেটি হবে না বাছা। দু-চারদিন বাঁচাইয়া রাখিবার আশায় আমাকে যে কাশী ছাড়িয়া অন্য কোথাও লইয়া মারিবি, সেটি হবে না। ও কী মা, তুমি যে দরজার পাশে দাঁড়াইয়া আছ? যাও যাও, শুতে যাও। সমস্ত রাত অমন জাগিয়া কাটাইলে চলিবে না। আমি যে-কয়দিন ব্যামোতে আছি, তোমাকেই তো সব দেখিতে শুনিতে হইবে। রাত জাগিলে পারিবে কেন। যা তো নলিন, একবার ও-ঘরে যা তো।"

নলিনাক্ষ পাশের ঘরে যাইতেই কমলা ক্ষেমংকরীর পদতলে বসিয়া তাঁহার পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। ক্ষেমংকরী কহিলেন. "আর-জন্মে

নিশ্চয়ই তুমি আমার মা ছিলে মা। নহিলে কোথাও কিছু নাই, তোমাকে এমন করিয়া পাইব কেন। দেখো, আমার একটা অভ্যাস আছে, আমি বাজে কোনো লোকের সেবা সহিতে পারি না— কিন্তু তুমি আমার গায়ে হাত দিলে আমার গা যেন জুড়াইয়া যায়। আশ্চর্য এই যে, মনে হইতেছে, তোমাকে আমি যেন কতকাল ধরিয়াই জানি। তোমাকে তো একটুও পর মনে হয় না। তা শোনো মা, তুমি নিশ্চিন্তমনে ঘুমাইতে যাও। পাশের ঘরে নলিন রহিল— মার সেবা সে আর-কারো হাতে ছাড়িয়া দিতে পারিবে না— তা হাজার বারণ করি, আর যাই করি—ওর সঙ্গে পারিয়া উঠিবে কে বলো। কিন্তু ওর একটি গুণ আছে, রাত জাগুক আর যাই করুক, ওর মুখ দেখিয়া কিছু বুঝা যাইবে না— তার কারণ, ও কখনো কিছুতে অস্থির হয় না। আমার ঠিক তার উল্‌টা। মা, তুমি বোধ করি মনে মনে হাসিতেছ। ভাবিতেছ, নলিনের কথা আরম্ভ হইল, এবারে আর কথা থামিবে না। তা মা, এক ছেলে থাকিলে ওইরকমই হয়। আর নলিনের মতো ছেলেই বা কজন মায়ের হয়। সত্য বলিতেছি, আমি এক-একবার ভাবি— নলিন তো আমার বাপ— ও আমার জন্যে যতটা করিয়াছে, আমি কি উহার জন্যে ততটা করিতে পারি।— ওই দেখো, আবার নলিনের কথা। কিন্তু আর নয়— যাও মা, তুমি শুইতে যাও। না না, সে কিছুতেই হইতে পারিবে না, তুমি যাও— তুমি থাকিলে আমার ঘুম আসিবে না। বুড়োমানুষ, লোক কাছে থাকিলেই কেবল বকিতে ইচ্ছা করে।”

পরদিন কমলাই ঘরকন্নার সমুদয় ভার গ্রহণ করিল। নলিনাক্ষ পূর্বদিকের বারান্দার এক অংশ ঘিরিয়া লইয়া মার্বেল দিয়া বাঁধাইয়া একটি ছোটো ঘর করিয়া লইয়াছিল— ইহাই তাহার উপাসনাগৃহ ছিল— এবং মধ্যাহ্নে এইখানেই সে আসনের উপর বসিয়া অধ্যয়ন করিত।

সে-দিন প্রাতে সে-ঘরে নলিনাক্ষ প্রবেশ করিয়াই দেখিল, ঘরটি ধৌত, মার্জিত, পরিচ্ছন্ন— ধুনা জ্বালাইবার জন্য একটি পিতলের ধুনুচি ছিল, সেটি আজ সোনার মতো ঝকঝক করিতেছে। শেলফের উপরে তাহার কয়েকখানি বই ও পুঁথি সুসজ্জিত করিয়া বিন্যস্ত হইয়াছে। এই গৃহখানির যত্নমার্জিত নির্মলতার উপরে মুক্তদ্বার দিয়া প্রভাতরৌদ্রের উজ্জ্বলতা পরিব্যাপ্ত হইয়াছে— দেখিয়া স্নান হইতে সদ্যপ্রত্যাগত নলিনাক্ষের মনে বিশেষ একটি তৃপ্তির সঞ্চার হইল।

কমলা প্রভাতে ঘটিতে গঙ্গাজল লইয়া ক্ষেমংকরীর বিছানার পাশে আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি তাহার স্নাতমূর্তি দেখিয়া কহিলেন, "এ কী মা, তুমি একলাই ঘাটে গিয়াছিলে? আমি আজ ভোর হইতে ভাবিতেছিলাম, আমার অসুখ, তুমি কাহার সঙ্গে স্নানে যাইবে। কিন্তু তোমার অল্প বয়স, এমন করিয়া একলা—"

কমলা কহিল, "মা, আমার বাপের বাড়ির একটা চাকর থাকিতে পারে নাই, আমাকে দেখিতে কাল রাত্রেই এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহাকে সঙ্গে লইয়াছিলাম।"

ক্ষেমংকরী কহিলেন, "আহা, তোমার খুড়ীমা বোধ হয় অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন, চাকরটাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। তা বেশ হইয়াছে— সে তোমার কাছেই থাক্ না— তোমার কাজে-কর্মে সাহায্য করিবে। কোথায় সে, তাহাকে ডাকো না।"

কমলা উমেশকে লইয়া হাজির করিল। উমেশ গড় হইয়া ক্ষেমংকরীকে প্রণাম করিতে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর নাম কী রে।"

সে কহিল, আমার নাম "উমেশ।" বলিয়া অকারণ বিকশিত হাস্যে তাহার মুখ ভরিয়া গেল।

ক্ষেমংকরী হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "উমেশ, তোর এই বাহারে কাপড়খানা তোকে কে দিল রে।"

উমেশ কমলাকে দেখাইয়া কহিল, "মা দিয়াছেন।"

ক্ষেমংকরী কমলার দিকে চাহিয়া পরিহাস করিয়া কহিলেন, "আমি বলি, উমেশ বুঝি ওর শাশুড়ীর কাছ হইতে জামাইষষ্ঠী পাইয়াছে।"

ক্ষেমংকরীর স্নেহ লাভ করিয়া উমেশ এইখানেই রহিয়া গেল।

উমেশকে সহায় করিয়া কমলা দিনের বেলাকার সমস্ত কাজকর্ম শেষ করিয়া ফেলিল। স্বহস্তে নলিনাক্ষের শোবার ঘর ঝাঁট দিয়া, তাহার বিছানা রৌদ্রে দিয়া তুলিয়া, সমস্ত পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিল। নলিনাক্ষের ময়লা ছাড়া-ধুতি ঘরের এক কোণে পড়িয়া ছিল। কমলা সেখানি ধুইয়া শুকাইয়া ভাঁজ করিয়া আলনার উপরে ঝুলাইয়া রাখিল। ঘরের যে-সব জিনিস কিছুমাত্র অপরিষ্কার ছিল না, তাহাও সে মুছিবার ছলে বার বার নাড়াচাড়া করিয়া লইল। বিছানার শিয়রের কাছে দেয়ালে একটা গা-আলমারি ছিল— সেটা খুলিয়া দেখিল, তাহার মধ্যে আর কিছুই নাই, কেবল নিচের থাকে নলিনাক্ষের একজোড়া খড়ম আছে। তাড়াতাড়ি সেই খড়মজোড়াটি তুলিয়া লইয়া কমলা মাথায় ঠেকাইল— এবং ছোটো শিশুটির মতো বুকের কাছে ধরিয়া অঞ্চল দিয়া বার বার তাহার ধুলা মুছাইয়া দিল।

বৈকালে কমলা ক্ষেমংকরীর পায়ের কাছে বসিয়া তাঁহার পায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছে, এমন সময় হেমনলিনী একটি ফুলের সাজি লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল এবং ক্ষেমংকরীকে প্রণাম করিল।

ক্ষেমংকরী উঠিয়া বসিয়া কহিলেন, "এসো এসো, হেম এসো, বসো। অন্নদাবাবু ভালো আছেন?"

হেমনলিনী কহিল, “তাঁহার শরীর অসুস্থ ছিল বলিয়া কাল আসিতে পারি নাই, আজ তিনি ভালো আছেন।”

কমলাকে দেখাইয়া ক্ষেমংকরী কহিলেন, “এই দেখো বাছা,— শিশুকালে আমার মা মারা গেছেন; তিনি আবার জন্ম লইয়া এতদিন পরে কাল পথের মধ্যে হঠাৎ আমাকে দেখা দিয়াছেন। আমার মার নাম ছিল হরিভাবিনী— এবারে হরিদাসী নাম লইয়াছেন। কিন্তু হেম এমন লক্ষ্মীর মূর্তি আর কোথাও দেখিয়াছ? বলো তো।”

কমলা লজ্জায় মুখ নিচু করিল। হেমনলিনীর সঙ্গে আস্তে আস্তে তাহার পরিচয় হইয়া গেল।

হেমনলিনী ক্ষেমংকরীকে জিজ্ঞাসা করিল, “মা, আপনার শরীর কেমন আছে।”

ক্ষেমংকরী কহিলেন, “দেখো, আমার যে-বয়স হইয়াছে, এখন আমাকে আর শরীরের কথা জিজ্ঞাসা করা চলে না। আমি যে এখনো আছি, এই ঢের। কিন্তু তাই বলিয়া কালকে চিরদিন ফাঁকি দেওয়া তো চলিবে না। তা তুমি যখন কথাটা পাড়িয়াছ, ভালোই হইয়াছে— তোমাকে কিছুদিন হইতে বলিব বলিব করিতেছি, সুবিধা হইতেছে না। কাল রাত্রে আবার যখন আমাকে জ্বরে ধরিল, তখন ঠিক করিলাম, আর বিলম্ব করা ভালো হইতেছে না। দেখো বাছা, ছেলেবয়সে আমাকে যদি কেহ বিবাহের কথা বলিত তো লজ্জায় মরিয়া যাইতাম— কিন্তু তোমাদের তো সে-রকম শিক্ষা নয়। তোমরা লেখাপড়া শিখিয়াছ— বয়সও হইয়াছে— তোমাদের কাছে এ-সব কথা স্পষ্ট করিয়া বলা চলে। সেইজন্যই কথাটা পাড়িতেছি, তুমি আমার কাছে লজ্জা করিয়ো না। আচ্ছা বলো তো বাছা, সে-দিন তোমার বাবার কাছে যে-প্রস্তাব করিয়াছিলাম, তিনি কি তোমাকে বলেননি।”

হেমনলিনী নতমুখে কহিল, "হাঁ, বলিয়াছিলেন।"

ক্ষেমংকরী কহিলেন, "কিন্তু তুমি বাছা সে-কথায় নিশ্চয়ই রাজি হও নাই। যদি রাজি হইতে, তবে অন্নদাবাবু তখনি আমার কাছে ছুটিয়া আসিতেন। তুমি ভাবিলে আমার নলিন সন্ন্যাসী-মানুষ, দিনরাত্রি কী-সব যোগযাগ লইয়া আছে, উহাকে আবার বিবাহ করা কেন। হোক আমার ছেলে, তবু কথাটা উড়াইয়া দিবার নয়। উহাকে বাহির হইতে দেখিলে মনে হয়, উহার যেন কিছুতেই কোনোদিন আসক্তি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু সেটা তোমাদের ভুল ;— আমি উহাকে জন্মকাল হইতে জানি, আমার কথাটা বিশ্বাস করিয়ো। ও এত বেশি ভালোবাসিতে পারে যে, সেই ভয়েই ও আপনাকে এত করিয়া দমন করিয়া রাখে। উহার এই সন্ন্যাসের খোলা ভাঙিয়া যে উহার হৃদয় পাইবে, সে বড়ো মধুর জিনিসটি পাইবে, তাহা আমি বলিয়া রাখিতেছি। মা হেম, তুমি বালিকা নও, তুমি শিক্ষিত, তুমি আমার নলিনের কাছ হইতেই দীক্ষা লইয়াছ, তোমাকে নলিনের ঘরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আমি যদি মরিতে পারি, তবে বড়ো নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতে পারিব। নহিলে, আমি নিশ্চয় জানি, আমি মরিলে ও আর বিবাহই করিবে না। তখন ওর কী দশা হইবে ভাবিয়া দেখো দেখি। একেবারে ভাসিয়া বেড়াইবে। যাই হোক, বলো তো বাছা, তুমি তো নলিনকে শ্রদ্ধা কর আমি জানি, তবে তোমার মনে আপত্তি উঠিতেছে কেন।"

হেমনলিনী নতনেত্রে কহিল, "মা, তুমি যদি আমাকে যোগ্য মনে কর, তবে আমার কোনো আপত্তি নাই।"

শুনিয়া ক্ষেমংকরী হেমনলিনীকে কাছে টানিয়া লইয়া তাহার মাথায় চুম্বন করিলেন। এ-সম্বন্ধে আর-কোনো কথা বলিলেন না।

"হরিদাসী, এই ফুলগুলো—"বলিতে বলিতে পাশে চাহিয়া দেখিলেন, হরিদাসী নাই। সে নিঃশব্দপদে কখন উঠিয়া গেছে।

পূর্বোক্ত আলোচনার পর ক্ষেমংকরীর কাছে হেমনলিনী সংকোচ বোধ করিল, ক্ষেমংকরীরও বাধো-বাধো করিতে লাগিল। তখন হেম কহিল, "মা, আজ তবে সকাল-সকাল যাই। বাবার শরীর ভালো নাই।" বলিয়া ক্ষেমংকরীকে প্রণাম করিল। ক্ষেমংকরী তাহার মাথায় হাত দিয়া কহিলেন, "এসো মা, এসো।"

হেমনলিনী চলিয়া গেলে ক্ষেমংকরী নলিনাক্ষকে ডাকিয়া পাঠাইলেন—কহিলেন, "নলিন, আর আমি দেরি করিতে পারিব না।"

নলিনাক্ষ কহিল, "ব্যাপারখানা কী ?"

ক্ষেমংকরী কহিলেন, "আমি আজ হেমকে সব কথা খুলিয়া বলিলাম—সে তো রাজি হইয়াছে, এখন তোমার কোনো ওজর আমি শুনিতে চাই না। আমার শরীর তো দেখিতেছিস। তোদের একটা স্থিতি না করিয়া আমি কোনোমতেই সুস্থির হইতে পারিতেছি না। অর্ধেক রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া আমি ওই কথাই ভাবি।"

নলিনাক্ষ কহিল, "আচ্ছা মা, ভাবিয়ো না, তুমি ভালো করিয়া ঘুমাইয়ো, তুমি যেমন ইচ্ছা কর, তাহাই হইবে।"

নলিনাক্ষ চলিয়া গেলে ক্ষেমংকরী ডাকিলেন, "হরিদাসী।"

কমলা পাশের ঘর হইতে চলিয়া আসিল। তখন অপরাহ্নের আলোক ম্লান হইয়া ঘর প্রায় অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। হরিদাসীর মুখ ভালো করিয়া দেখা গেল না। ক্ষেমংকরী কহিলেন, "বাছা, এই ফুলগুলিতে জল দিয়া ঘরে সাজাইয়া রাখো।" বলিয়া বাছিয়া একটি গোলাপ তুলিয়া ফুলের সাজিটি কমলার দিকে অগ্রসর করিয়া দিলেন।

কমলা তাহার মধ্যে কতকগুলি ফুল তুলিয়া একটি থালায় সাজাইয়া নলিনাক্ষের উপাসনাগৃহের আসনের সম্মুখে রাখিল। আর-কতকগুলি একটি বাটিতে করিয়া নলিনাক্ষের শোবার ঘরে টিপাইয়ের উপর রাখিয়া দিল। বাকি কয়েকটি ফুল লইয়া সেই দেয়ালের গায়ের আলমারিটা খুলিয়া এবং সেই খড়মজোড়ার উপর ফুলগুলি রাখিয়া তাহার উপরে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিতেই তাহার চোখ দিয়া আজ ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। এই খড়ম ছাড়া জগতে তাহার আর-কিছুই নাই— পদসেবার অধিকারও হারাইতে বসিয়াছে।

এমন সময়ে হঠাৎ ঘরে কে প্রবেশ করিতেই কমলা ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি আলমারির দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া দেখিল, নলিনাক্ষ। কোনোদিকে কমলা পালাইবার পথ পাইল না— লজ্জায় কমলা সেই আসন্ন সায়াহ্নের অন্ধকারে মিশাইয়া গেল না কেন।

নলিনাক্ষ ঘরের মধ্যে কমলাকে দেখিয়া বাহির হইয়া গেল। কমলাও আর বিলম্ব না করিয়া দ্রুতপদে অন্য ঘরে চলিয়া গেল। তখন নলিনাক্ষ পুনর্বার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মেয়েটি আলমারি খুলিয়া কী করিতেছিল, তাহাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি বন্ধ করিলই বা কেন। কৌতূহলবশত নলিনাক্ষ আলমারি খুলিয়া দেখিল, তাহার খড়মজোড়ার উপর কতকগুলি সদ্যসিক্ত ফুল রহিয়াছে। তখন সে আবার আলমারির দরজা বন্ধ করিয়া শয়নগৃহের জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বাহিরে আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে শীতসূর্যাস্তের ক্ষণকালীন আভা মিলাইয়া আসিয়া অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া উঠিল।

৫৬

হেমনলিনী নলিনাক্ষের সহিত বিবাহে সম্মতি দিয়া মনকে বুঝাইতে লাগিল, "আমার পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয় হইয়াছে।" মনে মনে সহস্রবার করিয়া বলিল, "আমার পুরাতন বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেছে— আমার জীবনের আকাশকে বেষ্টন করিয়া যে ঝড়ের মেঘ জমিয়া উঠিয়াছিল, তাহা একেবারে কাটিয়া গেছে। এখন আমি স্বাধীন, আমার অতীতকালের অবিশ্রাম আক্রমণ হইতে নির্মুক্ত।" এই কথা বারংবার বলিয়া সে একটা বৃহৎ বৈরাগ্যের আনন্দ অনুভব করিল। শ্মশানে দাহকৃত্যের পর এই প্রকাণ্ড সংসার তাহার বিপুল ভার পরিহার করিয়া যখন খেলার মতো হইয়া দেখা দেয়, তখন কিছুকালের মতো মন যেমন লঘু হইয়া যায়—হেমনলিনীর ঠিক সেই অবস্থা হইল— সে নিজের জীবনের একাংশের নিঃশেষ-অবসান-জনিত শান্তি লাভ করিল।

বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়া হেমনলিনী ভাবিল, "মা যদি থাকিতেন, তবে তাঁহাকে আজ আমার এই আনন্দের কথা বলিয়া আনন্দিত করিতাম— বাবাকে কেমন করিয়া সব কথা বলিব।"

শরীর দুর্বল বলিয়া আজ অন্নদাবাবু যখন সকাল-সকাল শুইতে গেলেন, তখন হেমনলিনী একখানি খাতা বাহির করিয়া রাত্রে তাহার নির্জন শয়নগৃহে টেবিলের উপর লিখিতে লাগিল, "আমি মৃত্যুজালে জড়াইয়া পড়িয়া সমস্ত সংসার হইতে বিযুক্ত হইয়াছিলাম। তাহা হইতে উদ্ধার করিয়া ঈশ্বর আবার যে একদিন আমাকে নূতন জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবেন, তাহা আমি মনেও করিতে পারিতাম না। আজ তাঁহার চরণে সহস্রবার প্রণাম করিয়া নূতন কর্তব্যক্ষেত্রে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত হইলাম। আমি কোনোমতেই যে-সৌভাগ্যের উপযুক্ত নই,

তাহাই লাভ করিতেছি। ঈশ্বর আমাকে তাহাই চিরজীবন রক্ষা করিবার জন্য বলদান করুন। যাঁহার জীবনের সঙ্গে আমার এই ক্ষুদ্র জীবন মিলিত হইতে চলিল, তিনি আমাকে সর্বাংশে পরিপূর্ণতা দিবেন, তাহা আমি নিশ্চয় জানি; সেই পরিপূর্ণতার সমস্ত ঐশ্বর্য আমি যেন সম্পূর্ণভাবে তাঁহাকেই প্রত্যর্পণ করিতে পারি, এই আমার একমাত্র প্রার্থনা।"

তাহার পরে খাতা বন্ধ করিয়া হেমনলিনী সেই নক্ষত্রখচিত অন্ধকারে নিস্তব্ধ শীতের রাত্রে কাঁকর-বিছানো বাগানের পথে অনেকক্ষণ পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। অনন্ত আকাশ তাহার অশ্রুধৌত অন্তঃকরণের মধ্যে নিঃশব্দ শান্তিমন্ত্র উচ্চারণ করিল।

পরদিন অপরাহ্ণে যখন অন্নদাবাবু হেমনলিনীকে লইয়া নলিনাক্ষের বাড়ি যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, এমন সময় তাঁহার দ্বারের কাছে এক গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল। কোচবাক্সের উপর হইতে নলিনাক্ষের এক চাকর নামিয়া আসিয়া খবর দিল, "মা আসিয়াছেন।"

অন্নদাবাবু তাড়াতাড়ি দ্বারের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইতেই ক্ষেমংকরী গাড়ি হইতে নামিয়া আসিলেন। অন্নদাবাবু কহিলেন, "আজ আমার পরম সৌভাগ্য।"

ক্ষেমংকরী কহিলেন, "আজ আপনার মেয়ে দেখিয়া আশীর্বাদ করিয়া যাইব, তাই আসিয়াছি।"

এই বলিয়া তিনি ঘরে প্রবেশ করিলেন। অন্নদাবাবু তাঁহাকে বসিবার ঘরে যত্নপূর্বক একটা সোফার উপরে বসাইয়া কহিলেন, "আপনি বসুন, আমি হেমকে ডাকিয়া আনিতেছি।"

হেমনলিনী বাইরে যাইবার জন্য সাজিয়া প্রস্তুত হইতেছিল—ক্ষেমংকরী আসিয়াছেন শুনিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল—ক্ষেমংকরী কহিলেন, "সৌভাগ্যবতী হইয়া তুমি দীর্ঘায়ু লাভ

করো। দেখি মা, তোমার হাতখানি দেখি।" বলিয়া একে একে তাহার দুই হাতে মকরমুখো মোটা সোনার বালা দুইগাছি পরাইয়া দিলেন। হেমনলিনীর কৃশ হাতে মোটা বালাজোড়া ঢলঢল করিতে লাগিল। বালা পরানো হইলে হেমনলিনী আবার ভূমিষ্ঠ হইয়া ক্ষেমঙ্করীকে প্রণাম করিল—ক্ষেমংকরী দুই হাতে তাহার মুখ ধরিয়া তাহার ললাট চুম্বন করিলেন। এই আশীর্বাদে ও আদরে হেমনলিনীর হৃদয় একটি সুগম্ভীর মাধুর্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

ক্ষেমংকরী কহিলেন, "বেয়াইমশায়, কাল আমার ওখানে আপনাদের দুজনেরই সকালে নিমন্ত্রণ রহিল।"

পরদিন প্রাতঃকালে হেমনলিনীকে লইয়া অন্নদাবাবু যথানিয়মে বাহিরে চা খাইতে বসিয়াছেন। অন্নদাবাবুর রোগক্লিষ্ট মুখ এক রাত্রির মধ্যেই আনন্দে সরস ও নবীন হইয়া উঠিয়াছে। ক্ষণে ক্ষণে হেমনলিনীর শান্তোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিতেছেন, আর তাঁহার মনে হইতেছে, আজ যেন তাঁহার পরলোকগতা পত্নীর মঙ্গলমধুর আবির্ভাব তাঁহার কন্যাকে পরিবেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে, এবং সুদূরব্যাপ্ত অশ্রুজলের আভাসে সুখের অত্যুজ্জ্বলতাকে স্নিগ্ধগম্ভীর করিয়া তুলিয়াছে।

অন্নদাবাবুর আজ কেবলই মনে হইতেছে, ক্ষেমংকরীর নিমন্ত্রণে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইবার সময় হইয়াছে— আর দেরি করা উচিত নহে। হেমনলিনী তাঁহাকে বার বার করিয়া স্মরণ করাইতেছে, এখনো অনেক সময় আছে— এখন সবে আটটা। অন্নদাবাবু কহিতেছেন, "নাহিয়া প্রস্তুত হইয়া লইতে তো সময় চাই। দেরি করার চেয়ে বরঞ্চ একটু সকাল-সকাল যাওয়া ভালো।"

ইতিমধ্যে কতকগুলি তোরঙ্গ-বিছানা প্রভৃতি বোঝাইসমেত এক ভাড়াটে গাড়ি আসিয়া বাগানের প্রবেশপথের সম্মুখে থামিল।

সহসা হেমনলিনী "দাদা আসিয়াছেন" বলিয়া অগ্রসর হইয়া গেল। যোগেন্দ্র হাস্যমুখে গাড়ি হইতে নামিল—কহিল, "কী হেম, ভালো আছ তো।"

হেমনলিনী জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার গাড়িতে আর-কেহ আছে নাকি।"

যোগেন্দ্র হাসিয়া কহিল, "আছে বইকি। বাবার জন্য একটি ক্রিস্টমাসের উপহার আনিয়াছি।"

ইতিমধ্যে রমেশ গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িল। হেমনলিনী একবার মুহূর্তকাল চাহিয়াই তৎক্ষণাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া চলিয়া গেল।

যোগেন্দ্র ডাকিল, "হেম, যেয়ো না, কথা আছে শোনো।"

এ-আহ্বান হেমনলিনীর কানেও পৌঁছিল না—সে যেন কোন্ প্রেতমূর্তির অনুসরণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য দ্রুতবেগে চলিল।

রমেশ ক্ষণকালের জন্য একবার থমকিয়া দাঁড়াইল—অগ্রসর হইবে কি ফিরিয়া যাইবে, ভাবিয়া পাইল না। যোগেন্দ্র কহিল, "রমেশ এসো, বাবা এইখানে বাহিরেই বসিয়া আছেন।" বলিয়া রমেশের হাত ধরিয়া তাহাকে অন্নদাবাবুর কাছে আনিয়া উপস্থিত করিল।

অন্নদাবাবু দূর হইতেই রমেশকে দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেছেন। তিনি মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে ভাবিলেন, "এ আবার কী বিঘ্ন উপস্থিত হইল।"

রমেশ অন্নদাবাবুকে নত হইয়া নমস্কার করিল। অন্নদাবাবু তাহাকে বসিবার চৌকি দেখাইয়া দিয়া যোগেন্দ্রকে কহিলেন, "যোগেন, তুমি ঠিক সময়েই আসিয়াছ। আমি তোমাকে টেলিগ্রাফ করিব মনে করিতেছিলাম।"

যোগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "কেন।"

অন্নদাবাবু কহিলেন, "হেমের সঙ্গে নলিনাক্ষের বিবাহ স্থির হইয়া গেছে। কাল নলিনাক্ষের মা হেমকে আশীর্বাদ করিয়া দেখিয়া গেছেন।"

যোগেন্দ্র। বলো কী বাবা, বিবাহ একেবারে পাকাপাকি স্থির হইয়া গেছে? আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করিতেও নাই?

অন্নদাবাবু। যোগেন্দ্র, তুমি কখন কী বল তার কিছুই স্থির নাই। আমি যখন নলিনাক্ষকে জানিতাম না, তখন তোমরাই তো এই বিবাহের জন্য উদ্‌যোগী ছিলে।

যোগেন্দ্র। তখন তো ছিলাম, কিন্তু তা যাই হোক, এখনো সময় যায় নাই। ঢের কথা বলিবার আছে। আগে সেইগুলো শোনো, তারপরে যা কর্তব্য হয় করিয়ো।

অন্নদাবাবু কহিলেন, "সময়মতো একদিন শুনিব—কিন্তু আজ আমার তো অবকাশ নাই। এখনি আমাকে বাহির হইতে হইবে।"

যোগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাইবে।"

অন্নদাবাবু কহিলেন, "নলিনাক্ষের মার ওখানে আমার আর হেমের নিমন্ত্রণ আছে। যোগেন্দ্র, তোমার তা হইলে এখানেই আহারের—"

যোগেন্দ্র কহিল, "না না। আমাদের জন্যে ব্যস্ত হবার দরকার নাই। আমি রমেশকে সঙ্গে লইয়া এখানকার কোনো হোটেলে খাওয়াদাওয়া করিয়া লইব। সন্ধ্যার মধ্যে তোমরা ফিরিবে তো। তখনি আমরা আসিব।"

অন্নদাবাবু কোনোমতেই রমেশের প্রতি কোনোপ্রকার শিষ্টসম্ভাষণ করিতে পারিলেন না। তাহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করাও তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। রমেশও এতক্ষণ নীরবে থাকিয়া, যাইবার সময় অন্নদাবাবুকে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল।

৫৭

ক্ষেমংকরী কমলাকে গিয়া কহিলেন, "মা, কাল হেমকে আর তার বাপকে দুপুরবেলায় এখানে আহার করিতে নিমন্ত্রণ করা গেছে। কী রকম আয়োজনটা করা যায় বলো দেখি? বেয়াইকে এমন করিয়া খাওয়ানো দরকার যে, তিনি যেন নিশ্চিন্ত হইতে পারেন যে, এখানে তাঁহার মেয়েটির খাওয়ার কষ্ট হইবে না। কী বলো মা। তা, তোমার যে-রকম রান্নার হাত, অপযশ হইবে না, তা জানি। আমার ছেলে আজ পর্যন্ত কোনো রান্না খাইয়া কোনোদিন ভালোমন্দ কিছুই বলে নাই —কাল তোমার রান্নার প্রশংসা তাহার মুখে ধরে না মা। কিন্তু তোমার মুখখানি আজ বড়ো শুকনো দেখাইতেছে যে। শরীর কি ভালো নাই।"

মলিন মুখে একটুখানি হাসি আনিয়া কমলা কহিল, "বেশ আছি মা।"

ক্ষেমংকরী মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "না না, বোধ করি তোমার মন কেমন করিতেছে। তা তো করিতেই পারে, সেজন্য লজ্জা কিসের। আমাকে পর ভাবিয়ো না মা। আমি তোমাকে আপন মেয়ের মতোই দেখি—এখানে যদি তোমার কোনো অসুবিধা হয়, বা তুমি আপনার লোক কাহাকেও দেখিতে চাও তো আমাকে না বলিলে চলিবে কেন।"

কমলা ব্যগ্র হইয়া কহিল, "না মা, তোমার সেবা করিতে পারিলে আমি আর-কিছুই চাই না।"

ক্ষেমংকরী সে কথায় কান না দিয়া কহিলেন, "না হয় কিছুদিনের জন্য তোমার খুড়ার বাড়িতে গিয়া থাক, তারপরে যখন ইচ্ছা হয়, আবার আসিবে।"

কমলা অস্থির হইয়া উঠিল, কহিল, "মা, আমি যতক্ষণ তোমার কাছে আছি, সংসারে কাহারো জন্য ভাবি না। আমি যদি কখনো তোমার পায়ে অপরাধ করি, আমাকে তুমি যেমন খুশি শাস্তি দিয়ো, কিন্তু একদিনের জন্যও দূরে পাঠাইয়ো না।"

ক্ষেমংকরী কমলার দক্ষিণ কপোলে দক্ষিণ হস্ত বুলাইয়া কহিলেন, "তাই তো বলি মা, আর-জন্মে তুমি আমার মা ছিলে। নহিলে দেখিবামাত্র এমন বন্ধন কী করিয়া হয়। তা যাও মা, সকাল-সকাল শুইতে যাও। সমস্তদিন তো একদণ্ড বসিয়া থাকিতে জান না।"

কমলা তাহার শয়নগৃহে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দীপ নিবাইয়া অন্ধকারে মাটির উপরে বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ বসিয়া, অনেকক্ষণ ভাবিয়া, এই কথা সে মনে বুঝিল, "কপালের দোষে যাহার উপরে আমার অধিকার হারাইয়াছি, তাহাকে আমি আগলাইয়া বসিয়া থাকিব, এ কেমন করিয়া হয়। সমস্তই ছাড়িবার জন্য মনকে প্রস্তুত করিতে হইবে— কেবল সেবা করিবার সুযোগটুকু, যেমন করিয়া হউক, প্রাণপণে বাঁচাইয়া চলিব। ভগবান করুন, সেটুকু যেন হাসিমুখে করিতে পারি— তাহার বেশি আর-কিছুতে যেন দৃষ্টি না দিই। অনেক দুঃখে যেটুকু পাইয়াছি, সেটুকুও যদি প্রসন্নমনে না লইতে পারি, যদি মুখ ভার করি, তবে সবসুদ্ধই হারাইতে হইবে।"

এই বুঝিয়া একাগ্রমনে বারবার করিয়া সে সংকল্প করিতে লাগিল, "আমি কাল হইতে যেন কোনো দুঃখকে মনে স্থান না দিই, যেন এক মুহূর্ত মুখ বিরস না করি, যাহা আশার অতীত, তাহার জন্য যেন কোনো কামনা মনের মধ্যে না থাকে। কেবল সেবা করিব, যতদিন জীবন আছে কেবল সেবা করিব, আর-কিছু চাহিব না, চাহিব না, চাহিব না।"

তাহার পর কমলা শুইতে গেল। এ-পাশ ও-পাশ করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িল। রাত্রে দুই তিনবার ঘুম ভাঙিয়া গেল। ভাঙিবামাত্রই সে মন্ত্রের মতো আওড়াইতে লাগিল, "আমি কিছুই চাহিব না, চাহিব না, চাহিব না।" ভোরের বেলায় সে বিছানা হইতে উঠিয়াই জোড়হাত করিয়া বসিল, এবং সমস্ত চিত্ত প্রয়োগ করিয়া কহিল, "আমি আমরণকাল তোমার সেবা করিব, আর কিছু চাহিব না, চাহিব না, চাহিব না।"

এই বলিয়া তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধুইয়া, বাসি কাপড় ছাড়িয়া, নলিনাক্ষের সেই ক্ষুদ্র উপাসনাঘরের মধ্যে গেল; নিজের আঁচলটি দিয়া সমস্ত ঘর মুছিয়া পরিষ্কার করিল এবং যথাস্থানে আসনটি বিছাইয়া রাখিয়া দ্রুতপদে গঙ্গাস্নান করিতে গেল। আজকাল নলিনাক্ষের একান্ত অনুরোধে ক্ষেমংকরী সূর্যোদয়ের পূর্বে স্নান করিতে যাওয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাই উমেশকেই এই দুঃসহ শীতের ভোরে কমলার সহিত স্নানে যাইতে হইল।

স্নান হইতে ফিরিয়া আসিয়া কমলা ক্ষেমংকরীকে প্রফুল্লমুখে প্রণাম করিল। তিনি তখন স্নানে বাহির হইবার উপক্রম করিতেছিলেন। কমলাকে কহিলেন, "এত ভোরে কেন নাহিতে গেলে। আমার সঙ্গে গেলেই তো হইত।"

কমলা কহিল, "আজ যে কাজ আছে মা। কাল সন্ধ্যাবেলায় যে-তরকারি আনানো হইয়াছে তাহাই কুটিয়া রাখি— আর যা-কিছু বাজার করা বাকি আছে, উমেশ সকাল-সকাল সারিয়া আসুক।"

ক্ষেমংকরী কহিলেন, "বেশ বুদ্ধি ঠাওরাইয়াছ মা। বেয়াই যেমনি আসিবেন, অমনি খাবার প্রস্তুত পাইবেন।"

এমন সময় নলিনাক্ষ বাহির হইয়া আসিবামাত্র কমলা ভিজা চুলের উপর তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। নলিনাক্ষ

কহিল; “মা, আজই তুমি স্নান করিতে চলিলে? সবে কাল একটু ভালো ছিলে।”

ক্ষেমংকরী কহিলেন, “নলিন, তোর ডাক্তারি রাখ্‌। সকালবেলায় গঙ্গাস্নান না করিলেও লোকে অমর হয় না। তুই এখন বাহির হইতেছিস বুঝি? একটু সকাল-সকাল ফিরিস।”

নলিনাক্ষ জিজ্ঞাসা করিল, “কেন মা।”

ক্ষেমংকরী। কাল তোকে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম— আজ অন্নদাবাবু তোকে আশীর্বাদ করিতে আসিবেন।

নলিনাক্ষ। আশীর্বাদ করিতে আসিবেন? কেন, হঠাৎ আমার উপরে এত বিশেষভাবে প্রসন্ন হইলেন যে। তাঁর সঙ্গে তো রোজই আমার দেখা হয়।

ক্ষেমংকরী। আমি যে কাল হেমনলিনীকে একজোড়া বালা দিয়া আশীর্বাদ করিয়া আসিলাম— এখন অন্নদাবাবু তোকে না করিলে চলিবে কেন। যা হোক, ফিরিতে দেরি করিসনে— তাঁরা এখানেই খাইবেন।

এই বলিয়া ক্ষেমংকরী স্নান করিতে গেলেন। নলিনাক্ষ মাথা নিচু করিয়া ভাবিতে ভাবিতে রাস্তা দিয়া চলিয়া গেল।

৫৮

হেমনলিনী রমেশের নিকট হইতে দ্রুতবেগে পলায়ন করিয়া ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া বিছানার উপর বসিয়া পড়িল। প্রথম আবেগটা শান্ত হইবামাত্র একটা লজ্জা তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া দিল। “কেন আমি রমেশবাবুর সঙ্গে সহজভাবে দেখা করিতে পারিলাম না। যাহা

আশা করি না, তাহাই হঠাৎ কেন আমার মধ্য হইতে এমন অশোভন-ভাবে দেখা দেয়। বিশ্বাস নাই, কিছুই বিশ্বাস নাই। এমন করিয়া টলমল করিতে আর পারি না।"

এই বলিয়া সে জোর করিয়া উঠিয়া পড়িয়া দরজা খুলিয়া দিল, বাহির হইয়া আসিল— মনে মনে কহিল, "আমি পলায়ন করিব না, আমি জয় করিব।" পুনর্বার রমেশবাবুর সঙ্গে দেখা করিতে চলিল। হঠাৎ কী মনে পড়িল। আবার সে ঘরের মধ্যে গেল। তোরঙ্গ খুলিয়া তাহার মধ্য হইতে ক্ষেমংকরীর প্রদত্ত বালাজোড়া বাহির করিয়া পরিল, এবং অস্ত্র পরিয়া যুদ্ধে যাইবার মতো সে আপনাকে দৃঢ় করিয়া মাথা তুলিয়া বাগানের দিকে চলিল।

অন্নদাবাবু কহিলেন, "হেম, তুমি কোথায় চলিয়াছ?"

হেমনলিনী কহিল, "রমেশবাবু নাই— দাদা নাই?"

অন্নদা। না, তাঁহারা চলিয়া গেছেন।

আশু আত্মপরীক্ষাসম্ভাবনা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া হেমনলিনী আরাম বোধ করিল।

অন্নদাবাবু কহিলেন, "এখন তবে—"

হেমনলিনী কহিল, "হাঁ বাবা, আমি চলিলাম— আমার স্নান করিয়া আসিতে দেরি হইবে না, তুমি গাড়ি ডাকিতে বলিয়া দাও।"

এইরূপে হেমনলিনী নিমন্ত্রণে যাইবার জন্য হঠাৎ তাহার স্বভাব-বিরুদ্ধ অত্যন্ত উৎসাহ প্রকাশ করিল। এই উৎসাহের আতিশয্যে অন্নদাবাবু ভুলিলেন না, তাঁহার মন আরও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল।

হেমনলিনী তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া সজ্জিত হইয়া আসিয়া কহিল, "বাবা, গাড়ি আসিয়াছে কি।"

অন্নদাবাবু কহিলেন, "না, এখনো আসে নাই।"

ততক্ষণ হেমনলিনী বাগানের রাস্তায় পদচারণা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। অন্নদাবাবু বারান্দায় বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

অন্নদাবাবু যখন নলিনাক্ষের বাড়ি গিয়া পৌঁছিলেন, বেলা তখন সাড়ে দশটার অধিক হইবে না। তখনো নলিনাক্ষ কাজ সারিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসে নাই। কাজেই অন্নদাবাবুর অভ্যর্থনাভার ক্ষেমংকরীকেই লইতে হইল।

ক্ষেমংকরী অন্নদাবাবুর শরীর ও সংসারের নানা কথা লইয়া প্রশ্ন ও আলোচনা উত্থাপিত করিলেন— মাঝে মাঝে হেমনলিনীর মুখের দিকে তাঁহার কটাক্ষ ধাবিত হইল। সে-মুখে কোনো উৎসাহের লক্ষণ নাই কেন। আসন্ন শুভঘটনার সম্ভাবনা সূর্যোদয়ের পূর্বে অরুণরশ্মিচ্ছটার মতো তাহার মুখে দীপ্তিবিকাশ করে নাই তো। বরঞ্চ হেমনলিনীর অন্যমনস্ক দৃষ্টির মধ্য হইতে একটা ভাবনার অন্ধকার যেন দেখা যাইতেছিল।

অল্পেই ক্ষেমংকরীকে আঘাত করে। হেমনলিনীর এইরূপ ম্লানভাব লক্ষ্য করিয়া তাঁহার মন দমিয়া গেল। "নলিনের সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ যে-কোনো মেয়ের পক্ষেই সৌভাগ্যের বিষয়, কিন্তু এই শিক্ষামদমত্তা মেয়েটি আমার নলিনকে কি তাঁহার যোগ্য বলিয়াই মনে করিতেছেন না। এত চিন্তা, এত দ্বিধাই বা কিসের জন্য। আমারই দোষ। বুড়া হইয়া গেলাম, তবু ধৈর্য ধরিতে পারিলাম না। যেমনি ইচ্ছা হইল, অমনি আর সবুর সহিল না। বড়ো বয়সের মেয়ের সঙ্গে নলিনের বিবাহ স্থির করিলাম, অথচ তাহাকে ভালো করিয়া চিনিবার চেষ্টাও করিলাম না। হায় হায়, চিনিয়া দেখিবার মতো সময় যে হাতে নাই— এখন সংসারের সব কাজ তাড়াতাড়ি সারিয়া যাইবার জন্য তলব আসিয়াছে।"

অন্নদাবাবুর সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে ক্ষেমংকরীর মনের ভিতরে ভিতরে এই সমস্ত চিন্তা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কথাবার্তা কহা তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিল। তিনি অন্নদাবাবুকে কহিলেন, "দেখুন, বিবাহের সম্বন্ধে বেশি তাড়াতাড়ি করিয়া কাজ নাই। এঁদের দুজনেরই বয়স হইয়াছে, এখন এঁরা নিজেরাই বিচার করিয়া কাজ করিবেন, আমাদের তাগিদ দেওয়াটা ভালো হইতেছে না। হেমের মনের ভাব আমি অবশ্য বুঝি না— কিন্তু আমি নলিনের কথা বলিতে পারি, সে এখনো মন স্থির করিতে পারে নাই।"

এ-কথাটা ক্ষেমংকরী হেমনলিনীকে বিশেষ করিয়া শুনাইবার জন্যই বলিলেন। হেমনলিনী অপ্রসন্নমনে চিন্তা করিতেছে, আর তাঁর ছেলেই যে বিবাহের প্রস্তাবে একেবারে নাচিয়া উঠিয়াছে, এ-ধারণা তিনি অপর পক্ষের মনে জন্মিতে দিতে পারেন না।

হেমনলিনী আজ এখানে আসিবার সময় খুব একটা চেষ্টাকৃত উৎসাহ অবলম্বন করিয়া আসিয়াছিল— সেইজন্য তাহার বিপরীত ফল হইল। ক্ষণিক উত্তেজনা একটা গভীর অবসাদের মধ্যে বিপর্যস্ত হইয়া পড়িল। যখন ক্ষেমংকরীর বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন হঠাৎ তাহার মনকে একটা আশঙ্কা আক্রমণ করিয়া ধরিল,— যে নূতন জীবনযাত্রার পথে সে পদক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহা তাহার সম্মুখে অতিদূরবিসর্পিত দুর্গম শৈলপথের মতো প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল।

সমস্ত শিষ্টালাপের মধ্যে নিজের প্রতি অবিশ্বাস হেমনলিনীর মনকে আজ ভিতরে ভিতরে ব্যথিত করিতে লাগিল।

এই অবস্থায় যখন ক্ষেমংকরী বিবাহের প্রস্তাবটাকে কতকটা প্রত্যাখ্যান করিয়া লইলেন, তখন হেমনলিনীর মনে দুই বিপরীত ভাবের উদয় হইল। বিবাহবন্ধনের মধ্যে শীঘ্র ধরা দিয়া নিজের সংশয়দোলায়িত

দুর্বল অবস্থা হইতে শীঘ্র নিষ্কৃতি পাইবার ইচ্ছা তাহার থাকাতে প্রস্তাবটাকে সে অনতিবিলম্বে পাকা করিয়া ফেলিতে চায়— অথচ প্রস্তাবটা চাপা পড়িবার উপক্রম হইতেছে দেখিয়া উপস্থিতমতো সে একটা আরামও পাইল।

ক্ষেমংকরী কথাটা বলিয়াই হেমনলিনীর মুখের ভাব কটাক্ষপাতের দ্বারা লক্ষ্য করিয়া লইলেন। তাঁহার মনে হইল, যেন এতক্ষণ পরে হেমনলিনীর মুখের উপরে একটা শান্তির স্নিগ্ধতা অবতীর্ণ হইল। তাহাতে তাঁহার মনটা তৎক্ষণাৎ হেমনলিনীর প্রতি বিমুখ হইয়া উঠিল। তিনি মনে মনে কহিলেন, "আমার নলিনকে আমি এত সস্তায় বিলাইয়া দিতে বসিয়াছিলাম।" নলিনাক্ষ আজ যে আসিতে দেরি করিতেছে, ইহাতে তিনি খুশি হইলেন। হেমনলিনীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "দেখেছ নলিনাক্ষের আক্কেল। তোমরা আজ এখানে আসিবে সে জানে, তবু তাহার দেখা নাই। আজ না হয় কাজ কিছু কমই করিত। এই তো আমার একটু ব্যামো হলেই সে কাজকর্ম বন্ধ করিয়া বাড়িতেই থাকে— তাহাতে এতই কী লোকসান হয়।"

এই বলিয়া আহারের আয়োজন কতদূর অগ্রসর হইয়াছে দেখিবার উপলক্ষ্যে কিছুক্ষণের ছুটি লইয়া ক্ষেমংকরী উঠিয়া আসিলেন। তাঁহার ইচ্ছা, হেমনলিনীকে তিনি কমলার উপর ভিড়াইয়া দিয়া নিরীহ বৃদ্ধটিকে লইয়া কথাবার্তা কহিবেন।

তিনি দেখিলেন, প্রস্তুত অন্ন মৃদু আগুনের আঁচে বসাইয়া রাখিয়া কমলা রান্নাঘরের এক কোণে চুপটি করিয়া এমন গভীরভাবে কী-একটা ভাবিতেছিল যে, ক্ষেমংকরীর হঠাৎ আবির্ভাবে সে একেবারে চমকিয়া উঠিল। পরক্ষণেই লজ্জিত হইয়া স্মিতমুখে উঠিয়া দাঁড়াইল। ক্ষেমংকরী

কহিলেন, "ওমা, আমি বলি, তুমি বুঝি রান্নার কাজে ভারি ব্যস্ত হইয়া আছ।"

কমলা কহিল, "রান্না সমস্ত সারা হইয়া গেছে মা।"

ক্ষেমংকরী কহিলেন, "তা, এখানে চুপ করিয়া বসিয়া আছ কেন মা। অন্নদাবাবু বুড়োমানুষ, তাঁর সামনে বাহির হইতে লজ্জা কী। হেম আসিয়াছে তাঁহাকে তোমার ঘরে ডাকিয়া লইয়া একটু গল্পসল্প করো'সে। আমি বুড়োমানুষ, আমার কাছে বসাইয়া রাখিয়া তাহাকে দুঃখ দিব কেন।"

হেমনলিনীর নিকট হইতে প্রত্যাহত হইয়া কমলার প্রতি ক্ষেমংকরীর স্নেহ দ্বিগুণ হইয়া উঠিল।

কমলা সংকুচিত হইয়া কহিল, "মা, আমি তাঁর সঙ্গে কী গল্প করিব। তিনি কত লেখাপড়া জানেন, আমি কিছুই জানি না।"

ক্ষেমংকরী কহিলেন, "সে কী কথা। তুমি কাহারও চেয়ে কম নও মা। লেখাপড়া শিখিয়া যিনি আপনাকে যত বড়োই মনে করুন, তোমার চেয়ে বেশি আদর পাইবার যোগ্য কয়জন আছে? বই পড়িলে সকলেই বিদ্বান হইতে পারে, কিন্তু তোমার মতো অমন লক্ষ্মীটি হওয়া কি সকলের সাধ্য। এসো মা, এসো। কিন্তু তোমার এ-বেশে চলিবে না। তোমার উপযুক্ত সাজে তোমাকে আজ সাজাইব।"

সকল দিকেই ক্ষেমংকরী আজ হেমনলিনীর গর্ব খাটো করিতে উদ্যত হইয়াছেন। রূপেও তিনি তাহাকে এই অল্পশিক্ষিতা মেয়েটির কাছে ম্লান করিতে চান। কমলা আপত্তি করিবার অবকাশ পাইল না। তাহাকে ক্ষেমংকরী নিপুণহস্তে মনের মতো করিয়া সাজাইয়া দিলেন, ফিরোজা রঙের রেশমি শাড়ি পরাইলেন, নূতন ফ্যাশানের খোঁপা রচনা করিলেন—বার বার কমলার মুখ এ-দিকে ফিরাইয়া ও-দিকে ফিরাইয়া

দেখিলেন এবং মুগ্ধচিত্তে তাহার কপোল চুম্বন করিয়া কহিলেন, "আহা, এ-রূপ রাজার ঘরে মানাইত।"

কমলা মাঝে মাঝে কহিল, "মা, উঁহারা একলা বসিয়া আছেন— দেরি হইয়া যাইতেছে।"

ক্ষেমংকরী কহিলেন, "তা, হোক দেরি। আজ আমি তোমাকে না সাজাইয়া যাইব না।"

সাজ সারা হইলে তিনি কমলাকে সঙ্গে করিয়া চলিলেন, "এসো এসো মা,—লজ্জা করিয়ো না। তোমাকে দেখিয়া কালেজে-পড়া-বিদুষী রূপসীরা লজ্জা পাইবেন, তুমি সকলের কাছে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পার।"

এই বলিয়া যে ঘরে অন্নদাবাবুরা বসিয়া ছিলেন, সেই ঘরে ক্ষেমংকরী জোর করিয়া কমলাকে টানিয়া লইয়া গেলেন। গিয়া দেখিলেন, নলিনাক্ষ তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ করিতেছে। কমলা তাড়াতাড়ি ফিরিয়া যাইবার উপক্রম করিল, কিন্তু ক্ষেমংকরী তাহাকে ধরিয়া রাখিলেন—কহিলেন, "লজ্জা কী মা, লজ্জা কিসের। সব আপনার লোক।"

কমলার রূপে এবং সজ্জায় ক্ষেমংকরী নিজের মনে একটা গর্ব অনুভব করিতেছিলেন— তাহাকে দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হউক, এই তাঁহার ইচ্ছা। পুত্রাভিমানিনী জননী তাঁহার নলিনাক্ষের প্রতি হেমনলিনীর অবজ্ঞা কল্পনা করিয়া আজ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন, আজ নলিনাক্ষের কাছেও হেমনলিনীকে খর্ব করিতে পারিলে তিনি খুশি হন।

কমলাকে দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইল। হেমনলিনী প্রথম দিন যখন তাঁহার পরিচয় লাভ করিয়াছিল, তখন কমলার সাজসজ্জা কিছুই ছিল না— সে মলিনভাবে সংকুচিত হইয়া এক ধারে বসিয়া ছিল, তাও বেশিক্ষণ ছিল না। তাহাকে সে-দিন ভালো করিয়া দেখাই হয় নাই।

আজ মুহূর্তকাল সে বিস্মিত হইয়া রহিল, তাহার পরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া লজ্জিতা কমলার হাত ধরিয়া তাহাকে আপনার পাশে বসাইল।

ক্ষেমংকরী বুঝিলেন, তিনি জয়লাভ করিয়াছেন— উপস্থিত-সভায় সকলকেই মনে মনে স্বীকার করিতে হইয়াছে, এমন রূপ দৈবপ্রসাদেই দেখিতে পাওয়া যায়। তখন তিনি কমলাকে কহিলেন, "যাও তো মা, তুমি হেমকে তোমার ঘরে লইয়া গল্পসল্প করো গে যাও। আমি ততক্ষণ খাবার জায়গা করি গে।"

কমলার মনের মধ্যে একটা আন্দোলন উপস্থিত হইল। সে ভাবিতে লাগিল, "হেমনলিনীর আমাকে কেমন লাগিবে কে জানে।"

এই হেমনলিনী একদিন এই ঘরের বধূ হইয়া আসিবে, কর্ত্রী হইয়া উঠিবে— ইহার সুদৃষ্টিকে কমলা উপেক্ষা করিতে পারে না। এ-বাড়ির গৃহিণীপদ তাহারই ছিল, কিন্তু সে-কথা সে মনেও আনিতে চায় না— ঈর্ষাকে সে কোনোমতেই অন্তরে স্থান দিবে না— তাহার কোনো দাবি নাই। তাই হেমনলিনীর সঙ্গে যাইবার সময় তাহার পা কাঁপিয়া যাইতে লাগিল।

হেমনলিনী আস্তে আস্তে কমলাকে কহিল, "তোমার সব কথা আমি মার কাছে শুনিয়াছি। শুনিয়া বড়ো কষ্ট হইল। তুমি আমাকে তোমার বোনের মতো দেখিয়ো ভাই। তোমার কি বোন কেহ আছে।"

কমলা হেমনলিনীর সস্নেহ সকরুণ কণ্ঠস্বরে আশ্বস্ত হইয়া কহিল, "আমার আপন বোন কেহ নাই, আমার একটি খুড়তুতো বোন আছে।"

হেমনলিনী কহিল, "ভাই, আমার বোন কেহ নাই। আমি যখন ছোটো ছিলাম, তখন আমার মা মারা গেছেন। কতবার কত সুখ-দুঃখের সময় ভাবিয়াছি, 'মা তো নাই, তবু যদি আমার একটি বোন থাকিত।' ছেলেবেলা হইতে সব কথা কেবল মনের মধ্যেই চাপিয়া

রাখিতে হইয়াছে, শেষকালে এমন অভ্যাস হইয়া গেছে যে, আজ মন খুলিয়া কোনো কথা বলিতেই পারি না। লোকে মনে করে, আমার ভারি দেমাক— কিন্তু তুমি ভাই এমন কথা কখনো মনে করিয়ো না। আমার মন যে বোবা হইয়া গেছে।"

কমলার মন হইতে সমস্ত বাধা কাটিয়া গেল—সে কহিল, "দিদি, আমাকে কি তোমার ভালো লাগিবে। আমাকে তো তুমি জান না, আমি ভারি মূর্খ।"

হেমনলিনী হাসিয়া কহিল, "আমাকে যখন তুমি ভালো করিয়া জানিবে, দেখিবে আমিও ঘোর মূর্খ। আমি কেবল গোটাকতক বই পড়িয়া মুখস্থ করিয়াছি, আর কিছুই জানি না। তাই আমি তোমাকে বলি, যদি আমার এ-বাড়িতে আসা হয়, তুমি আমাকে কখনো ছাড়িয়ো না ভাই। কোনোদিন সংসারের ভার আমার একলার হাতে পড়িয়াছে মনে করিলে আমার ভয় হয়।"

কমলা শিশুর মতো সরল চিত্তে কহিল, "ভার তুমি সমস্ত আমার উপর দিয়ো। আমি ছেলেবেলা হইতে কাজ করিয়া আসিয়াছি, আমি কোনো ভার লইতে ভয় করি না। আমরা দুইবোনে মিলিয়া সংসার চালাইব,— তুমি তাঁহাকে সুখে রাখিবে, আমি তোমাদের সেবা করিব।"

হেমনলিনী কহিল, "আচ্ছা ভাই, তোমার স্বামীকে তো তুমি ভালো করিয়া দেখো নাই, তাঁহাকে তোমার মনে পড়ে?"

কমলা কথার স্পষ্ট উত্তর না দিয়া কহিল, "স্বামীকে যে মনে করিতে হয়, তাহা আমি জানিতাম না দিদি। খুড়ার বাড়িতে যখন আসিলাম, তখন আমার খুড়তুতো বোন শৈলদিদির সঙ্গে আমার ভালো করিয়া পরিচয় হইল। তিনি তাঁহার স্বামীকে যে-রকম করিয়া সেবা করেন,

তাহা চক্ষে দেখিয়া আমার প্রথম চৈতন্য জন্মিল। আমি যে-স্বামীকে কখনো দেখি নাই বলিলেই হয়, আমার সমস্ত মনের ভক্তি তাঁহার উদ্দেশে যে কেমন করিয়া গেল, তাহা আমি বলিতে পারি না। ভগবান আমার সেই পূজার ফল দিয়াছেন— এখন আমার স্বামী আমার মনের সম্মুখে স্পষ্ট করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছেন— তিনি আমাকে গ্রহণ না-ই করিলেন, কিন্তু আমি তাঁহাকে এখন পাইয়াছি।"

কমলার এই ভক্তিসিঞ্চিত কথা কয়টি শুনিয়া হেমনলিনীর অন্তঃকরণ আর্দ্র হইয়া গেল। সে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "তোমার কথা আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি। অমনি করিয়া পাওয়াই পাওয়া। আর-সমস্ত পাওয়া লোভের পাওয়া— তাহা নষ্ট হইয়া যায়।"

কমলা এ-কথা সম্পূর্ণ বুঝিল কিনা, বলা যায় না;— সে হেমনলিনীর দিকে চাহিয়া রহিল,— খানিক বাদে কহিল, "তুমি যাহা বলিতেছ দিদি, তা সত্যই হইবে। আমি মনে কোনো দুঃখ আসিতে দিই না— আমি ভালোই আছি ভাই। আমি যেটুকু পাইয়াছি, তাই আমার লাভ।"

হেমনলিনী কমলার হাত নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া কহিল, "যখন ত্যাগ এবং লাভ একেবারে সমান হইয়া যায়, তখনই তাহা যথার্থ লাভ, এই কথা আমার গুরু বলেন। সত্য বলিতেছি বোন, তোমার মতো অমনি সমস্ত নিবেদন করিয়া দিয়া যে-সার্থকতা, তাহাই যদি আমার ঘটে, তবে আমি ধন্য হইব।"

কমলা কিছু বিস্মিত হইয়া কহিল, "কেন দিদি, তুমি তো সবই পাইবে, তোমার তো কোনো অভাবই থাকিবে না।"

হেমনলিনী কহিল, "যেটুকু পাইবার মতো পাওয়া, সেটুকু পাইয়াই যেন সুখী হইতে পারি— তার চেয়ে বেশি যতটুকুই পাওয়া যায়, তার অনেক ভার, অনেক দুঃখ। আমার মুখে এ-সব কথা তোমার আশ্চর্য

লাগিরে— আমার নিজেরও আশ্চর্য লাগে— কিন্তু এ-সব কথা ঈশ্বর আমাকে ভাবাইতেছেন। জান না বোন, আজ আমার মনে কী ভার চাপিয়া ছিল— তোমাকে পাইয়া আমার হৃদয় হালকা হইল— আমি বল পাইলাম— তাই আমি এত বকিতেছি। আমি কখনো কথা কহিতে পারি না— তুমি কেমন করিয়া আমার সব কথা টানিয়া লইতেছ ভাই ?"

৫৯

ক্ষেমংকরীর নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া হেমনলিনী তাহাদের বসিবার ঘরের টেবিলের উপর একখানা মস্ত ভারি চিঠি পাইল। লেফাফার উপরকার হস্তাক্ষর দেখিয়াই বুঝিতে পারিল, চিঠিখানি রমেশের লেখা। স্পন্দিতবক্ষে চিঠিখানি হাতে করিয়া শয়নগৃহে দ্বার রুদ্ধ করিয়া পড়িতে লাগিল।

চিঠিতে রমেশ কমলাসম্বন্ধীয় সমস্ত ব্যাপার আনুপূর্বিক বিস্তারিত-ভাবে লিখিয়াছে। উপসংহারে লিখিয়াছে,

"তোমার সহিত আমার যে-বন্ধন ঈশ্বর দৃঢ় করিয়া দিয়াছিলেন, সংসার তাহা ছিন্ন করিয়াছে। তুমি এখন অন্যের প্রতি চিত্ত সমর্পণ করিয়াছ—সেজন্য আমি তোমাকে কোনো দোষ দিতে পারি না— কিন্তু তুমিও আমাকে দোষ দিয়ো না। যদিও আমি একদিনের জন্যও কমলার প্রতি স্ত্রীর মতো ব্যবহার করি নাই, তথাপি ক্রমশ সে যে আমার হৃদয় আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিল, এ-কথা তোমার কাছে আমার স্বীকার করা কর্তব্য। আজ আমার হৃদয় কী অবস্থায় আছে, তাহা আমি নিশ্চয় জানি না। তুমি যদি আমাকে ত্যাগ না করিতে, তবে তোমার মধ্যে আমি

আশ্রয় লাভ করিতে পারিতাম। সেই আশ্বাসেই আমি আমার বিক্ষিপ্ত চিত্ত লইয়া তোমার নিকট ছুটিয়া আসিয়াছিলাম। কিন্তু আজ যখন স্পষ্ট দেখিলাম—তুমি আমাকে ঘৃণা করিয়া আমার নিকট হইতে বিমুখ হইয়াছ, যখন শুনিলাম— অন্যের সহিত বিবাহসম্বন্ধে তুমি সম্মতি দিয়াছ, তখন আমারও মন আবার দোলায়িত হইয়া উঠিল। দেখিলাম, এখনো কমলাকে সম্পূর্ণ ভুলিতে পারি নাই। ভুলি বা না ভুলি, তাহাতে সংসারে আমি ছাড়া আর-কাহারও কোনো ক্ষতি নাই। আমারই বা ক্ষতি কিসের! সংসারে যে-দুটি রমণীকে আমি হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিয়াছি, তাঁহাদিগকে বিস্মৃত হইবার সাধ্য আমার নাই এবং তাঁহাদিগকে চিরজীবন স্মরণ করাই আমার পরম লাভ। আজ প্রাতে যখন তোমার সহিত ক্ষণিক সাক্ষাতের বিদ্যুদ্‌বৎ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম, তখন একবার মনে মনে বলিলাম, 'আমি হতভাগ্য।' কিন্তু আর আমি সে-কথা স্বীকার করিব না। আমি সবলচিত্তে আনন্দের সহিত তোমার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিতেছি— আমি পরিপূর্ণ-হৃদয়ে তোমার নিকট হইতে প্রস্থান করিব— তোমাদের কল্যাণে, বিধাতার কল্যাণে আমি অন্তরের মধ্যে এই বিদায়কালে যেন কিছুমাত্র দীনতা অনুভব না করি। তুমি সুখী হও, তোমার মঙ্গল হউক। আমাকে তুমি ঘৃণা করিয়ো না— আমাকে ঘৃণা করিবার কোনো কারণ তোমার নাই।"

অন্নদাবাবু চৌকিতে বসিয়া বই পড়িতেছিলেন। হঠাৎ হেমনলিনীকে দেখিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন— কহিলেন, "হেম, তোমার কি অসুখ করিয়াছে।"

হেমনলিনী কহিল, "অসুখ করে নাই। বাবা, রমেশবাবুর একখানি চিঠি পাইয়াছি। এই লও, পড়া হইলে আবার আমাকে ফেরত দিয়ো।"

এই বলিয়া চিঠি দিয়া হেমনলিনী চলিয়া গেল। অন্নদাবাবু চশমা লইয়া চিঠিখানি বারদুয়েক পড়িলেন— তাহার পরে হেমনলিনীর নিকট ফেরত পাঠাইয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। অবশেষে ভাবিয়া স্থির করিলেন, "এ একপ্রকার ভালোই হইয়াছে। পাত্রহিসাবে রমেশের চেয়ে নলিনাক্ষ অনেক বেশি প্রার্থনীয়। ক্ষেত্র হইতে রমেশ যে আপনিই সরিয়া পড়িল, এ হইল ভালো।"

এই কথা ভাবিতেছেন, এমন সময় নলিনাক্ষ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া অন্নদাবাবু একটু আশ্চর্য হইলেন। আজ পূর্বাহ্ণে নলিনাক্ষের সঙ্গে অনেকক্ষণ দেখাসাক্ষাৎ হইয়াছে, আবার কয়েক ঘণ্টা যাইতে না যাইতেই সে কী মনে করিয়া আসিল। বৃদ্ধ মনে মনে একটুখানি হাসিয়া স্থির করিলেন, "হেমনলিনীর প্রতি নলিনাক্ষের মন পড়িয়াছে।"

কোনো ছুতা করিয়া হেমনলিনীর সহিত নলিনাক্ষের দেখা করাইয়া দিয়া নিজে সরিয়া যাইবেন কল্পনা করিতেছেন, এমন সময় নলিনাক্ষ কহিল, "অন্নদাবাবু, আমার সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহের প্রস্তাব উঠিয়াছে। কথাটা বেশিদূর অগ্রসর হইবার পূর্বে আমার যাহা বক্তব্য আছে, বলিতে ইচ্ছা করি।"

অন্নদাবাবু কহিলেন, "ঠিক কথা, সে তো বলাই কর্তব্য।"

নলিনাক্ষ কহিল, "আপনি জানেন না, পূর্বেই আমার বিবাহ হইয়াছে।"

অন্নদাবাবু কহিলেন, "জানি। কিন্তু—"

নলিনাক্ষ। আপনি জানেন শুনিয়া আশ্চর্য হইলাম। কিন্তু তাঁহার

মৃত্যু হইয়াছে, এইরূপ আপনি অনুমান করিতেছেন। নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। এমন কি, তিনি বাঁচিয়া আছেন বলিয়া আমি বিশ্বাস করি।

অন্নদাবাবু কহিলেন, "ঈশ্বর করুন, তাহাই যেন সত্য হয়। হেম! হেম!"

হেমনলিনী আসিয়া কহিল, "কী বাবা।"

অন্নদাবাবু। রমেশ তোমাকে যে চিঠি লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে যে-অংশটুকু—

হেমনলিনী সেই চিঠিখানি নলিনাক্ষের হাতে দিয়া কহিল, "এ-চিঠির সবটাই উঁহার পড়িয়া দেখা কর্তব্য।" এই বলিয়া হেমনলিনী চলিয়া গেল।

চিঠিখানি পড়া শেষ করিয়া নলিনাক্ষ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। অন্নদাবাবু কহিলেন, "এমন শোচনীয় ঘটনা সংসারে প্রায় ঘটে না। চিঠিখানি পড়িতে দিয়া আপনার মনে আঘাত দেওয়া হইল— কিন্তু ইহা আপনার কাছে গোপন করাও আমাদের পক্ষে অন্যায় হইত।"

নলিনাক্ষ একটুখানি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া অন্নদাবাবুর কাছে বিদায় লইয়া উঠিল। চলিয়া যাইবার সময় উত্তরের বারান্দায় অদূরে হেমনলিনীকে দেখিতে পাইল।

হেমনলিনীকে দেখিয়া নলিনাক্ষের মনে আঘাত লাগিল। ওই যে নারী স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া, উহার স্থির-শান্ত মূর্তিটি উহার অন্তঃকরণকে কেমন করিয়া বহন করিতেছে? এই মুহূর্তে উহার মন যে কী করিতেছে, তাহা ঠিকমতো জানিবার কোনো উপায় নাই— নলিনাক্ষকে তাহার-কোনো প্রয়োজন আছে কিনা, সে-প্রশ্নও করা যায় না, তাহার উত্তর পাওয়াও কঠিন। নলিনাক্ষের পীড়িত চিত্ত ভাবিতে লাগিল,

"ইহাকে কোনো সান্ত্বনা দেওয়া যায় কি না। কিন্তু মানুষে মানুষে কী দুর্ভেদ্য ব্যবধান। মন জিনিসটা কী ভয়ংকর একাকী।"

নলিনাক্ষ একটু ঘুরিয়া ওই বারান্দার সামনে দিয়া গাড়িতে উঠিবে স্থির করিল—মনে করিল, যদি হেমনলিনী তাহাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করে ;— বারান্দার সম্মুখে যখন আসিল, দেখিল, হেমনলিনী বারান্দা ছাড়িয়া ঘরের মধ্যে সরিয়া গেছে। হৃদয়ের সহিত হৃদয়ের সাক্ষাৎ সহজ নহে, মানুষের সহিত মানুষের সম্বন্ধ সরল নহে, এই কথা চিন্তা করিয়া ভারাক্রান্তচিত্তে নলিনাক্ষ গাড়িতে উঠিল।

নলিনাক্ষ চলিয়া গেলে যোগেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইল। অন্নদাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী যোগেন, একলা যে।"

যোগেন্দ্র কহিল, "দ্বিতীয় আর-কোন্ ব্যক্তিকে প্রত্যাশা করিতেছ শুনি।"

অন্নদা কহিলেন, "কেন। রমেশ ?"

যোগেন্দ্র। তাহার প্রথম দিনের অভ্যর্থনাটাই কি ভদ্রলোকের পক্ষে যথেষ্ট হয় নাই। কাশীর গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া মরিয়া যদি তাহার শিবত্বলাভ না হইয়া থাকে, তবে আর কী হইয়াছে, আমি নিশ্চয় জানি না। কাল হইতে এ-পর্যন্ত তাহার আর দেখা নাই, টেবিলে একখানা কাগজে লেখা আছে— "পালাই— তোমার রমেশ।" এ-সব কবিত্ব আমার কোনোকালে অভ্যাস নাই। সুতরাং আমাকেও এখান হইতে পালাইতে হইল—আমার হেডমাস্টারিই ভালো—তাহাতে সমস্তই খুব স্পষ্ট—ঝাপসা কিছুই নাই।

অন্নদাবাবু কহিলেন, "হেমের জন্য তো একটা কিছু স্থির—"

যোগেন্দ্র। আর কেন। আমিই কেবল স্থির করিব, আর তোমরা অস্থির করিতে থাকিবে, এ-খেলা বেশিদিন ভালো লাগে না। আমাকে

আর-কিছুতে জড়াইয়ো না— আমি যাহা ভালো বুঝিতে পারি না, সেটা আমার ধাতে সয় না। হঠাৎ দুর্বোধ হইয়া পড়িবার যে আশ্চর্য ক্ষমতা হেমের আছে, সেটা আমাকে কিছু কাবু করে। কাল সকালের গাড়িতে আমি বিদায় হইব, পথে বাঁকিপুরে আমার কাজ আছে।

অন্নদাবাবু চুপ করিয়া বসিয়া নিজের মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। সংসারের সমস্যা আবার দুরূহ হইয়া আসিয়াছে।

৬০

শৈলজা এবং তাহার পিতা নলিনাক্ষের বাড়িতে আসিয়াছেন। শৈলজা কমলাকে লইয়া একটা কোণের ঘরে বসিয়া ফিসফিস করিতেছিল, চক্রবর্তী ক্ষেমংকরীর সঙ্গে আলাপ করিতেছিলেন।

চক্রবর্তী। আমার তো ছুটি ফুরাইয়া আসিল— কালই গাজিপুরে যাইতে হইবে। যদি হরিদাসী আপনাদের কোনোরকমে বিরক্ত করিয়া থাকে— বা যদি আপনাদের পক্ষে—

ক্ষেমংকরী। ও আবার কী-রকম কথা চক্রবর্তীমশায়। আপনার মনের ভাবটা কী শুনি। আপনি কি কোনো ছুতা করিয়া আপনাদের মেয়েটিকে ফিরাইয়া লইতে চান।

চক্রবর্তী। আমাকে তেমন লোক পান নাই। আমি দিয়া ফিরাইয়া লইবার পাত্র নই— কিন্তু যদি আপনার কিছুমাত্র অসুবিধা হয়—

ক্ষেমংকরী। চক্রবর্তীমশায়, ওটা আপনার সরল কথা নয়— মনে মনে বেশ জানেন, হরিদাসীর মতো অমন লক্ষ্মী মেয়েটিকে কাছে রাখিলে সুবিধার সীমা নাই, তবু—

চক্রবর্তী। না না, আর বলিতে হইবে না— আমি ধরা পড়িয়া গেছি। ওটা একটা ছলমাত্র— আপনার মুখে হরিদাসীর গুণ শুনিবার জন্যই কথাটা আমার পাড়া। কিন্তু একটা ভাবনা আছে— পাছে নলিনাক্ষবাবু মনে করেন যে, এ আবার একটা উপসর্গ কোথা হইতে ঘাড়ে পড়িল। আমাদের মেয়েটি অভিমানী— যদি নলিনাক্ষের লেশমাত্র বিরক্তিভাব ও দেখিতে পায়, তবে উহার পক্ষে বড়ো কঠিন হইবে।

ক্ষেমংকরী। হরি বলো। নলিনের আবার বিরক্তি। ওর সে ক্ষমতাই নাই।

চক্রবর্তী। সে-কথা ঠিক। কিন্তু দেখুন, হরিদাসীকে আমি নাকি প্রাণের চেয়ে ভালোবাসি, তাই তার সম্বন্ধে আমি অল্পে সন্তুষ্ট হইতে পারি না। নলিনাক্ষ যে ওর 'পরে বিরক্ত হইবেন না, উদাসীনের মতো থাকিবেন, এইটুকুই আমার পক্ষে যথেষ্ট মনে হয় না। তাঁর বাড়িতে যখন হরিদাসী আছে, তখন তাকে তিনি আপনার লোক বলিয়া স্নেহ করিবেন, এ না হইলে মনে বড়ো সংকোচ বোধ হয়। ও তো ঘরের দেয়াল নয়, ও একটা মানুষ— ওর প্রতি বিরক্তও হইবেন না, স্নেহও করিবেন না, ও আছে তো আছে, এইটুকুমাত্র সম্বন্ধ, সেটা যেন কেমন—

ক্ষেমংকরী। চক্রবর্তীমশায়, আপনি বেশি ভাবিবেন না— কোনো লোককে আপনার লোক বলিয়া স্নেহ করা আমার নলিনের পক্ষে শক্ত নয়। বাহির হইতে কিছুই বুঝিবার জো নাই, কিন্তু এই যে হরিদাসী আমার এখানে আছে, ও কিসে স্বচ্ছন্দে থাকে, ওর কিসে ভালো হয়, সে-চিন্তা নিশ্চয়ই নলিনের মনে লাগিয়া আছে, খুব সম্ভব, সে-রকম ব্যবস্থাও সে কিছু-না-কিছু করিতেছে, আমরা তাহা জানিতেও পারিতেছি না।

চক্রবর্তী। শুনিয়া বড়ো নিশ্চিন্ত হইলাম। তবু আমি যাইবার আগে একবার বিশেষ করিয়া নলিনাক্ষবাবুকে বলিয়া যাইতে চাই। একটি স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ ভার লইতে পারে, এমন পুরুষ জগতে অল্পই মেলে— ভগবান যখন নলিনাক্ষবাবুকে সেই যথার্থ পৌরুষ দিয়াছেন, তখন তিনি যেন মিথ্যা সংকোচে হরিদাসীকে তফাতে রাখিয়া না চলেন, তিনি যেন যথার্থ আত্মীয়ের মতো তাহাকে নিতান্ত সহজভাবে গ্রহণ ও রক্ষা করেন, তাঁহার কাছে এই প্রার্থনাটি জানাইতে চাই।

নলিনাক্ষের প্রতি চক্রবর্তীর এই বিশ্বাস দেখিয়া ক্ষেমংকরীর মন গলিয়া গেল। তিনি কহিলেন, "পাছে আপনারা কিছু মনে করেন, এই ভয়েই হরিদাসীকে আমি নলিনাক্ষের সামনে তেমন করিয়া বাহির হইতে দিই নাই— কিন্তু আমার ছেলেকে আমি তো জানি, তাহাকে বিশ্বাস করিয়া আপনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন।"

চক্রবর্তী। তবে আপনার কাছে সব কথা খোলসা করিয়াই বলি। শুনিয়াছি, নলিনাক্ষবাবুর বিবাহের প্রস্তাব হইতেছে— বধূটির বয়সও নাকি অল্প নয় এবং তাঁহার শিক্ষাদিক্ষা আমাদের সমাজের সঙ্গে মেলে না। তাই ভাবিতেছিলাম, হয়তো হরিদাসীর—

ক্ষেমংকরী। সে আর আমি বুঝি না! সে হইলে ভাবনা ছিল বই কি। কিন্তু সে-বিবাহ হইবে না—

চক্রবর্তী। সম্বন্ধ ভাঙিয়া গেছে?

ক্ষেমংকরী। গড়েইনি, তার ভাঙিবে কী। নলিনের একেবারেই ইচ্ছা ছিল না, আমিই জেদ করিতেছিলাম। কিন্তু সে-জেদ ছাড়িয়াছি। যাহা হইবার নয়, তাহা জোর করিয়া ঘটাইয়া মঙ্গল নাই। ভগবানের কী ইচ্ছা, জানি না— মরিবার পূর্বে বুঝি আর বউ দেখিয়া যাইতে পারিলাম না।

চক্রবর্তী। অমন কথা বলিবেন না। আমরা আছি কী করিতে। ঘটক-বিদায় এবং মিষ্টান্ন আদায় না করিয়া ছাড়িব বুঝি ?

ক্ষেমংকরী। আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক চক্রবর্তীমশায়। আমার মনে বড়ো দুঃখ আছে যে, নলিন এই বয়সে আমারই জন্যে সংসারধর্মে প্রবেশ করিতে পারিল না। তাই আমি বড়ো ব্যস্ত হইয়া সকল দিক না ভাবিয়া একটা সম্বন্ধ করিয়া বসিয়াছিলাম— সে-আশা ত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু আপনারা একটা দেখিয়া দিন। দেরি করিবেন না। আমি বেশিদিন বাঁচিব না।

চক্রবর্তী। ও-কথা বলিলে শুনিব কেন। আপনাকে বাঁচিতেও হইবে, বউয়েরও মুখ দেখিবেন। আপনার যে-রকম বউটি দরকার, সে আমি ঠিক জানি ; নিতান্ত কচি হইলেও চলিবে না, অথচ আপনাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করিবে, বাধ্য হইয়া চলিবে—এ নহিলে আমাদের পছন্দ হইবে না। তা সে আপনি কিছুই ভাবিবেন না—ঈশ্বরের কৃপায় নিশ্চয়ই সে ঠিক হইয়াই আছে। এখন যদি অনুমতি করেন, একবার হরিদাসীকে তার কর্তব্যসম্বন্ধে দু-চারটে কথা উপদেশ করিয়া আসি— অমনি শৈলকেও এখানে পাঠাইয়া দিই— আপনাকে দেখিয়া অবধি আপনার কথা তাহার মুখে আর ধরে না।

ক্ষেমংকরী কহিলেন, "না, আপনারা তিনজনেই এক ঘরে গিয়া বসুন, আমার একটু কাজ আছে।"

চক্রবর্তী হাসিয়া কহিলেন, "জগতে আপনাদের কাজ আছে বলিয়াই আমাদের কল্যাণ। কাজের পরিচয় নিশ্চয়ই যথাসময়ে পাওয়া যাইবে। নলিনাক্ষবাবুর বধূর কল্যাণে ব্রাহ্মণের ভাগ্যে মিষ্টান্নের পালা শুরু হউক।"

চক্রবর্তী, শৈল ও কমলার কাছে আসিয়া দেখিলেন, কমলার দুটি চক্ষু চোখের জলের আভাসে এখনো ছলছল করিতেছে। চক্রবর্তী

শৈলজার পাশে বসিয়া নীরবে তাহার মুখের দিকে একবার চাহিলেন। শৈল কহিল, "বাবা, আমি কমলকে বলিতেছিলাম যে, নলিনাক্ষবাবুকে সকল কথা খুলিয়া বলিবার এখন সময় হইয়াছে, তাই লইয়া তোমার এই নির্বোধ হরিদাসী আমার সঙ্গে ঝগড়া করিতেছে।"

কমলা বলিয়া উঠিল, "না দিদি, না, তোমার দুটি পায়ে পড়ি—তুমি এমন কথা মুখে আনিয়ো না। সে কিছুতেই হইবে না।"

শৈল কহিল, "কী তোমার বুদ্ধি। তুমি চুপ করিয়া থাক আর হেমনলিনীর সঙ্গে নলিনাক্ষবাবুর বিবাহ হইয়া যাক। বিবাহের পরদিন হইতে আর আজ পর্যন্ত কেবলই তো যত রাজ্যের অঘটন-ঘটনার মধ্যে পাক খাইয়া মরিলি, আবার আর-একটা নূতন অনাসৃষ্টির দরকার কী।"

কমলা কহিল, "দিদি, আমার কথা কাহাকেও বলিবার নয়, আমি সব সহিতে পারিব, সে-লজ্জা সহিতে পারিব না। আমি যেমন আছি, বেশ আছি, আমার কোনো দুঃখ নাই, কিন্তু যদি সব কথা প্রকাশ করিয়া দাও, তবে আমি কোন্ মুখে আর এক দণ্ড এ-বাড়িতে থাকিব। তবে আমি বাঁচিব কী করিয়া।"

শৈল এ-কথার কোনো উত্তর দিতে পারিল না, কিন্তু তাই বলিয়া হেমনলিনীর সঙ্গে নলিনাক্ষের বিবাহ হইয়া যাইবে, ইহা চুপ করিয়া সহ্য করা তাহার পক্ষে বড়ো কঠিন।

চক্রবর্তী কহিলেন, "যে-বিবাহের কথা বলিতেছ, সেটা ঘটিতেই হইবে, এমন কী কথা আছে।"

শৈল। বল কী বাবা, নলিনাক্ষবাবুর মা যে আশীর্বাদ করিয়া আসিয়াছেন।

চক্রবর্তী। বিশ্বেশ্বরের আশীর্বাদে সে-আশীর্বাদ ফাঁসিয়া গেছে। মা কমল, তোমার কোনো ভয় নাই, ধর্ম তোমার সহায় আছেন।

কমলা সব কথা স্পষ্ট না বুঝিয়া দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া খুড়া-মশায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

তিনি কহিলেন, "সে-বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙিয়া গেছে। এ-বিবাহে নলিনাক্ষবাবুও রাজি নহেন এবং তাঁহার মার মাথায়ও সুবুদ্ধি আসিয়াছে।"

শৈলজা ভারি খুশি হইয়া কহিল, "বাঁচা গেল বাবা। কাল এই খবরটা শুনিয়া রাত্রে আমি ঘুমাইতে পারি নাই। কিন্তু সে যাই হোক, কমল কি নিজের ঘরে চিরদিন এমনি পরের মতো কাটাইবে। কবে সব পরিষ্কার হইয়া যাইবে।"

চক্রবর্তী। ব্যস্ত হোস কেন শৈল। যখন ঠিক সময় আসিবে, তখন সমস্ত সহজ হইয়া যাইবে।

কমলা কহিল, "এখন যা হইয়াছে, এই সহজ—এর চেয়ে সহজ আর-কিছু হইতে পারে না। আমি বেশ সুখে আছি, আমাকে এর চেয়ে সুখ দিতে গিয়া আবার আমার ভাগ্যকে ফিরাইয়া দিয়ো না খুড়ামশায়। আমি তোমাদের পায়ে ধরি, তোমরা কাহাকেও কিছু বলিয়ো না, আমাকে এই ঘরের একটা কোণে ফেলিয়া আমার কথা ভুলিয়া যাও। আমি খুব সুখে আছি।" বলিতে বলিতে কমলার দুই চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

চক্রবর্তী ব্যস্তসমস্ত হইয়া কহিলেন, "ও কী মা, কাঁদ কেন। তুমি যাহা বলিতেছ, আমি বেশ বুঝিতেছি। তোমার এই শান্তিতে আমরা কি হাত দিতে পারি। বিধাতা আপনি যাহা ধীরে ধীরে করিতেছেন, আমরা নির্বোধের মতো তার মধ্যে পড়িয়া কি সমস্ত ভণ্ডুল করিয়া দিব। কোনো ভয় নাই। আমার এত বয়স হইয়া গেল, আমি কি স্থির হইয়া থাকিতে জানি না।"

এমন সময় উমেশ ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহার আকর্ণবিস্ফারিত হাস্য লইয়া দাঁড়াইল।

খুড়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী রে উমেশ, খবর কী।"

উমেশ কহিল, "রমেশবাবু নিচে দাঁড়াইয়া আছেন ডাক্তারবাবুর কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন।"

কমলার মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। খুড়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলেন। — কহিলেন, "ভয় নাই মা, আমি সব ঠিক করিয়া দিতেছি।"

খুড়া নিচে আসিয়া একেবারে রমেশের হাত ধরিয়া কহিলেন, "আসুন রমেশবাবু, রাস্তায় বেড়াইতে বেড়াইতে আপনার সঙ্গে গোটাদুয়েক কথা কহিব।"

রমেশ আশ্চর্য হইয়া কহিল, "খুড়ামশায়, আপনি এখানে কোথা হইতে।"

খুড়া কহিলেন, "আপনার জন্যই আছি— দেখা হইল, বড়ো ভালো হইল। আসুন, আর দেরি নয়, কাজের কথাটা শেষ করিয়া ফেলা যাক।" বলিয়া রমেশকে রাস্তায় টানিয়া লইয়া কিছুদূর গিয়া কহিলেন, "রমেশবাবু, আপনি এ-বাড়িতে কেন আসিয়াছেন।"

রমেশ কহিল, "নলিনাক্ষ ডাক্তারকে খুঁজিতে আসিয়াছিলাম। তাঁহাকে কমলার কথা আগাগোড়া সমস্ত খুলিয়া বলা উচিত স্থির করিয়াছি। আমার এক-একবার মনে হয়, হয়তো কমলা বাঁচিয়া আছে।"

খুড়া কহিলেন, "যদি কমলা বাঁচিয়াই থাকে এবং যদি নলিনাক্ষের সঙ্গে তার দেখা হয়, তবে আপনার মুখে নলিনাক্ষ সমস্ত ইতিহাস শুনিলে কি সুবিধা হইবে। তাঁহার বৃদ্ধা মা আছেন, তিনি এ-সব কথা জানিতে পারিলে কমলার পক্ষে কি ভালো হইবে।"

রমেশ কহিল, "সামাজিক হিসাবে কী ফল হইবে, জানি না, কিন্তু কমলাকে যে কোনো অপরাধ স্পর্শ করে নাই, সেটা তো নলিনাক্ষের জানা চাই। কমলার যদি মৃত্যুই হইয়া থাকে, তবে নলিনাক্ষবাবু তাহার স্মৃতিকে তো সম্মান করিতে পারিবেন।"

খুড়া কহিলেন, "আপনাদের ও-সব একেলে কথা আমি কিছুই বুঝিতে পারি না— কমলা যদি মরিয়াই থাকে, তবে তাহার একরাত্রির স্বামীর কাছে তাহার স্মৃতিটাকে লইয়া টানাটানি করিবার কোনো দরকার দেখি না। ওই যে বাড়িটা দেখিতেছেন, ওই বাড়িতে আমার বাসা। কাল সকালে যদি একবার আসিতে পারেন, তবে আপনাকে সব কথা স্পষ্ট করিয়া বলিব। কিন্তু তাহার পূর্বে নলিনাক্ষবাবুর সঙ্গে দেখা করিবেন না, এই আমার অনুরোধ।"

রমেশ বলিল, "আচ্ছা।"

খুড়া ফিরিয়া আসিয়া কমলাকে কহিলেন, "মা, কাল সকালে তোমাকে আমাদের বাড়িতে যাইতে হইবে। সেখানে তুমি নিজে রমেশবাবুকে বুঝাইয়া বলিবে, এই আমি স্থির করিয়াছি।"

কমলা মাথা নিচু করিয়া বসিয়া রহিল। খুড়া কহিলেন, "আমি নিশ্চয় জানি, তাহা না হইলে চলিবে না—একেলে ছেলেদের কর্তব্যবুদ্ধি সেকেলে লোকের কথায় ভোলে না। মা, মন হইতে সংকোচ দূর করিয়া ফেলো— এখন তোমার যেখানে অধিকার, অন্য লোককে আর সেখানে পদার্পণ করিতে দিবে না, এ তো তোমারই কাজ। এ-সম্বন্ধে আমাদের তো তেমন জোর খাটিবে না।"

কমলা তবু মুখ নিচু করিয়া রহিল। খুড়া কহিলেন, "মা, অনেকটা পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে, এখন এই ছোটোখাটো জঞ্জালগুলো শেষ-বারের মতো ঝাঁটাইয়া ফেলিতে সংকোচ করিয়ো না।"

যায়, আজ যেন তেমন তাড়া করিল না। যদিও ক্ষণকালমাত্র কমলার দিকে সে চাহিয়াছিল, কিন্তু তাহার সেই ক্ষণকালের দৃষ্টি কমলার মুখ হইতে কী যেন আদায় করিয়া লইল, অন্যদিনের মতো অনধিকারের সংকোচে দেখিবার জিনিসটিকে প্রত্যাখ্যান করিল না। পরমুহূর্তেই শৈলজাকে দেখিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইতেই খুড়া কহিলেন, "নলিনাক্ষবাবু, পালাইবেন না— আপনাকে আমরা আত্মীয় বলিয়াই জানি। এটি আমার মেয়ে শৈল, এরই মেয়েকে আপনি চিকিৎসা করিয়াছেন।" শৈল নলিনাক্ষকে নমস্কার করিল এবং নলিনাক্ষ প্রতিনমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার মেয়েটি ভালো আছে?"

শৈল কহিল, "ভালো আছে।"

খুড়া কহিলেন, "আপনাকে যে পেট ভরিয়া দেখিয়া লইব এমন অবসর তো আপনি দেন না— এখন, আসিলেন যদি তো একটু বসুন।"

নলিনাক্ষকে বসাইয়া খুড়া দেখিলেন, পশ্চাৎ হইতে কমলা কখন সরিয়া পড়িয়াছে। নলিনাক্ষের সেই এক মুহূর্তের দৃষ্টিটি লইয়া সে পুলকিত বিস্ময়ে আপনার ঘরে মনটাকে সংবরণ করিতে গেছে।

ইতিমধ্যে ক্ষেমংকরী আসিয়া কহিলেন, "চক্রবর্তীমশায়, কষ্ট করিয়া একবার উঠিতে হইতেছে।"

চক্রবর্তী কহিলেন, "যখনই আপনি কাজে গেলেন, তখন হইতেই এটুকু কষ্টের জন্য আমি পথ চাহিয়া বসিয়া ছিলাম।"

আহার সমাধা হইলে পর বসিবার ঘরে আসিয়া চক্রবর্তী কহিলেন, "একটু বসুন, আমি আসিতেছি।" বলিয়া পরক্ষণেই অন্য ঘর হইতে

মনে করিয়া সংকোচ করিবেন না— এই দুঃখিনীকে আপনাদেরই ঘরে আমি রাখিয়া যাইতেছি— ইহাকে সম্পূর্ণই আপনাদের করিয়া লইবেন। ইহাকে আর-কিছু দিতে হইবে না, আপনাদের সকলের সেবা করিবার সম্পূর্ণ অধিকার দিবেন— আপনি নিশ্চয়ই জানিবেন, আপনাদের কাছে জ্ঞানপূর্বক এ একদিনের জন্যও অপরাধিনী হইবে না।"

কমলা লজ্জায় মুখখানি রাঙা করিয়া নতশিরে বসিয়া রহিল। ক্ষেমংকরী কহিলেন, "চক্রবর্তীমশায়, আপনি কিছুই ভাবিবেন না, হরিদাসী আমাদের ঘরের মেয়েই হইল। ওকে আমাদের কোনো কাজ দিবার জন্য আমাদের তরফ হইতে আজ পর্যন্ত কোনো চেষ্টা করিবার দরকারই হয় নাই। এ-বাড়ির রান্নাঘরে, ভাঁড়ারঘরে এতদিন আমার শাসনই একমাত্র প্রবল ছিল, এখন আমি সেখানে কেহই না। চাকরবাকররাও আমাকে আর বাড়ির গৃহিণী বলিয়া গণ্যই করে না। কেমন করিয়া যে আস্তে আস্তে আমার এমন অবস্থাটা হইল, তাহা আমি টেরও পাইলাম না। আমার গোটাকয়েক চাবি ছিল, সেও কৌশল করিয়া হরিদাসী আত্মসাৎ করিয়াছে— চক্রবর্তীমশায়, আপনার এই ডাকাত মেয়েটির জন্যে আপনি আর-কী চান বলুন দেখি। এখন সবচেয়ে বড়ো ডাকাতি হয়, যদি আপনি বলেন, এই মেয়েটিকে আমরা লইয়া যাইব।"

চক্রবর্তী কহিলেন, "আমি যেন বলিলাম, কিন্তু মেয়েটি কি নড়িবে। তা মনেও করিবেন না। উহাকে আপনারা এমন ভুলাইয়াছেন যে, আজ আপনারা ছাড়া ও আর পৃথিবীতে কাহাকেও জানে না। দুঃখের জীবনে এতদিন পরে ও আপনাদের কাছেই আজ শান্তি পাইয়াছে—

ভগবান ওর সেই শান্তি নির্বিঘ্ন করুন, আপনারা চিরদিন ওর 'পরে প্রসন্ন থাকুন, আমরা উহাকে সেই আশীর্বাদ করি।"

বলিতে বলিতে চক্রবর্তীর চক্ষু সজল হইয়া আসিল। নলিনাক্ষ কিছু না বলিয়া স্তব্ধ হইয়া চক্রবর্তীর কথা শুনিতেছিল; যখন সকলে বিদায় লইয়া গেলেন, তখন ধীরে ধীরে সে আপনার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। তখন শীতের সূর্যাস্তকাল তাহার সমস্ত শয়নঘরটিকে নববিবাহের রক্তিমচ্ছটায় রঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছিল। সেই রক্তবর্ণের আভা নলিনাক্ষের সমস্ত রোমকূপ ভেদ করিয়া তাহার অন্তঃকরণকে যেন রাঙাইয়া তুলিল।

আজ সকালে নলিনাক্ষের এক হিন্দুস্থানী বন্ধুর কাছ হইতে এক টুকরি গোলাপ আসিয়াছিল। ঘর সাজাইবার জন্য সেই গোলাপের টুকরি ক্ষেমংকরী কমলার হাতে দিয়াছিলেন। নলিনাক্ষের শয়নঘরের প্রান্তে একটি ফুলদানি হইতে সেই গোলাপের গন্ধ তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। সেই নিস্তব্ধ ঘরের বাতায়নে আরক্ত সন্ধ্যার সঙ্গে গোলাপের গন্ধ মিশিয়া নলিনাক্ষের মনকে কেমন যেন উতলা করিয়া তুলিল। এতদিন তাহার বিশ্বে চারিদিকে সংযমের শান্তি, জ্ঞানের গম্ভীরতা ছিল, আজ সেখানে হঠাৎ এমন নানাসুরের নহবত বাজিয়া উঠিল কোথা হইতে— কোন্ অদৃশ্য নৃত্যের চরণক্ষেপে ও নূপুরঝংকারে আজ আকাশতল এমন চঞ্চল হইয়া উঠিতে লাগিল।

নলিনাক্ষ জানালা হইতে ফিরিয়া ঘরের মধ্যে চাহিয়া দেখিল, তাহার বিছানার শিয়রের কাছে কুলুঙ্গির উপরে গোলাপফুলগুলি সাজানো রহিয়াছে। এই ফুলগুলি জানি না কাহার চোখের মতো তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, নিঃশব্দ আত্মনিবেদনের মতো তাহার হৃদয়ের দ্বারপ্রান্তে নত হইয়া পড়িল।

নলিনাক্ষ ইহার মধ্যে একটি ফুল তুলিয়া লইল— সেটি কাঁচা সোনার রঙের হলদে গোলাপ, পাপড়িগুলি খোলে নাই, কিন্তু গন্ধ লুকাইতে পারিতেছে না। সেই গোলাপটি হাতে লইতেই যেন সে কাহার আঙুলের মতো তাহার আঙুলকে স্পর্শ করিল, তাহার শরীরের সমস্ত স্নায়ুতন্তুকে রিমিঝিমি করিয়া বাজাইয়া তুলিল। নলিনাক্ষ সেই স্নিগ্ধকোমল ফুলটিকে নিজের মুখের উপরে, চোখের পল্লবের উপরে বুলাইতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যাকাশ হইতে অস্তসূর্যের আভা মিলাইয়া আসিল। নলিনাক্ষ ঘর হইতে বাহির হইবার পূর্বে একবার তাহার বিছানার কাছে গিয়া শয্যার আচ্ছাদনটি তুলিয়া ফেলিল এবং মাথার বালিশের উপর সেই গোলাপফুলটি রাখিল। রাখিয়া উঠিয়া আসিবে, এমন সময় খাটের ও-পাশে মেজের উপরে ও কে অঞ্চলে মুখ ঝাঁপিয়া লজ্জায় একেবারে মাটিতে মিশাইতে চাহিল। হায় রে কমলা, লজ্জা রাখিবার আর স্থান নাই। সে আজ কুলুঙ্গিতে গোলাপ সাজাইয়া স্বহস্তে নলিনাক্ষের বিছানা করিয়া বাহির হইয়া আসিতেছিল, এমন সময়ে হঠাৎ নলিনাক্ষের পায়ের শব্দ শুনিয়া তাড়াতাড়ি বিছানার ও-পাশে গিয়া লুকাইয়াছিল— এখন পালানোও অসম্ভব, লুকানোও কঠিন। তাহার রাশীকৃত-লজ্জা-সমেত এই ধূলির উপরে সে এমন একান্তভাবে ধরা পড়িয়া গেল।

নলিনাক্ষ এই লজ্জিতাকে মুক্তি দিবার জন্য তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিল। দরজা পর্যন্ত গিয়া একবার দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ কী ভাবিয়া সে ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিল— কমলার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিল, "তুমি ওঠো, আমার কাছে তোমার কোনো লজ্জা নাই।"

৬১

পরদিন সকালেই কমলা খুড়ামশায়ের বাসায় গিয়া উপস্থিত হইল। যখনই নির্জনে একটু অবকাশ পাইল, অমনি সে শৈলজাকে জড়াইয়া ধরিল— শৈল কমলার চিবুক ধরিয়া কহিল, "কী বোন, এত খুশি কিসের।"

কমলা কহিল, "আমি জানি না দিদি, কিন্তু আমার মনে হইতেছে, যেন আমার জীবনের সমস্ত ভার চলিয়া গেছে।"

শৈল। বল্ না, সব কথা বল্ না আমাকে। এই তো কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত আমরা ছিলাম, তারপরে তোর হইল কী।

কমলা। এমন কিছুই হয় নাই, কিন্তু আমার কেবলই মনে হইতেছে, আমি যেন তাঁহাকে পাইয়াছি— ঠাকুর যেন আমার 'পরে সদয় হইয়াছেন।

শৈল। তাই হোক বোন, কিন্তু আমার কাছে কিছু লুকোসনে।

কমলা। আমার লুকাইবার কিছুই নাই দিদি, কী যে বলিবার আছে, তাও খুঁজিয়া পাই না। রাত পোহাইতেই সকালে উঠিয়া মনে হইল আমার জীবনটা সার্থক— আমার সমস্ত দিনটা এমন মিষ্ট, আমার সমস্ত কাজ এমন হালকা হইয়া গেছে, তাহা আমি বলিতে পারি না। আমি ইহার চেয়ে আর বেশি কিছুই চাই না—কেবল ভয় হয় পাছে এটুকু নষ্ট হয়— আমি যে প্রতিদিন এমন করিয়া দিন কাটাইতে পারিব, আমার ভাগ্য যে এত প্রসন্ন হইবে, তাহা আমি মনে করিতেই পারি না।

শৈল। আমি তোকে বলিতেছি বোন, তোর ভাগ্য তোকে এইটুকু দিয়াই ফাঁকি দিবে না— তোর যাহা পাওনা আছে, তার সমস্তই শোধ হইবে।

কমলা। না না দিদি, ও-কথা বলিয়ো না— আমার সমস্ত শোধ হইয়াছে— আমি বিধাতাকে কোনো দোষ দিই না— আমার কোনো অভাব নাই।

এমন সময় খুড়া আসিয়া কহিলেন, "মা, তোমাকে তো একবার বাহিরে আসিতে হইতেছে— রমেশবাবু আসিয়াছেন।"

খুড়া এতক্ষণ রমেশের সঙ্গেই কথা কহিতেছিলেন। রমেশকে বলিতেছিলেন, "আপনার সঙ্গে কমলার কী সম্বন্ধ, তাহা আমি সমস্তই জানিয়াছি। এখন আপনার প্রতি আমার পরামর্শ এই যে, আপনার জীবন এখন পরিষ্কার হইয়া গেছে, এখন আপনি কমলার সমস্ত প্রসঙ্গ একেবারে পরিত্যাগ করুন। কমলা সম্বন্ধে যদি কোনো গ্রন্থি কোথাও মোচন করিবার প্রয়োজন থাকে, তবে বিধাতার উপর সে-ভার দিন, আপনি আর হাত দিবেন না।"

রমেশ ইহার উত্তরে কহিতেছিল, "কমলাসম্বন্ধে সকল কথা নিঃশেষে পরিত্যাগ করিবার পূর্বে নলিনাক্ষের কাছে সকল ঘটনা না জানাইয়া আমার নিষ্কৃতি হইতেই পারে না। এ-পৃথিবীতে কমলার কথা তুলিবার সমস্ত প্রয়োজন হয়তো শেষ হইয়া গেছে, হয়তো শেষ হয় নাই—যদি না হইয়া থাকে, তবে আমার যেটুকু বক্তব্য, সেটুকু সারিয়া ছুটি পাইতে চাই।"

খুড়া কহিলেন, "আচ্ছা, আপনি একটুখানি বসুন, আমি আসিতেছি।"

রমেশ ঘুরিয়া বসিয়া জানলা হইতে শূন্যদৃষ্টিতে লোকপ্রবাহের দিকে চাহিয়া রহিল— কিছুক্ষণ পরেই পায়ের শব্দে সতর্ক হইয়া দেখিল, একটি রমণী ভূমিতে মাথা ঠেকাইয়া তাহাকে প্রণাম করিল। যখন সে প্রণাম করিয়া উঠিল, তখন রমেশ আর বসিয়া থাকিতে পারিল না—তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "কমলা!" কমলা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

খুড়া কহিলেন, “রমেশবাবু, কমলার সমুদয় দুঃখকে সৌভাগ্যে পরিণত করিয়া ঈশ্বর তাহার চারিদিক হইতে সমস্ত কুয়াশা কাটিয়া দিতেছেন। আপনি তাহাকে পরম সংকটের সময় যেমন রক্ষা করিয়াছেন তাহার জন্য যে বিষম দুঃখ আপনাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে, তাহাতে আপনার সঙ্গে সম্বন্ধ ছেদনের সময় কোনো কথা না বলিয়া কমলা বিদায় লইতে পারে না। আপনার কাছে ও আজ আশীর্বাদ লইতে আসিয়াছে।”

রমেশ ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া সবলে রুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লইয়া কহিল, “তুমি সুখী হও কমলা— আমি না জানিয়া এবং জানিয়া তোমার কাছে যা-কিছু অপরাধ করিয়াছি, সব মাপ করিয়ো।”

কমলা ইহার উত্তরে কিছুই বলিতে পারিল না— দেওয়াল ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রমেশ কিছুক্ষণ পরে কহিল, “যদি কাহাকেও কিছু বলিবার জন্য, কোনো বাধা দূর করিবার জন্য আমাকে তোমার প্রয়োজন থাকে তো বলো।”

কমলা জোড়হাত করিয়া কহিল, “আমার কথা কাহারও কাছে বলিবেন না, আমার এই মিনতি রাখিবেন।”

রমেশ কহিল, “অনেকদিন তোমার কথা কাহারও কাছে বলি নাই —খুব গোলমালে পড়িলেও চুপ করিয়া কাটাইয়াছি। অল্পদিন হইল, যখন মনে করিয়াছিলাম, তোমার কথা বলিলে তোমার কোনো ক্ষতি হইবে না, তখনি কেবল একটি পরিবারের কাছে তোমার কথা প্রকাশ করিয়াছি। তাহাতেও বোধ হয় তোমার অনিষ্ট না হইয়া ভালোই হইতে পারে। খুড়ামশায় বোধ হয় খবর পাইয়া থাকিবেন—অন্নদাবাবু, যাঁহার মেয়ের সঙ্গে—”

খুড়া কহিলেন, "হেমনলিনী, জানি বইকি। তাঁহারা সব শুনিয়াছেন?"

রমেশ কহিল, "হাঁ। তাঁহাদের কাছে আর-কিছু বলা যদি প্রয়োজন বোধ করেন, তবে আমি যাইতে পারি— কিন্তু আমার আর ইচ্ছা নাই— আমার অনেক সময় গেছে এবং আরও আমার অনেক গেছে, এখন আমি মুক্তি চাই— হাতনাগাদ সমস্ত দেনাপাওনা শোধ করিয়া দিয়া এখন বাহির হইতে পারিলে বাঁচি।"

খুড়া রমেশের হাত ধরিয়া সস্নেহকণ্ঠে কহিলেন, "না রমেশবাবু, আপনাকে আর-কিছুই করিতে হইবে না। আপনাকে অনেক বহন করিতে হইয়াছে, এখন ভারমুক্ত হইয়া নিজেকে স্বাধীনভাবে চালনা করুন, সুখী হউন, সার্থক হউন, এই আমার আশীর্বাদ।"

যাইবার সময় রমেশ কমলার দিকে চাহিয়া কহিল, "আমি তবে চলিলাম।"

কমলা কোনো কথা না কহিয়া আর-একবার ভূতলে মাথা ঠেকাইয়া রমেশকে প্রণাম করিল।

রমেশ পথে বাহির হইয়া স্বপ্নাবিষ্টের মতো চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিল, "কমলার সঙ্গে দেখা হইল, ভালোই হইল, দেখা না হইলে এ-পালাটা ভালো করিয়া শেষ হইত না। যদিও ঠিক জানিলাম না, কমলা কী জানিয়া কী বুঝিয়া সে-রাত্রে হঠাৎ গাজিপুরের বাংলা ছাড়িয়া চলিয়া আসিল, কিন্তু ইহা বুঝা গেছে, আমি এখন সম্পূর্ণই অনাবশ্যক। এখন আমার আবশ্যক কেবল নিজের জীবনটুকু লইয়া— এখন তাহাকেই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে বাহির হইলাম— আমার আর পিছনে ফিরিয়া তাকাইবার কোনো প্রয়োজন নাই।"

৬২

কমলা বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া দেখিল— অন্নদাবাবু ও হেমনলিনী ক্ষেমংকরীর কাছে বসিয়া আছে। কমলাকে দেখিয়া ক্ষেমংকরী কহিলেন, "এই যে হরিদাসী, তোমার বন্ধুকে তোমার ঘরে লইয়া যাও বাছা। আমি অন্নদাবাবুকে চা খাওয়াইতেছি।"

কমলার ঘরে প্রবেশ করিয়াই হেমনলিনী কমলার গলা ধরিয়া কহিল, "কমলা।"

কমলা খুব বেশি বিস্মিত না হইয়া কহিল, "তুমি কেমন করিয়া জানিলে আমার নাম কমলা।"

হেমনলিনী কহিল, "একজনের কাছে আমি তোমার জীবনের ঘটনা সব শুনিয়াছি ; যেমনি শুনিলাম, অমনি তখনই আমার মনে সন্দেহ রহিল না, তুমিই কমলা। কেন যে তা বলিতে পারি না।"

কমলা কহিল, "ভাই, আমার নাম যে কেহ জানে, সে আমার ইচ্ছা নয়। আমার নিজের নামে একেবারে ধিককার জন্মিয়া গেছে।"

হেমনলিনী কহিল, "কিন্তু এই নামের জোরেই তো তোমাকে তোমার অধিকার পাইতে হইবে।"

কমলা মাথা নাড়িয়া কহিল, "ও আমি বুঝি না। আমার জোর কিছুই নাই, আমার অধিকার কিছুই নাই, আমি জোর খাটাইতেই চাই না।"

হেমনলিনী কহিল, "কিন্তু তোমার স্বামীকে তোমার পরিচয় হইতে বঞ্চিত করিবে কী বলিয়া। তোমার ভালোমন্দ সবই কি তাঁহার কাছে নিবেদন করিবে না। তাঁর কাছে কি কিছু লুকানো চলিবে।"

হঠাৎ কমলার মুখ যেন বিবর্ণ হইয়া গেল— সে কোনো উত্তর খুঁজিয়া

না পাইয়া নিরুপায়ভাবে হেমনলিনীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। আস্তে আস্তে কমলা মেজের মাদুরের 'পরে বসিয়া পড়িল,— কহিল, "ভগবান তো জানেন, আমি কোনো অপরাধ করি নাই, তবে তিনি কেন আমাকে এমন করিয়া লজ্জায় ফেলিবেন। যে-পাপ আমার নয়, তার শাস্তি আমাকে কেন দিবেন। আমি কেমন করিয়া তাঁর কাছে আমার সব কথা প্রকাশ করিব।"

হেমনলিনী কমলার হাত ধরিয়া কহিল, "শাস্তি নয় ভাই, তোমার মুক্তি হইবে। যতদিন তুমি তোমার স্বামীর কাছে আপনাকে গোপন করিয়া রাখিতেছ, ততদিন তুমি আপনাকে একটা মিথ্যার বন্ধনে জড়িত করিতেছ— তাহা তেজের সহিত ছিঁড়িয়া ফেলো, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করিবেনই।"

কমলা কহিল, "আবার পাছে সব হারাই, এই ভয় যখন মনে আসে, তখন সব বল চলিয়া যায়। কিন্তু তুমি যা বলিতেছ, আমি তা বুঝিয়াছি — অদৃষ্টে যা থাকে তা হোক, কিন্তু তাঁর কাছে আপনাকে লুকানো আর চলিবে না— তিনি আমার সবই জানিবেন।" এই বলিতে বলিতে সে আপনার দুইহাত দৃঢ়বলে বদ্ধ করিল।

হেমনলিনী সকরুণচিত্তে কহিল, "তুমি কি চাও,— আর-কেহ তোমার কথা তাঁহাকে জানায়।"

কমলা সবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, "না না, আর কাহারও মুখ হইতে তিনি শুনিবেন না— আমার কথা আমিই তাঁহাকে বলিব— আমি বলিতে পারিব।"

হেমনলিনী কহিল, "সেই কথাই ভালো। তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে কিনা, জানি না। আমরা এখান হইতে চলিয়া যাইতেছি, তাহা তোমাদের বলিতে আসিয়াছি।"

কমলা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাইবে।"

হেমনলিনী কহিল, "কলিকাতায়। তোমাদের সকালে কাজকর্ম আছে— আমরা আর দেরি করিব না। আমি তবে আসি ভাই। বোনকে মনে রাখিয়ো।"

কমলা তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "আমাকে চিঠি লিখিবে না ?"

হেমনলিনী কহিল, "আচ্ছা, লিখিব।"

কমলা কহিল, "কখন কী করিতে হইবে, আমাকে তুমি উপদেশ দিয়া লিখিয়ো ; আমি জানি, তোমার চিঠি পাইলে আমি বল পাইব।"

হেমনলিনী একটু হাসিয়া কহিল, "আমার চেয়ে ভালো উপদেশ দিবার লোক তুমি পাইবে, সেজন্য কিছুই ভাবিয়ো না।"

আজ হেমনলিনীর জন্য কমলা মনের মধ্যে বড়োই একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিল। হেমনলিনীর প্রশান্ত মুখে কী-একটা ভাব ছিল, যাহা দেখিয়া কমলার চোখে যেন জল ভরিয়া আসিতে চাহিতেছিল। কিন্তু হেমনলিনীর কেমন-একটা দূরত্ব আছে— তাহাকে কোনো কথা বলা যেন চলে না, তাহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে যেন বাধে। আজ কমলার সকল কথাই হেমনলিনীর কাছে প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু সে আপনার সুগভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া চলিয়া গেল, কেবল একটা-কী রাখিয়া গেল, যাহা বিলীয়মান গোধূলির মতো অপরিমেয় বিষাদের বৈরাগ্যে পরিপূর্ণ।

গৃহকর্মের অবকাশকালে আজ সমস্ত দিন কেবলই হেমনলিনীর কথাগুলি এবং তাহার শান্ত-সকরুণ চোখের দৃষ্টি কমলার মনকে আঘাত দিতে লাগিল। কমলা হেমনলিনীর জীবনের আর-কোনো ঘটনা জানিত না— কেবল জানিত, নলিনাক্ষের সঙ্গে তাহার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়া ভাঙিয়া গেছে। হেমনলিনী তাহাদের বাগান হইতে আজ

এক সাঁজি ফুল আনিয়া দিয়াছিল। বৈকালে গা ধুইয়া আসিয়া কমলা সেই ফুলগুলি লইয়া মালা গাঁথিতে বসিল। মাঝে একবার ক্ষেমংকরী আসিয়া তাহার পাশে বসিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "আহা মা, আজ হেম যখন আমাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল, আমার মনের মধ্যে যে কী করিতে লাগিল, বলিতে পারি না। যে যাই বলুক, হেম মেয়েটি বড়ো ভালো। আমার এখন কেবলই মনে হইতেছে, উহাকে যদি আমাদের বউ করিতাম তো বড়ো সুখের হইত। আর-একটু হইলেই তো হইয়া যাইত— কিন্তু আমার ছেলেটিকে তো পারিবার জো নাই— ও যে কী ভাবিয়া বাঁকিয়া বসিল, তা ও-ই জানে।"

শেষকালে তিনিও যে এই বিবাহের প্রস্তাবে বিমুখ হইয়াছিলেন, সে-কথা ক্ষেমংকরী আর মনের মধ্যে আমল দিতে চান না।

বাহিরে পায়ের শব্দ শুনিয়া ক্ষেমংকরী ডাকিলেন, "ও নলিন, শুনে যা।"

কমলা তাড়াতাড়ি আঁচলের মধ্যে ফুল ও মালা ঢাকিয়া ফেলিয়া মাথার কাপড় তুলিয়া দিল। নলিনাক্ষ ঘরে প্রবেশ করিলে ক্ষেমংকরী কহিলেন, "হেমরা যে আজ চলিয়া গেল— তোর সঙ্গে কি দেখা হয় নাই।"

নলিন কহিল, "হাঁ, আমি যে তাঁহাদের গাড়িতে তুলিয়া দিয়া আসিলাম।"

ক্ষেমংকরী কহিলেন, "যাই বলিস বাপু, হেমের মতো মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না।"

যেন নলিনাক্ষ এ-সম্বন্ধে বরাবর তাহার প্রতিবাদ করিয়াই আসিয়াছে। নলিনাক্ষ চুপ করিয়া একটুখানি হাসিল।

ক্ষেমংকরী কহিলেন, "হাসলি যে বড়ো! আমি তোর সঙ্গে হেমের

সম্বন্ধ করিলাম, আশীর্বাদ পর্যন্ত করিয়া আসিলাম, আর তুই যে জেদ করিয়া সব ভণ্ডুল করিয়া দিলি, এখন তোর মনে কি একটু অনুতাপ হইতেছে না।"

নলিনাক্ষ একবার চকিতের মতো কমলার মুখের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল, দেখিল, কমলা উৎসুকনেত্রে তাহার দিকে তাকাইয়া আছে। চারি চক্ষু মিলিত হইবামাত্র কমলা লজ্জায় মাটি হইয়া চোখ নিচু করিল।

নলিনাক্ষ কহিল, "মা তোমার ছেলে কি এমনই সৎপাত্র যে, তুমি সম্বন্ধ করিলেই হইল। আমার মতো নীরস গম্ভীর লোককে সহজে কি কারও পছন্দ হইতে পারে।"

এই কথায় কমলার চোখ আপনি আবার উপরে উঠিল— উঠিবামাত্র দেখিল, নলিনাক্ষের হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি তাহার উপরেই পড়িয়াছে,— এবার কমলার মনে হইতে লাগিল, ঘর হইতে ছুটিয়া পালাইতে পারিলে বাঁচি।

ক্ষেমংকরী কহিলেন, "যা যা, আর বকিসনে, তোর কথা শুনিলে আমার রাগ ধরে।"

এই সভা ভঙ্গ হইয়া গেলে পর কমলা হেমনলিনীর সব কটি ফুল লইয়া একটি বড়ো মালা গাঁথিল। ফুলের সাজির উপরে সেই মালাটি লইয়া জলের ছিটা দিয়া সেটি নলিনাক্ষের উপাসনাঘরের এক পার্শ্বে রাখিয়া দিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, আজ বিদায় হইয়া যাইবার দিনে এইজন্যই হেমনলিনী সাজি ভরিয়া ফুল আনিয়াছিল— মনে করিয়া তাহার চোখ ছলছল করিয়া উঠিল।

তার পরে আপনার ঘরে ফিরিয়া আসিয়া তাহার মুখের দিকে নলিনাক্ষের সেই দৃষ্টিপাত কমলা অনেকক্ষণ ধরিয়া আলোচনা করিতে লাগিল। নলিনাক্ষ কমলাকে কী মনে করিতেছে? কমলার মনের কথা যেন নলিনাক্ষের কাছে সমস্তই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। কমলা

পূর্বে যখন নলিনাক্ষের সম্মুখে বাহির হইত না, তখন সে একরকম ছিল ভালো। এখন প্রতিদিন কমলা তাহার কাছে ধরা পড়িয়া যাইতেছে। আপনাকে গোপন করিয়া রাখিবার এই তো শাস্তি। কমলা ভাবিতে লাগিল, "নিশ্চয়ই নলিনাক্ষ মনে মনে বলিতেছেন, 'এই হরিদাসী মেয়েটিকে মা কোথা হইতে আনিলেন, এমন নির্লজ্জ তো দেখি নাই।' নলিনাক্ষ যদি এক মুহূর্ত এমন কথা মনে করে তবে তো সে অসহ্য।"

কমলা রাত্রে বিছানায় শুইয়া মনে মনে খুব জোর করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল, "যেমন করিয়া হউক, কালই আপনার পরিচয় দিতে হইবে, তার পরে যাহা হয় তাহা হউক।"

পরদিন কমলা প্রত্যুষে উঠিয়া স্নান করিতে গেল। স্নানের পর প্রতিদিন সে একটি ছোটো ঘটিতে গঙ্গাজল আনিয়া নলিনাক্ষের উপাসনা-ঘরটি ধুইয়া মার্জনা করিয়া তবে অন্য কাজে মন দিত। আজও সে তার দিবসের প্রথম কাজটি সারিতে গিয়া দেখিল, নলিনাক্ষ আজ সকাল-সকাল তাহার উপাসনাঘরে প্রবেশ করিয়াছে— এমন তো কোনোদিন হয় নাই। কমলা তাহার মনের মধ্যে অসমাপ্ত কাজের একটা ভার বহন করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। খানিকটা দূর গিয়া সে হঠাৎ থামিল— স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া কী-একটা ভাবিল। তারপরে আবার ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিয়া উপাসনাঘরের দ্বারের কাছে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহাকে যে কিসে আবিষ্ট করিয়া ধরিল, তাহা সে জানে না; সমস্ত জগৎ তাহার কাছে ছায়ার মতো হইয়া আসিল, সময় যে কতক্ষণ চলিয়া গেল তাহা তাহার বোধ রহিল না। হঠাৎ এক সময় দেখিল, নলিনাক্ষ ঘর হইতে বাহির হইয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কমলা মুহূর্তের মধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তখনি ভূতলে হাঁটু গাড়িয়া একেবারে নলিনাক্ষের পায়ের উপর মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল—তাহার সত্তস্নানে

আর্দ্র চুলগুলি নলিনের পা ঢাকিয়া মাটিতে ছড়াইয়া পড়িল। কমলা প্রণাম করিয়া উঠিয়া পাথরের মূর্তির মতো স্থির হইয়া দাঁড়াইল— তাহার মনে রহিল না যে, তাহার মাথার উপর হইতে কাপড় পড়িয়া গেছে— সে যেন দেখিতেই পাইল না, নলিনাক্ষ অনিমেষ স্থিরদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে— তাহার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত, সে একটি অন্তরের চৈতন্য-আভায় অপূর্বরূপে দীপ্ত হইয়া অবিচলিতকণ্ঠে কহিল, "আমি কমলা।"

এই কথাটি বলিবার পরেই তাহার আপনার কণ্ঠস্বরে তাহার যেন ধ্যানভঙ্গ হইয়া গেল— তাহার একাগ্র চেতনা বাহিরে ব্যাপ্ত হইল। তখন তাহার সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল— মাথা নত হইয়া গেল— সেখান হইতে নড়িবারও শক্তি রহিল না, দাঁড়াইয়া থাকাও যেন অসাধ্য হইয়া উঠিল— সে তাহার সমস্ত বল, সমস্ত পণ, "আমি কমলা" এই একটি কথায় নলিনাক্ষের পায়ের কাছে উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়াছে—নিজের কাছে নিজের লজ্জা রক্ষা করিবার কোনো উপায় সে আর হাতে রাখে নাই, এখন সমস্তই নলিনাক্ষের দয়ার উপরে নির্ভর। নলিনাক্ষ আস্তে আস্তে তাহার হাতটি আপনার হাতের উপর তুলিয়া লইয়া কহিল, "আমি জানি, তুমি আমার কমলা। এসো, আমার ঘরে এসো।"

উপাসনাঘরে তাহাকে লইয়া গিয়া তাহার গলায় কমলার গাঁথা সেই মালাটি পরাইয়া দিল এবং কহিল, "এসো, আমরা তাঁহাকে প্রণাম করি।" দুইজনে পাশাপাশি যখন সেই শ্বেতপাথরের মেজের উপরে নত হইল, জানালা হইতে প্রভাতের রৌদ্র দুইজনের মাথার উপরে আসিয়া পড়িল।

প্রণাম করিয়া উঠিয়া আর-একবার নলিনাক্ষের পায়ের ধুলা লইয়া যখন কমলা দাঁড়াইল, তখন তাহার দুঃসহ লজ্জা আর তাহাকে পীড়ন

করিল না। হর্ষের উল্লাস নহে, কিন্তু একটি বৃহৎ মুক্তির অচঞ্চল শান্তি তাহার অস্তিত্বকে প্রভাতের অকুণ্ঠিত উদার-নির্মল আলোকের সহিত ব্যাপ্ত করিয়া দিল। একটি গভীর ভক্তি তাহার হৃদয়ের কানায়-কানায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, তাহার অন্তরের পূজা সমস্ত বিশ্বকে ধূপের পুণ্য গন্ধে বেষ্টন করিল। দেখিতে দেখিতে কখন অজ্ঞাতসারে তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল— বড়ো বড়ো জলের ফোঁটা তাহার দুই কপোল দিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, আর থামিতে চাহিল না, তাহার অনাথ জীবনের সমস্ত দুঃখের মেঘ আজ আনন্দের জলে ঝরিয়া পড়িল। নলিনাক্ষ তাহাকে আর-কোনো কথা না বলিয়া একবার কেবল দক্ষিণ হস্তে তাহার ললাট হইতে সিক্ত কেশ সরাইয়া দিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল।

কমলা তাহার পূজা এখনো শেষ করিতে পারিল না— তাহার পরিপূর্ণ হৃদয়ের ধারা এখনো সে ঢালিতে চায়— তাই সে নলিনাক্ষের শোবার ঘরে গিয়া আপনার গলার মালা দিয়া সেই খড়মজোড়াকে জড়াইল এবং তাহা আপনার মাথায় ঠেকাইয়া যত্নপূর্বক যথাস্থানে তুলিয়া রাখিল।

তারপরে সমস্ত দিন তাহার গৃহকর্ম যেন দেবসেবার মতো মনে হইতে লাগিল। প্রত্যেক কর্মই যেন আকাশে এক-একটি আনন্দের তরঙ্গের মতো উঠিল পড়িল। ক্ষেমংকরী তাহাকে কহিলেন, "মা, তুমি করিতেছ কী। একদিনে সমস্ত বাড়িটাকে ধুইয়া মাজিয়া মুছিয়া একেবারে নূতন করিয়া তুলিবে নাকি।"

বৈকালের অবকাশের সময় আজ আর সেলাই না করিয়া কমলা তাহার ঘরের মেজের উপরে স্থির হইয়া বসিয়া আছে, এমন সময় নলিনাক্ষ একটি টুকরিতে গুটিকয়েক স্থলপদ্ম লইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ

করিল— কহিল, "কমলা, এই ফুল কটি তুমি জল দিয়া তাজা করিয়া রাখো, আজ সন্ধ্যার পর আমরা দুজনে মাকে প্রণাম করিতে যাইব।"

কমলা মুখ নত করিয়া কহিল, "কিন্তু আমার সব কথা তো শোন নাই।"

নলিনাক্ষ কহিল, "তোমাকে কিছু বলিতে হইবে না, আমি সব জানি।"

কমলা দক্ষিণ করতল দিয়া মুখ ঢাকিয়া কহিল, "মা কি—" বলিয়া কথা শেষ করিতে পারিল না।

নলিনাক্ষ তাহার মুখ হইতে হাত নামাইয়া ধরিয়া কহিল, "মা তাঁহার জীবনে অনেক অপরাধকে ক্ষমা করিয়া আসিয়াছেন, যাহা অপরাধ নহে, তাহাকে তিনি ক্ষমা করিতে পারিবেন।"

———